সচিত্র

সতীর তেজ।

অর্থাৎ

ধর্ম্মমূলক অপূর্ব্ব উপন্যাস।

যোগভক্ত

শ্রীদৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত।

প্রকাশক—ডি, এন্, গাঙ্গুলি।

ন নং ৫৪ A পূঃ ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, কলিকাতা

াপ্তিস্থান—২৬৪।৩ নং অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

নদীয়া জয় দুর্গা মাতার যোগ মন্দির

হইতে প্রকাশিত।

—০:*:০—

M. P. L.

সন ১৩২১ সাল।

বিলাতি বাঁধাই রাজ সংস্করণ। মূল্য ১।০ টাকা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

"সতীর তেজ" পুস্তক প্রণয়নে গুপ্তসাধক ৺প্রিয়নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি কতিপয় মহোদয়গণের লিখিত প্রবন্ধ হইতে এবং কতিপয় কীটদষ্ট পুরাতন পুস্তক হইতেও কোনও কোনও বিষয় সংগ্রহ করিয়াছি। সেই জন্য সকলের নাম জানিতে না পারায় যদিও প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করিতে পারিলাম না, তথাপি তাঁহাদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

শ্রীদৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৩নং কাশীমিত্রের ঘাট ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীশচীন্দ্র কুমার দাশ গুপ্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মেহারে কালী সিদ্ধ

বংশসম্ভূত

ঘাটভোগ নিবাসী

শ্রীশ্রীগুরুদেব

৺কৈলাসানন্দ দেবশর্ম্মণঃ

শ্রীপাদপদ্ম

উদ্দেশে

এই গ্রন্থ

ভক্তি উপহার স্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম।

সতীর তেজ।

ার

াবাজার, কলিকাতা।

ভগবন্ !

দীনের সঞ্চিত ফল
আছে মাত্র অশ্রু জল,
তাই দিয়া পূজি তব ও রাঙ্গা চরণ।
দাও এই ভিক্ষা চাই,
স্বার্থ যেন ভুলে যাই ;
নিঃস্বার্থ ভাবেতে করি পর-উপকার।
সতত কামনা করি,
দাও শক্তি, হৃদে ধরি,
জগত-মঙ্গল তরে গ্রন্থের প্রচার।

দয়াময় !

দুইটী সাধু কার্য্য উদ্দেশ্যে দীন সন্তানের আকাঙ্খিত-সতীর তেজ উপন্যাসখানি প্রচারিত হইল। প্রথমটী নলীয়া গ্রামের প্রতিষ্ঠিত দেবী জয়দুর্গার ভগ্ন মন্দির সংস্কার ; দ্বিতীয়টী হরিদ্বার সন্ন্যাসী-আশ্রমের যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য :—এই উভয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া না হওয়া এখন তোমার ইচ্ছা, তাই তোমার শ্রীপাদপদ্ম উদ্দেশে ইহা অর্পণ করিয়া নিক্ষিপ্ত করিলাম।

হিতবাদী আবেদন।

দেবমন্দির সংস্কার।

কলিকাতা ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় লিখিতেছেন—ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দ মহকুমার অন্তর্গত নলীয়া গ্রামে সাধক প্রবর রায় গোবিন্দ চক্রবর্ত্তীর পুত্র কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় ৺জয়দুর্গা মূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা করেন। দেবী মন্দিরটী জোড় বাঙ্গালা নামে আখ্যাত। এরূপ কারুকার্য্য বিশিষ্ট মন্দির প্রায় দেখা যায় না। এই পুরাকীর্ত্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। আমি মৎপ্রণীত সতীর তেজ নামক ধর্ম্মমূলক উপন্যাসের আয় মন্দির সংস্কারের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি। নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদিগের সুমতি হইলে এই মন্দির সংস্কার কার্য্য কষ্টসাধ্য হইবে না।

লেখকের নিবেদন।

এ ভবসংসারে এক ব্রহ্ম ভিন্ন সমস্তই উচ্ছিষ্ট ;—সকলই পুরাতন সুতরাং নূতন দেখাইবার বা শুনাইবার কিছুই নাই। তবে পুরাতনই আবার কাহারও নিকট নূতন বলিয়া প্রতীত হয়। যে এক দিন কোনও বস্তু ব্যবহার করিয়াছে তাহার নিকট তাহা পরদিন পুরতান ; কিন্তু যে ঐ বস্তু ব্যবহার করে নাই, তাহার নিকট তাহা সম্পূর্ণ নূতন। এই যখন চিরপ্রচলিত নিয়ম, তখন আর লেখকের অপরাধ কি ? তাই লেখক অতিশয় আনন্দে, আকাঙ্ক্ষার তাড়নায়, বাসনার প্রলোভনে আজ সেই পুরাতন-নূতন ও নূতন-পুরাতন মিশ্রিত উপহার লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হইতেছে।

শ্বেতচন্দনে চর্চ্চিত একটী বিল্বপত্র আনন্দধাম হইতে আকাশ গঙ্গায় পতিত হইয়া, উজান স্রোতে ভাসিতে ভাসিতে, মহেশ্বরের শ্রীচরণ-সংলগ্ন হইল—**সতীর তেজে**। সেই শ্বেতচন্দন টুকুই লেখকের বর্ত্তমান জীবনের কর্ম্ম, এবং সেই অকার উকার মকাররূপ ত্রিপত্র বিল্বপত্রটীই ঐ বর্ণত্রয়-সংযোগ-সমুদ্ভূত প্রণবমন্ত্র ওঁকার—**সতীর তেজ**। জীবের হৃদয় ও শিবের চরণ এই উভয়ের মিলন-আকাঙ্ক্ষা-রূপ যে প্রাণের টান, তাহাই উত্তরবাহিনী ভক্তিদ্রবরূপিণী স্রোতস্বিনী গঙ্গা।

স্বার্থশূন্য হইয়া ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যাহা করা যায়, তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম্ম। এইরূপ কর্ম্ম দ্বারা আকাশের যে আলোড়ন, তদ্দ্বারা আকাশস্থিত সত্ত্বগুণাত্মক কতকগুলি অণুকণা একস্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া থাকে। সেই সত্ত্বগুণাত্মক শ্বেতবর্ণ, স্নিগ্ধ ও সুগন্ধি পরমাণু-গুলিই অন্তরাকাশের শ্বেতচন্দন।

সতীর তেজের লেখক, প্রকাশক এবং পাঠক পাঠিকাগণ মিলিয়া যে কার্য্য করিতেছেন ও করিবেন, তাহার ফলে অন্তর-আকাশে যে শ্বেতচন্দন-টুকু সঞ্চিত হইয়াছে ও হইবে, প্রকাশকের একান্ত ইচ্ছা যে উহার দ্বারা ত্রিপত্র বিল্বপত্রটী সিক্ত করিয়া আনন্দময় মহেশ্বরের উদ্দেশে গঙ্গাজলে ছাড়িয়া দেওয়া।

ভরসা—এইরূপ শ্বেতচন্দন এইরূপ বিল্বপত্র সহ মিলিত করিয়া গঙ্গাজলে মহাগুরু মহেশ্বরের উদ্দেশে ছাড়িয়া দিলে, মহাগুরু মহেশ্বর তাহাকে তাহার প্রার্থিত আশীর্ব্বাদরূপ ভাগ্যফল প্রদান করিয়া থাকেন।

মানুষের সঞ্চিত কর্ম্মফল তাহাকে নরকে অথবা স্বর্গে লইয়া যায়। কর্ম্মফলই ভাগ্যবিধাতা। সংসারবাসী জীবের সেই কর্ম্ম-সঞ্জাত ভাগ্য কোনও এক শুভলগ্নে হয় ত তাহাকে দেবতা করিয়া তুলে, —সেইরূপ একটী সত্যঘটনা অবলম্বনে এই উপন্যাস রচিত হইল।

ইহাতে যাহা লিখিত হইল, তাহার সমস্ত আমার স্বকপোলকল্পিত নহে—কতকাংশ পুরাতন, মহাজনগণের মুখশ্রুত কাহিনী; সুতরাং তাহাতে আমার দায়িত্ব অল্প।

এতৎগ্রন্থ প্রণয়ন সময়ে আমি কোন কুলোকের হস্তে পড়িয়া বহু বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া যথেষ্ট পরিশ্রম ও অর্থব্যয় করিয়াছি। ইহা পাঠে যদি একটী মাত্রও ভবভ্রান্ত জীবের কোনরূপ উপকার হয়, তাহা হইলে আমি সাফল্য বোধে কৃতার্থ হইব।

হে ভবভ্রান্ত জীব!

তোমার কে আছে ভবে আপনার জন?
কান্দিছ হাসিছ সদা ভ্রমে অকারণ!

গ্রন্থকার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

খাটিবারে পাঠায়েছ খাটিতেছি নাথ
ফলাফল যাহা কিছু সব তব হাত।

* ভগবৎ কৃপায় অদ্য "সতীর তেজের" দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির করিয়া "নচ-দৈবাৎ পরং বলম্" এই মহা বাক্যটীর সার্থকতা দর্শনে বড়ই আনন্দ লাভ হইল। যাঁহার কার্য্য উদ্দেশে এই পুস্তক খানি উৎসর্গ করা হইয়াছে, অদ্য তাঁহারই নামের শক্তিতে—অপূর্ব্ব মহিমায় "সতীর তেজ" উপন্যাস, বঙ্গের গণ্য, মান্য, বরেণ্য শিক্ষিত ধর্ম্ম প্রাণ ব্যক্তি বৃন্দের নিকট আদর লাভ করিয়াছে। অতি অল্পদিনের মধ্যেই প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ায় আবার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিলাম। এই পুস্তকের আশার অতিরিক্ত বিক্রয়াধিক্য দর্শনে আমাদিগের বন্ধু, বান্ধব, উৎসাহদাতাগণ প্রভৃতি যে আনন্দিত হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। এত অল্পদিনে "সতীর তেজের" দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইল দেখিয়া বড়ই বিস্মিত হইয়াছি। এ পুস্তকের যে, কোন কালে দ্বিতীয় সংস্করণ আবশ্যক হইবে, ইহা আশা করি নাই। আমার অনুমান ছিল এ অসম্বদ্ধ প্রলাপ পাঠ করিবার ধৈর্য্য কাহারও থাকিবেনা। সেই জন্য এই পুস্তক লিখিয়া তীব্র কটূক্তি ভিন্ন অন্য পুরস্কারের প্রত্যাশা করি নাই। কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন সমাজের হাস্য ভাজন হইব বুঝিয়াও এ গ্রন্থ লিখিবার প্রয়াস কেন? ইহার একটী সংক্ষিপ্ত উত্তর দিতেছি;—বর্ত্তমানে হিন্দু দেবমন্দির গুলির অধিকাংশেরই বড় দুরাবস্থা, কোন কোনটী এরূপ জীর্ণ শীর্ণ এবং ভয়াবহ বিপ-

জনক হইয়াছে যে, ঐ সকল মন্দিরে ব্রাহ্মণগণ নির্ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় সন্ধ্যা বন্দনাদির সুবিধা পান না, সংসারতপ্ত গৃহস্থগণ তথায় কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা তাপিত প্রাণে যে কথঞ্চিত শান্তি অনুভব করিবেন সে সম্ভাবনা নাই। পৃথিবী পরিক্রমণ শীল ধর্ম্মপ্রাণ পরিব্রাজকগণ যে সময় সময় গ্রাম্য মন্দিরে আশ্রয় লাভ করিয়া নিজনিজ দৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ দ্বারা গ্রামের অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেন সে সম্ভাবনাও নাই। দান ধ্যানও অতিথি সৎকারাদি দ্বারা সর্ব্বদাই বিষয়াশক্ত গৃহিগণের চিত্তকে ধর্ম্মের দিকে উন্মুখ করিবার জন্য মন্দির সকলের যে আকর্ষণ ছিল তাহাও ক্রমে ক্রমে লুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অনেক স্থানে আর শঙ্খ ঘণ্টা বাজে না, স্তোত্র পাঠ নিস্তব্ধ, ধূপ ধুনার গন্ধ আর দিগন্তকে আমোদিত করে না। ধর্ম্ম বলিয়া, পূজা বলিয়া, পবিত্রতা বলিয়া, পারত্রিক বলিয়া যে কিছু আছে, বিলাস ভোগ ও পরিবার ভরণ এবং আহার নিদ্রাদি ভিন্ন মানুষের আর যে কিছু কর্ত্তব্য আছে, একথা এই ভগ্ন মন্দিরগুলি ক্ষীণভাবে এখনও স্মরণ করাইয়া দিতেছিল। কিন্তু হায়! ইহাদের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে এ সকলই ঘোর বিষয়াশক্তির পঙ্কিল সলিলে ডুবিয়া যাইতেছে; এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া, প্রাণে বড় আঘাত পাইয়াছি, এজন্য সংকল্প পূর্ব্বক এ জীবনের অবশীষ্ট কাল ভারতীয় জীর্ণ মন্দির সংস্কার কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি। প্রথমতঃ, নদীয়া গ্রামের প্রাচীন জয়দুর্গা মাতার জীর্ণ মন্দিরে হস্তক্ষেপ করা হইয়াছে। আমি ক্ষুদ্র তৃণাদপি ক্ষুদ্র কিন্তু ইচ্ছা ক্ষুদ্র নয়; সদিচ্ছার পালক যিনি তাঁর কৃপায় সবই সম্ভব।

"মূকং করোতি বাচালং
পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।"

এই মহাবাক্যের প্রমাণও পাইয়াছি। মাতৃনামে সতীর তেজ পুস্তকের অজস্র কাটতিই ভগবৎ কৃপার অতি পরিস্ফুট প্রমাণ। অতএব পাঠক পাঠিকাগণ আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তকের গ্রাহক হইয়া আপনারা যে কেবল আমার এই ক্ষুদ্র শক্তির সাহায্য ও নগণ্য লেখককে উৎসাহ দান করিলেন তাহা নহে। আপনারা সেই স্বর্গীয় ইচ্ছার অনুগত হইয়া পরম শুভাশীর্ব্বাদ লাভ করিলেন তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অলমিতি—

বিনীত

গ্রন্থকারস্য।

৺জয়দুর্গা দেবীর যোগ মন্দির, নদীয়া।

প্রকাশকের নিবেদন।

শ্রীশ্রী৺ জয়দুর্গা মাতার জীর্ণ মন্দির সংস্কার কল্পে।

ভগবানের প্রসাদে এবং ভগবৎ প্রসাদ প্রার্থী পাঠক পাঠিকা মণ্ডলীর যত্ন ও সাহায্যে "সতীর তেজ" উপন্যাসখানি পরিপুষ্ট কলেবরে দ্বিতীয়বার প্রচারিত হইল।

শ্রীশ্রী৺ জয়দুর্গা মাতার কৃপায়

এবার আর সতীর তেজ মুদ্রণের সাহায্য জন্য বিশেষ কষ্ট পাইতে হয় নাই। সর্ব্ব উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের ভুতপূর্ব্ব বিচারপতি পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এবং নিত্য আশীর্ব্বাদভাজন শ্রীযুক্ত সারদা চরণ মিত্র ও শ্রীযুক্ত বরদা চরণ মিত্র মহাশয়গণ প্রথম সংস্করণ কাল হইতেই সন্তুষ্ট ও সদয় হইয়া যেরূপ উৎসাহ প্রদান ও সাহায্য করিয়া আসিতেছেন, তাহাই নত শিরে সাদরে গৃহিত হইতেছে।

বাঁকীপুর হইতে কতিপয় দেশ-গণ্য মান্য ভক্তিভাজন ও আশীর্ব্বাদাকাঙ্ক্ষী উকিল, ডেপুটী — মেজিষ্ট্রেট, ডাক্তার, জমীদার প্রভৃতি মহোদয়গণ, যাহা সাহায্য করিয়াছেন এবং অন্যান্য স্থান হইতে মাতৃমন্দির সংস্কার কল্পে এক্ষাল পর্য্যন্ত যে সকল আর্থিক সাহায্য প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে তাহা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়া সাধারণের দৃষ্টিগোচর করা হইল।

বর্ত্তমানে এ কার্য্যে পৃষ্ঠপোষক ও বিশেষ সাহায্যকারী ফরিদপুর জেলার ভূতপূর্ব্ব মেজিষ্ট্রেট বর্ত্তমান হুগলী জেলার সেসন জজ এবং দেশ বিখ্যাত সুবক্তা সুধার্ম্মিক গণ্যমান্য প্রাচীন উকিল শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ও বেনেবহু নিবাসী হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত প্রিয়শঙ্কর রায় মহোদয়গণ উক্ত পুরাকীর্ত্তি পুনঃসংস্কার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন এ জন্য গ্রন্থকার তাহাদের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

দেবকার্য্যে দান সাহায্য আশা।

বড় আনন্দের সহিত সর্ব্বসাধারণকে জানাইতে ইচ্ছুক হইলাম যে, চোর বাগান নিবাসী প্রাতঃস্মরনীয় ৺রাজেন্দ্র লাল মল্লিকের বংশধরগণ দেব দ্বিজে ভক্তিমান সুদাতা অতি বিনয়ী কুমার নগেন্দ্র নাথ মল্লিক ও কুমার ব্রজেন্দ্র লাল মল্লিক উক্ত মাতৃমন্দির সংস্কার কল্পে, "সতীরতেজ" পুস্তক পাঠে তৃপ্তিলাভ করিয়া, আশীর্ব্বাদ উপহার প্রাপ্ত ব্যতীত আরও দুইখানি পুস্তক চাহিয়া লইয়াছেন এবং উদ্দেশ্য জ্ঞাতে গ্রন্থকারকে বহু প্রশংসা করিয়াছেন।

তৎপরে মাতৃমন্দির সংস্কারকল্পে কিছু সাহায্য করিবেন প্রতি-শ্রুত হইয়াছেন এবং তাহাদের গৃহ দেবতা ৺জগন্নাথ দেববিগ্রহের সম্পত্তি নূতন বাজারের সুদক্ষ কর্ম্মচারী ধার্ম্মিকপ্রবর ব্রাহ্মণ পুত্র বাবু চন্দ্রকান্ত মুখোপাধ্যায় দারোগা মহাশয়কে কুমার নগেন্দ্র নাথ মল্লিক মহাশয় স্বয়ং গ্রন্থকারের মোকাবোলা কিছু চাঁদা তুলিয়া দিতে অনুমতি করিয়াছেন। যশস্বী কুমার ব্রজেন্দ্রলাল মল্লিক দারোগা বাবুকে পরামর্শ জন্য ডাকাইয়াছেন। আশা করি দেবকার্য্যে তাঁহাদের সুমতি থাকিয়া ধার্ম্মিক প্রজামণ্ডলীর অক্লেশপ্রদত্ত দান দ্বারা বহু সৎকার্য্যে সাহায্য করুন এবং ধার্ম্মিক প্রজাগণের মঙ্গল সাধন করুন। কোন প্রকার দানের ফলই ব্যর্থ যায় না। যথা—

স্বর্গস্থিতা না মিহোজীবো লোকে।
চত্বারী চিহ্লানী বসন্তী দেহে॥
দান প্রসঙ্গ, মধুরা চ বাণী।
দেবার্চ্চনা চা তিথিতর্পণাশ্চ॥

ভারতীয় জীর্ণ মন্দির সংস্কার সমিতি।

শীঘ্রই গঠিত হইতেছে। একারণ উত্তর পাড়া নিবাসী দেশ হিতৈষী সুধার্ম্মিক নবীন যুবা শ্রীযুক্ত কুমার পঞ্চানন মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং বঙ্গের সুলেখক নায়ক ও প্রবাহিনী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সতীর তেজ উপন্যাস লেখক যোগ-ভক্ত শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়গণ যথেষ্ট মনোযোগী হইয়াছেন। এমন কি এই সমিতি গঠন জন্য ইতিপূর্ব্বে কলিকাতা হইতে গণ্য মান্য কতিপয় ব্যক্তি উত্তরপাড়া গঙ্গাতীরস্থ রাজভবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন, কিন্তু দৈবচক্রে কুমার বাহাদুরের শারিরিক অসুস্থতা বিধায় সফল মনোরথ না হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। পুনঃ উদ্যোগ হইতেছে। প্রার্থনা ভগবৎশক্তি উঁহাদিগের সহায় হউন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

প্রথম সংস্করণে "উপহার টিকিট" বলিয়া আমরা একখানি পত্র শেষভাগে সন্নিবেশিত করিয়াছিলাম। তাহার উদ্দেশ্য সত্যের পরিচয় দেখাইব আর এক সহস্র ক্রেতার মধ্যে দুইজনকে মাত্র প্রদত্ত উপহার দিয়া কিঞ্চিৎ উপকৃত করিব।

কিন্তু দুঃখের বিষয় এ পর্য্যন্ত পাঁচশত টিকিটও সংগ্রহ হইল না। অনেকে শেষ ভাগের পত্রটী পাঠান নাই এই কারণে এবার উপহার টিকিট উঠাইয়া দিয়া, সাধারণের সুবিধার জন্য পুস্তকের মূল্য কিঞ্চিৎ কমান হইল। উত্তম বাঁধাই রাজসংস্করণ ১৸০ স্থলে ১।০ টাকা মাত্র ধার্য্য করা হইল।

বিনীত

প্রকাশক—ডি, এন, গাঙ্গুলী।

সতীর তেজ।

উপন্যাস।

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আত্ম-কাহিনী।

বৈশাখ মাস। চন্দনা নদী এখন ক্ষীণকায়া,—সুউচ্চ পাহাড়, পূরিয়া বালুকারাশি রবি-তাপ দগ্ধ হইয়া বিরাজ করিতেছিল। জল অতি সামান্য—বালবিধবার অধরপ্রান্তের ক্ষীণ হাসির মত ভাসিয়া যাইতেছিল। তখন সন্ধ্যা হইতে বড় অধিক বিলম্ব ছিল না, ওপারে রক্ত—মেঘের কোলে শুভ্র মেঘগুলা উড়িয়া উড়িয়া ফিরিতেছিল! স্নিগ্ধ বাতাস আসিয়া খর কর-তপ্ত ধরণী-বক্ষে শীতলতা বিকীর্ণ করিবার প্রয়াস পাইতেছিল।

সতীর তেজ।

নদীতীরে অতীত দীর্ঘদিনের এক বটবৃক্ষ বসিয়া অতীত দীর্ঘ দিন ধরিয়া বুঝি কাহার বা কিসের চিন্তায় কাল অতিবাহিত করিতেছিল। তাহার শাখায় শাখায় নব কিশলয়,—শ্যাম-সবুজ পত্রকুঞ্জ মধ্যে শ্যামা, দধিয়াল, বৌ-কথা-কও প্রভৃতি বহুবিধ পক্ষী বসিয়া কলরব করিতেছিল।

আমি কোন একগ্রাম হইতে ফিরিতেছিলাম। পল্লীপথে ঘননিলীম বনাণীশ্রেণী সুশোভিত। অধিক ক্লান্ত হই নাই—তথাপি কেমন মনে হইল, একবার বসি না কেন? কত অতীত যুগ হইতে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া এই বৃক্ষ এখানে দাঁড়াইয়া আছে,—আমার মত কত পথিক পথশ্রান্ত হইয়া ইহার তলায় বসিয়াছে—চলিয়া গিয়াছে। গিয়াছে, কোন্ অজানা অতীত রাজ্যে,—তাহারা হয় ত আবার আসিয়াছে—এ বৃক্ষ কি সে কথা [illegible] না? আমি গিয়া অপরাহ্ণ-ছায়া-শীতল সেই বটবৃক্ষতলে উপবেশন করিলাম।

সর্ব্বত্র জনশূন্য—নীরব প্রান্তর ধূধূ করিতেছিল। ক্বচিৎ নদী-তীর হইতে এক ক্রৌঞ্চমিথুন উড়িয়া আসিয়া বসিতেছিল। ক্বচিৎ শ্যামল তৃণ হরিৎশস্পলোভে একটা গাভী সেই দিকে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছিল। ক্বচিৎ কোন ধীবর নদীগর্ভ হইতে মৎস্য ধরিতে ধরিতে নৌকায় বসিয়া একটা গানের ভগ্ন চরণ আবৃত্তি করিতেছিল।

আমি অনন্যমনে সেই বটবৃক্ষের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছিলাম,—কি দেখিতেছিলাম? ঠিক বলিতে পারি না, কি দেখিতে ছিলাম। তবে কিছু যে দেখিতেছিলাম, তাহা নিশ্চয়। নতুবা সেই বটবৃক্ষের দিকে মন এত সংযুক্ত ছিল কেন? মানুষের এমন

অবস্থা হয়, যখন সে কি দেখিতেছে, তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না; - কিন্তু তাহার সমস্ত বৃত্তিগুলি লইয়া মন তাহাই দেখে। হয়ত আমার মনে হইতেছিল, এই বটগাছ এত দীর্ঘদিন এখানে দাঁড়াইয়া আছে,—এ কেন আসিয়াছে, কেন দাঁড়াইয়া আছে,—কে পাঠাইয়াছে কোথায় যাইবে?

কেন এ তত্ত্বের উদয় হইল? তাও বলিতে পারি না। তবে একটি ক্ষুদ্র সূচ দেখিলে হয়ত মানুষের প্রাণে এমন তত্ত্বের উদয় হয়।

সহসা সেই নীরব প্রান্তর মুখরিত করিয়া উচ্চ অথচ মধুর কণ্ঠে গানের স্বর ভাসিয়া আসিয়া আমার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল।" গীত হইল—

"তরু বল্‌রে বল্‌,
কে তোরে সাজা'যে দিল পত্র পুষ্প-ফল?
ছিলি তুই বালির মত·
হ'লি এবে হস্ত শত
কাণ্ড প্রকাণ্ড কত কার কৃত কৌশল?
বল্‌রে তরু কার উদ্দেশে,
গগন ভেদ করি যাও ঊর্দ্ধদেশে,
হ'লি সংসারে এসে কার প্রেমে বিভল?"

চাহিয়া দেখিলাম, এক কৃষক তাহার কৃষিযন্ত্র স্কন্ধে করিয়া দুইটা বলদ তাড়াইয়া ঐ গানটি গাহিতে গাহিতে প্রান্তর-পথে পল্লী অভিমুখে চলিয়া যাইতেছে। গানের আরও অবশিষ্ট আছে—,আরও শুনিতে পাইব, মনে করিয়া আমি গিয়া তাহারি পশ্চাৎ লইলাম।

কিন্তু সে ঐ টুকুই পুনঃ পুনঃ গাহিতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে ডাকিলাম,—সে শিষ্টভাবে আমার সহিত কথা কহিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"এ গানটার আর জান? 'কৃষক বলিল,—"না মশায়, আর খানিক আছে, আমি তা' জানি না।"

আমি বলিলাম,—"যেটুকু গাহিয়াছ, উহার অর্থ কিছু বোঝ?"

কৃষক। অর্থ কাহাকে বলে? টাকা কড়িকে কি? না, চাষামানুষ সে সব খবর টবর বড় জানি না। সারা বৎসর মহাজনের কাছে ধার কোরে খাই,—আর খেটেখুটে মাঠে যা আয় করি, তা' তাঁকেই দিই।

আমি। না, সে অর্থের কথা বলিতেছি না। যে গানটা গাহিলে, তার মানে বোঝ?

কৃষক। গান শিখিছি, তাই গাই—মানে টানের ধার ধারি মানে জানে আমাদের গাঁর পদ্মলোচন ঠাকুর।

আমি। তিনি কি ব্রাহ্মণ?

কৃষক। ব্রাহ্মণের বাবা ব্রাহ্মণ। তিনি গেরুয়া বস্তর পরেন আলো চা'ল খান। কত শাস্তর বেশাস্তরের কথা বলেন।

কি জানি কেন সেই কাল বৈশাখী সন্ধ্যার পূর্ব্বে আমার প্রাণে একটা নিদারুণ আকাঙ্খা জাগিয়া বসিল, কৃষকের পদ্মলোচন ঠাকুরের নিকট গিয়া একটা কথা শুধাইয়া আসিব। কিন্তু যে কথা শুধাইব, তাহা তখনও মনে করিতে পারি নাই। আমার জানিবার কি আছে, তখনও তাহা জানিতে পারি নাই। চুম্বক-শক্তি যেমন লৌহকে টানিয়া লয়, অথচ লৌহ জানে না সে কেন টানিতেছে, আমারও তেমনিই অবস্থা ঘটিল। আমি কৃষককে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তোমাদের পদ্মলোচন ঠাকুর আ'জ বাড়ীতে আছেন বলিতে পার?"

কৃষক। হ্যাঁ আছেন,—আমি দুপুর বেলা যখন মাঠে আসি, তখন তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছি?

আমি। রাত্রে তাঁহার বাড়ী থাকিবার উপায় আছে?

কৃষক। ও মা তা আবার নেই। অতিথ ব'লে তাঁর বাড়ী দাঁড়ালে আর যাবার যো নেই।

আমি। তিনি কি খুব বড়লোক?

কৃষক। না,—তবে জায়গা জমি অনেক আছে,—বাগানভরা আম জাম নারিকেল শুপারি আছে, পুকুরভরা মাছ আছে, গোয়াল-ভরা গরু আছে, মরাইভরা ধান আছে। আপনার বাড়ী কোথায়?

আমি। নলিয়া।

কৃষক। নলিয়া! মোটে দু ক্রোশ পথ। তা' আপনি কোথায় গিয়েছিলে?

আমি। রত্নদিয়া।

কৃষক। সেখানে কেন? ভাগে জমিটমি আছে বুঝি?

আমি। না, আত্মীয় বাড়ী।

কৃষক। আপনি কি ব্রাহ্মণ গা?

আমি। হ্যাঁ।

কৃষক। দাঁড়ান প্রণাম করি।

আমি স্থির হইয়া দাঁড়াইলাম। কৃষক তাহার স্কন্ধস্থিত কৃষি-যন্ত্রখানা ভূমিতলে নামাইল, এবং ভূসংলগ্ন মস্তকে আমাকে প্রণাম করিল। তারপরে যন্ত্রখানা তুলিয়া লইয়া বলদ দুইটাকে একটু দ্রুতগমনের উপদেশ দিয়া আমাকে বলিল,—"আসুন।"

সেও চলিতে লাগিল। আমি তাহার অনুগমন করিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—৩৩৯৬—

পদ্মলোচন ঠাকুর।

বৃক্ষ-বল্লরী-পরিবেষ্টিত শান্তি-সুপ্ত কয়েকখানি খড়ের গৃহে পদ্ম-লোচন ঠাকুরের বাড়ী। আমি সন্ধ্যার সময় সে বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শুনিলাম, ঠাকুর তখন সন্ধ্যাহ্নিক করিতেছেন। একটি দাসী আসিয়া জনহীন মণ্ডপগৃহে একটা প্রজ্বলিত মাটীর প্রদীপ ও এক গাড়ু জল দিয়া আতিথ্য সৎকার করিয়া গেল।

তখনও আমি ইচ্ছা করিলে বাড়ী চলিয়া যাইতে পারিতাম। খালকুলা হইতে আমাদের বাড়ী দুই ক্রোশের মধ্যে,—জ্যোৎস্না রাত্রি। এমন কত দিন চলিয়াও গিয়াছি। কিন্তু কি জানি কেন সে দিন পদ্মলোচন ঠাকুরের নিকট কিছু শুনিতে বাসনা হইল। কিন্তু কি শুনিবার আছে, কি শুনিতে হইবে, কি প্রশ্ন করিব, তাহার কোন স্থিরতা তখনও করিতে পারি নাই। না পারি, তথাপি তাঁহার প্রতীক্ষায় সেখানে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। দাসী যেখানে গাড়ু রাখিয়া গিয়াছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল। আমি যেখানে বসিয়াছিলাম, সেই স্থানেই বসিয়া রহিলাম। প্রদীপটা সেই চাটাই-সমাচ্ছন্ন মণ্ডপের মধ্যে এক কোণে পড়িয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া সান্ধ্য-বাতাসে কাঁপিতে লাগিল।

কতক্ষণ কাটিয়া গিয়াছিল, ঠিক মনে নাই। ঝড় উঠিবার পূর্ব্বে প্রকৃতি যেমন উদাস, স্থির, গম্ভীর ও বিকল হয়, আমার চিত্ত-

ক্ষেত্রও ঠিক তেমনই ভাব ধারণ করিয়াছিল। জানি না, তখন বুঝিতে পারি নাই, এ ঝড় কোন্ দেশের।

প্রশান্তমূর্ত্তি ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার পুরোভাগে দণ্ডায়মান হইলেন। জ্যোৎস্না-কিরণে দিগন্ত উদ্ভাসিত হইতেছিল,—"আমার দিকে চাহিয়াই তিনি বলিলেন,—কে পুরন্দর? তুমি বাবা কোথা হইতে? বাড়ীর সব ভাল ত?

আমি চাহিয়া দেখিলাম,—পদ্মলোচন ঠাকুর। ঠাকুরকে আমি যে না-ই চিনিতাম, এমনও নয়। পল্লীগ্রামের লোক নিজ বাসস্থানের চারিদিকের তিন চারি ক্রোশের লোক চেনে। তবে এমন ঘটনা কোন দিন ঘটে নাই, যে দিন আজিকার প্রাণে তাঁহাকে দেখিয়াছি। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, সব ভাল।"

পদ্ম। হাত পা ধোও নি? জলত অনেকক্ষণ দিয়ে গিয়েছে;

আমি। জল দিয়ে গিয়েছে—হাত-পা ধুই নাই; এই ধুই।

পদ্ম। তোমাকে যেন কিছু অন্যমনস্ক বুঝিতেছি। কখনও এ বাড়ীতে এস নি,—হঠাৎ সন্ধ্যাবেলা আসা। ব্যাপার বুঝিতে পারিতেছি না। সব ভালত?

আমি। ভাল।

পদ্ম। আগমনের কারণটা কি, জানিতে যেন বড়ই কৌতূহল হইতেছে।

আমি। তা' আমিই ঠিক করিতে পারি নাই,—আপনাকে বলিব কি। রসুদিয়া হইতে বাড়ী যাইতেছিলাম। মাঠে, নদী, তটের একটা বটগাছের তলায় বসিয়াছিলাম—বসিবারও যে বিশেষ কারণ ছিল, তাও না। তবে বসিয়াছিলাম। প্রাণটা বড় উদাস হইল,—মনে হইতেছিল, এই বটগাছ কতকাল ধরিয়া

এখানে আছে। আমারই মত কত পথিক এখানে আসিয়াছে—বসিয়াছে—চলিয়া গিয়াছে। যাহারা গিয়াছে, তাহারা এ পৃথিবীতে নাই। কোথায় গিয়াছে—তাই বা কে বলিতে পারে—বটগাছই বা কেন আসিয়াছিল, কোথায় যাইবে। দাঁড়াইয়া থাকিবারই বা উদ্দেশ্য কি—এমনি একটা উন্মাদ-কল্পনা মনোমধ্যে উদিত হইল। আর কল্পনাতেই আমাকে বড় মুগ্ধ, বড় বিব্রত করিল। তারপরে কি জানি একটা চাষার কথায় যন্ত্রাকর্ষিত পুতুলের মত আপনার নিকট আসিয়াছি। কেন তা' জানি না।

পদ্মলোচন ঠাকুর স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া অনেকক্ষণ কি চিন্তা করিলেন। তারপরে মধুর অথচ গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"হাত মুখ ধোও।"

আমি বলিলাম,—"না ঠাকুর, হাত মুখ ধুইতে আসি নাই। কি জন্য আসিয়াছি, তাও জানি না। আপনাকে বলিতে হইবে, কেন আসিয়াছি।"

পদ্মলোচন ঠাকুর হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। অনেকক্ষণ পরে হাসির বেগ নিবৃত্তি করিয়া বলিলেন,—"হাত মুখ ধোও; কারণ অবশ্যই একটা আছে।"

আমি। আপনাকে বলিতে হইবে, সে কারণ কি?

পদ্ম। আমার জ্ঞান হয়, তোমার কর্ম্মাশয়স্থ অব্যক্ত কোন কর্ম্মবীজ ব্যক্ত হইবার চেষ্টা করিতেছে। একটু সাহায্য চাই।

আমি। আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

পদ্ম। বটবৃক্ষ দেখিয়াছ?

আমি। বটতলে বসিয়াই এত কাণ্ড ঘটিয়াছে, তা' আর দেখি নি!

পদ্ম। যে গাছটার তলায় বসিয়া ছিলে, সে গাছটা কত বড় ?

আমি। প্রকাণ্ড—বহু শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট, অনুমান দশ কাঠা জমি যুড়িয়া বসিয়া আছে।

পদ্ম। এখন উহা সেই বটবৃক্ষের ব্যক্তাবস্থা। উহার বীজাবস্থার কথা মনে করিতে পার ? ক্ষুদ্র একটু বালির মত ছিল হয়ত সেই বীজ টুকু কোথাও তোলাছিল,—হয়ত তাহার কোন কর্ম্মই ছিল না। হটাৎ একদিন মাটিতে পড়িয়া, তাহার অনুকুল জল বায়ুর সহযোগ হইল—সে প্রকাণ্ড একটা বৃক্ষে পরিণত হইল। এ জগতের সর্ব্বত্রই ঐরূপ বীজ আছে—সময়াদির সহযোগে তাহা ব্যক্ত হয়।

আমি কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া বিষয়টা বুঝিবার চেষ্টা কারলাম। কিন্তু পারিলাম না। বলিলাম—"আপমার কথাত বুঝিলাম না।"

পদ্ম। কি বুঝিলে না ?

আমি। বীজ ও বৃক্ষের তুলনার সহিত আমার কথার সম্বন্ধ কি ?

পদ্ম। সম্বন্ধ আছে বৈ কি। তোমার চিত্তক্ষেত্রে যে কর্ম্মবীজ নিহিত আছে, সে অব্যক্তভাবে আছে, এখন ব্যক্ত হইতে চাহিতেছে—সময় আসিয়াছে, সাহায্যের প্রয়োজন। তাই আমার কাছে আসিয়াছ। মানুষের সর্ব্বদাই এমন অবস্থা ঘটিতেছে। যাহার চিন্তা, টাকারূপে চিত্তক্ষেত্রে কর্ম্মবীজ হইয়া রহিয়াছে,—সে টাকা পাইবে অর্থাৎ তাহার চিন্তা টাকারূপ ধারণ করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হইবে,—সময় আসিল, হটাৎ একজন সাহায্য করিল—সে টাকা পাইয়া গেল। একজনের কর্ম্মবীজ সে মদ খাইয়া মাতাল হইবে; তাহার কর্ম্মবীজ বা অদৃষ্টে তাহাই

আছে। সময় আসিলে, সঙ্গী যুটিল সে মাতাল হইয়া পড়িল। একজনের চিত্তে ধর্ম্মবীজ আছে—বীজ বৃক্ষে পরিণত হইবে, সময় আসিয়াছে—সাহায্য মিলিলে সে সংসারত্যাগী উদাসী হইয়া পড়িবে অথবা তাহার বীজভাবানুসারে ধার্ম্মিক হইবে।

আমি নিস্তব্ধে কথিত বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলাম।

পদ্মলোচন ঠাকুর বলিলেন,—এখন হাত মুখ ধোও। একটু জল খাও। তারপরে অন্যান্য কথা হইবে এখন।"

আমি গিয়া জলের গাড় লইয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলাম।

ঠাকুর তখন গৃহমধ্যে গিয়া একটা আস্তৃত মাদুরের উপরে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমি গৃহমধ্যে গমন করিলাম। সেখানে আমার জলখাবার প্রস্তুত ছিল। ঠাকুরের আদেশে তাহা ভোজন করিয়া, অপর একখানা আসনে উপবেশন করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—)০*০(—

দীক্ষা।

পদ্মলোচন ঠাকুর মৃদুহাস্যাধরে প্রশান্তস্বরে বলিলেন,—"আমার জ্ঞান হইতেছে, তোমার চিত্তক্ষেত্রে ধর্ম্মবীজ নিহিত আছে,—এক্ষণে ব্যক্ত হইতে ইচ্ছুক।"

অমি বলিলাম—"আপনি সে কথা অনেকক্ষণ হইতেই বলিতেছেন, কিন্তু যে ধর্ম্ম কি তাহাই বোঝে না, তাহার আবার ধর্ম্ম হইবে কি প্রকারে ?

পদ্ম। ধর্ম্ম বোঝে না, এমন মানুষ নাই।

আমি। অসম্ভব কথা—ধর্ম্ম বোঝেনা, এমন মানুষই পনের আনা। বোঝে এমন লোক যদি এক আনা থাকে।

পদ্ম। ধর্ম্ম কাহাকে বলে ?

আমি। জপ তপ পূজা অর্চ্চনা ইহাই কি ধর্ম্ম নহে ?

পদ্ম। না—ধর্ম্মালোচনার প্রথম সোপান হইতে পারে ?

আমি। তবে ধর্ম্ম কি ?

পদ্ম। তুমি শিক্ষিত। ধর্ম্ম শব্দের ধাত্বর্থ কি বল দেখি।

আমি। ধ্রি ধাতু হইতে ধর্ম্ম। ধারণা করে যে, সেই ধর্ম্ম; অথবা যদ্দ্বারা ধারণা করা যায়, তাহাই ধর্ম্ম।

পদ্ম। ভাল কথা। আচ্ছা, কি ধারণা করা যায় বল দেখি ?

আমি। তা ঠিক বলিতে পারিলাম না।

পদ্ম। আমি কি এবং দেহাদি কি, কেন জন্মিয়াছি, কোথায় যাইব ইত্যাদি।

আমি। তাহা হইলে কি হয়?

পদ্ম। এই জ্ঞান হইলেই মুক্তি হয়।

আমি। কাহার মুক্তি?

পদ্ম। আত্মার।

আমি। আত্মা কি?

পদ্ম। সমস্ত বিশ্বের আদিবীজ। রজ্জু যেমন সর্পজ্ঞানের আধার, তেমনি এই আত্মাই সমস্ত বিশ্বের আধার। নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ এবং অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ। ইহাতেই স্থূল সূক্ষ্ম ও জ্ঞানাখ্য শরীরত্রয় বিলীন হইয়া থাকে। এই আত্মা হইতেই ক্রিয়াশক্তি, অন্তঃকরণ অর্থাৎ জ্ঞানশক্তি এবং সমস্ত জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়, দেহাদি, আকাশ, বায়ু, জ্যোতি, জল এবং সর্ব্ববিধায়িণী পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। তিনি দেশ, কাল ও বস্তু দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, সমস্ত প্রাণীর হৃদয়াভ্যন্তরস্থ, সমস্ত প্রাণী হইতে অভিন্ন, সকল কার্য্য ও কারণের আধার স্বরূপ, পরিব্যাপক অথচ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং নিত্য পদার্থ।

আমি। যদি আমরা সেই আত্মা হইলাম, তবে বন্ধন হইল কেন? নিত্য মুক্ত পদার্থের আবার বন্ধন কি?

পদ্ম। মাকড়সা যেমন আপনি জাল প্রস্তুত করিয়া আপনার জালে আপনি বদ্ধ হয়,—আত্মাও তেমনি মায়াজাল বিস্তার করিয়া বদ্ধ হন।

আমি। সে বদ্ধাবস্থা কি?

পদ্ম। অনাত্মস্বরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মাভিমান

অর্থাৎ দেহাদিই আত্মা এইপ্রকার যে অভিমান, তাহাই আত্মার বন্ধন।

আমি। মুক্তি?

পদ্ম। দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির নিবৃত্তিই মুক্তি।

আমি। দেহাদিতে এরূপ আত্মাভিমান হয় কেন?

পদ্ম। অবিদ্যা।

আমি। অবিদ্যা কি?

পদ্ম। বিদ্যা ও অবিদ্যা ব্রহ্মেরই কল্পিত কথা। অনাত্মস্বরূপ দেহাদির প্রতি ঐপ্রকার অভিমান যে জন্মাইয়া দেয়, তাহা অবিদ্যা;—আর পূর্ব্বোক্ত অভিমান যদ্দ্বারা নিবৃত্তি হয়, তাঁহাই বিদ্যা।

আমি। আমি আপনার কথা এখনও ভাল বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

পদ্ম। কি বোঝ নাই, বল?

আমি। আত্মা সর্ব্বব্যাপ্ত—তবে আমিত্বের এ গণ্ডি কেন?

পদ্ম। পূর্ব্বেইত বলিয়াছি—অবিদ্যা কর্তৃক এইরূপ জ্ঞান হয়।

আমি। তবে আমি তুমি কিছু নহে? যদি তা না হয়, তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম কি? পাপ-পুণ্য কি? আর যদিই পাপ-পুণ্য থাকে, তবে একজনের পাপে সকলের নরক হয় না কেন? এক জনের পুণ্যে সকলের সুখ হয় না কেন? এক জনের টাকায় সকলে বড়লোক হয় না কেন?

পদ্ম। বুঝিতে পার নাই। নদী দেখিয়াছ?

আমি। রোজ রোজইত দেখি।

পদ্ম। নদীর তরঙ্গ দেখিয়াছ?

আমি। কেন দেখিব না।

পদ্ম। তরঙ্গ কি সর্ব্বদাই হয়?

আমি। না।

পদ্ম। কখন হয়?

আমি। যখন বাতাস উঠে।

পদ্ম। নদীর জল আর তরঙ্গে প্রভেদ কি?

আমি। জলও যা, তরঙ্গও তা।

পদ্ম। কিছু প্রভেদ নাই কি?

আমি। হাঁ আছে।

পদ্ম। কি?

আমি। নদীর জল বাতাসশূন্য,—আর তরঙ্গ বাতাস-পূর্ণ।

পদ্ম। সেই প্রকার পরমাত্মা মায়াশূন্য,—আর জীবাত্মা মায়াপূর্ণ। কিন্তু জল আর তরঙ্গে যেমন প্রভেদ নাই, পরমাত্মা ও জীবাত্মায় তেমনি প্রভেদ নাই। বায়ুশূন্য হইলে তরঙ্গ যেমন যে জল সেই জলই থাকিবে,—জীবাত্মা তদ্রূপ মায়াশূন্য হইলে যে পরমাত্মা সেই পরমাত্মাই থাকিবে। কিন্তু তরঙ্গ জল হইলেও যখন বায়ুসহযোগে সে তরঙ্গাকার ধারণ করিয়াছে, তখন তাহাকে তরঙ্গ বলিতে হইবে। আবার যে তরঙ্গটির মধ্যে যত অধিক বায়ু প্রবেশ করিয়াছে, সে তত অধিক সময় তরাঙ্গাকারে বর্ত্তমান থাকিবে।

আমি। বুঝিলাম। কিন্তু সে জীবাত্মার কত দিনে মুক্তি হয়?

পদ্ম। যতদিন অবিদ্যা-বায়ু বিদূরিত না হয়।

আমি। ভাল,—আমরা যে স্বর্গ-নরক, সুখ-দুঃখ জন্মমৃত্যু বলিয়া ধারণা করি, এ সকল কি মিথ্যা?

পদ্ম। হাঁ, মিথ্যা বটে। কিন্তু তরঙ্গের অবস্থা যেমন কিছুই নহে, জলেরই অবস্থামাত্র,—আর যখন তরঙ্গের নাম-রূপ হইয়াছে, তখন স্বীকারও করিতে হয় যে, তরঙ্গ তরঙ্গ; তেমনি জন্ম-মৃত্যু সুখ-দুঃখ, পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক আত্মার মায়িক অবস্থা হইলেও সত্য বলিয়া স্বীকারও করিতে হয়।

আমি। ঐসকল কি আত্মারই অবস্থা মাত্র?

পদ্ম। হাঁ, বায়ুসহযোগে যেমন তরঙ্গ জলেরই অবস্থামাত্র, তেমনি অবিদ্যাসহযোগে ঐ সকল আত্মার অবস্থা মাত্র। ঐ যে গ্রহ উপগ্রহ নক্ষত্র দেখিতেছ,—ঐ যে নদ-নদী-পর্ব্বতমেখলা ধরিত্রী দেখিতেছ,—ঐ যে জীবসংঘের কর্ম্ম-কোলাহল লক্ষ্য করিতেছ,—এ সমস্তই অবিদ্যাক্রান্ত আত্মার অবস্থামাত্র।

আমি। অবস্থা অবশ্যই বিভিন্ন প্রকারের?

পদ্ম। হাঁ, অবস্থা চারি প্রকার।

আমি। কি কি?

পদ্ম। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়।

আমি। এই চারি অবস্থা বিশদ করিয়া বুঝাইয়া দিন।

পদ্ম। বহিঃপ্রকাশিত মন, বুদ্ধি, চিন্তা, অহঙ্কার, কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই চতুর্দ্দশ করণ দ্বারা যথাক্রমে সঙ্কল্প, অধ্যবসায়, চেতনা, অভিমান, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, মুখব্যাদান, গমন, মলমূত্রপরিত্যাগ এবং আনন্দ এই সমস্ত স্থূল বিষয়ের উপভোগ করা যায় যে সময়ে, সেই সময়কে জীবাত্মার জাগ্রত অবস্থা বলা যায়। যে সময়ে শব্দাদি বিষয়রাশি উপস্থিত না থাকিলেও বিষয়বাসনাবাসিত হইয়া মন বুদ্ধি চিত্ত ও অহঙ্কার এই অন্তঃকরণচতুষ্টয় দ্বারা বাসনাময় শব্দাদি বিষয়সমূহের

উপলব্ধি করে, তাহার নাম স্বপ্নাবস্থা *। আর যে সময়ে পূর্ব্বোক্ত চতুর্দ্দশ করণ স্ব স্ব কারণে উপরত হইয়া যায়, সুতরাং বিষয়ের কোন প্রকারেই (সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বা বাসনারূপে) উপলব্ধি হয় না, তাহাই আত্মার সুষুপ্তি অবস্থা। যখন আত্মা জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় হইতে বিমুক্ত হয়েন এবং সমস্ত পদার্থরাশি হইতে সংস্পৃষ্ট হইয়া উহাদের সাক্ষিস্বরূপ বিরাজমান থাকেন এবং যখন ইহার কোন প্রকার বস্তু ব্যবধায়ক থাকে না, কেবল একমাত্র আত্মাই প্রকাশস্বরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাহাই তুরীয় অবস্থা।

আমি। জন্ম-মৃত্যু, ইহলোক, পরলোকে কোন্ শরীরে গতাগতি হয়?

পদ্ম। লিঙ্গশরীরে।

আমি। লিঙ্গ শরীর কি প্রকার?

পদ্ম। যে আত্মার উপাধিবিশেষ অনিত্য হইয়াও নিত্য আত্মার সন্নিধান বশতঃ নিত্য বলিয়া অবভাসিত হয়, তাহাকেই লিঙ্গশরীর বলে। ইহার আর একটি নাম হৃদয়গ্রন্থী। এই লিঙ্গ-দেহোপহিত হইয়া যে চৈতন্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম ক্ষেত্র।

আমি। ইহলোকে পরলোকে গতাগতি হয় কেন?

---

* আমাদের যাহা কল্পনা, যাহা চিন্তা, যাহা বাসনা, স্বপ্নাবস্থায় আত্মা তাহাই ভোগ করেন। আত্মা এক,—স্বপ্নাবস্থায় তিনিই বহু হন। যে ভয় দেখায়, সেও তিনি; যে ভীত হয়, সেও তিনি। বাসনার বিষয় লইয়া বহু হইয়া ক্রীড়া করিতে থাকেন। স্বপ্ন একবারে অমূলক বা অলীক এ কথা বলা যায় না। স্বপ্নের ক্রন্দন-অশ্রুতে উপাধান ভিজিয়া যায়। স্বপ্নের রমণী কি পুরুষ সহবাসের আনন্দ হয়। স্বপ্নের অবস্থা অবগত হইতে পারিলে জাগ্রতের সমস্ত অবস্থা জানা যায়।

পদ্ম। আমরা যে সকল চিন্তা করি, তাহাকে কর্ম্ম বলে।

আমি। বুঝিতে দিন,—চিন্তাকেই কি কর্ম্ম বলে?

পদ্ম। চিন্তাই কর্ম্ম—চিন্তা যখন বাহিরে প্রকাশ পায়, তখনই দেখিতে পাই। চিন্তাই হস্তপদাদিকে কর্ম্ম করায়।

আমি। তারপর?

পদ্ম। সেই চিন্তা কতক বাহিরে প্রকাশ পায়, কতক চিন্তা-ক্ষেত্রে দাগরূপে থাকিয়া যায়—ইহাকে সংস্কার বলে। সংস্কারই আমাদিগকে ইহ-পরলোকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়। চিন্তাই আমাদিগকে ইহ-পরলোকে সুখ-দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে।

আমি। পরলোকে কি হয়, স্থূল চক্ষুতে তাহা দেখা যায় না কি?

পদ্ম। সে কথা কেন?

আমি। একথা দৃঢ় ধারণা হয়।

পদ্ম। আমাদের চক্ষু স্থূল—সে জগৎটা সূক্ষ্ম—কি প্রকারে দেখা যাইবে?

আমি। উপায় নাই কি?

পদ্ম। আছে।

আমি। সে উপায় বলিয়া দিন না।

পদ্ম। সাধন দ্বারা দিব্য চক্ষু লাভ। অথবা কোন মহা-ত্মার কৃপাতেও ঐ শক্তি জন্মিতে পারে।

আমি। এমন মহাত্মার সাক্ষাৎ কোথায় মিলে?

পদ্ম। তুমি ইংরেজী শিক্ষিত। চিন্তাশক্তির প্রভূত ক্ষমতার কথা অবগত আছ। চিন্তা দ্বারা সেরূপ মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ হইতে পারে। চিন্তাকেই ধ্যান বলা যায়।

এই সময় আহারের ডাক পড়িল। আমরা উভয়ে উঠিয়া গেলাম।

আহার করিলাম বটে, কিন্তু কি খাইলাম-কি করিলাম,—সে দিকে বড় লক্ষ্য ছিল না। প্রাণের কানে যেন কি একটা নবীন আকাঙ্ক্ষার ভৈরবী রাগিণীর ধ্বনি হইতেছিল। সে রাত্রি সেই স্থানেই কাটিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—০০✕০০—

প্রবাসে।

পর দিন উঠিয়া বাটী চলিলাম। শেষ বসন্তের নূতন প্রভাত, —প্রভাতের শীতল বাতাস নবোঢ়া প্রণয়িনীর নূতন করস্পর্শের ন্যায় স্নিগ্ধ কম্পনের সহিত মর্ম্মত্বক্ স্পর্শ করিতেছিল। বিবিধ বিহঙ্গ বিবিধ ভঙ্গীতে প্রভাতী ধরিয়াছিল। বৃক্ষলতার নবকুসুম —নব কিশলয়—নবীন যৌবন-শ্রী প্রকৃতির কোলে যেন রসভারে ফাটিয়া পড়িতেছিল।

আমি পল্লীপথে চলিয়া যাইতেছিলাম। প্রাণে যেন আগেকার মত বাঁধন ছিল না,—হৃদয়গ্রন্থী খসিয়া যেন কেমন এলোমেলো হইয়া গিয়াছিল। গ্রাম্যপথে কৃষকপত্নীগণ নদীতে জল আনিতে যাইতেছিল, দেখিয়া মনে হইল—ইহারা কিজন্য ছুটাছুটি করি-তেছে? কে কাহার?

যথা সময়ে বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম। অপর কেহ আমার অবস্থান্তর লক্ষ্য করিতে পারিয়াছিল কি না জানি না। কিন্তু গৃহিণীর লক্ষচ্যুত হইতে পারিলাম না। মধ্যাহ্নে যখন বিশ্রাম জন্য শয়ন-কক্ষে ছিলাম, তখন গৃহিণী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমার কি হইয়াছে?

আমি হাসিয়া বলিলাম—"এমন ত কিছু দেখিতেছি না।"

গৃহিণী। বড় অন্যমনস্ক,—জিজ্ঞাসা করিয়া এক কথার, আর

উত্তর মিলিতেছে। খাইতে বসিয়া ঝোলের আগে দুগ্ধ খাইয়া ফেলিয়াছিলে। ব্যাপার কি ?

আমি। অনুমান কর।

গৃহিণী। (হাসিয়া) পেত্নীতে পায় নাই ত ?

আমি। তুমিত ওঝা আছ, বিচার করিয়া দেখ।

গৃহিণী। আমি তোমার খুব বড় ওঝাই বটে। কিন্তু পেত্নীতে পাওয়ার লক্ষণই যেন বোধ হইতেছে। ধরিতে পারিলে ঝাঁটা দিয়া ঝাড়াইতাম।

আমি। প্রেমের কোন লক্ষণ বুঝিতেছ নাকি ?

গৃহিণী। অবস্থাটা সেই রকমেরই—

"দণ্ডে শত বার আঁখি প্রসারণ
কে যেন আসিছে কোথা।
মন উচাটন নিশ্বাস সঘন
রাধারে পাইল ভূতা।"

আমি। না গিন্নী, তা নয়।

গৃহিণী। তবে কি হইয়াছে ?

আমি। কি যে হইয়াছে, তোমাকে ঠিক বুঝাতে পারিব না। কা'ল হইতে—কোথাও কিছু নাই মনে হইল, কে আমি, কোথা হইতে আসিয়াছি,—কোথায় যাইব ? আমাদের জীবনের এই স্থানেই শেষ পরিণতি,—এই জন্মের-মৃত্যু শেষ মৃত্যু—না আর কিছু আছে ! সুকর্ম্ম কুকর্ম্ম—পাপ পুণ্য—এ সকলের দণ্ড পুরস্কার কিছু আছে কি না ! ইহ-পরলোক আছে কি না,—এমনই একটা তত্ত্বের কথা মনে হইল ! মীমাংসার জন্য পদ্মলোচন ঠাকুরের নিকট গিয়াছিলাম—কা'ল রাত্রে সেই স্থানেই অতিবাহিত করিয়াছি।

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—"তিনি অবশ্যই তোমাকে বলিয়া দিয়াছেন—

"ফুল্ল আনন খানি হেরিলেই অনুমানি
গগনের পূর্ণ শশী যেন।
মধু মাখা হাসি রাশি জ্যোৎস্নাসম পরকাশি
হৃদাকাশ আলো করে হেন।
চিন্তারূপ অন্ধকার সেখানে থাকে না আর
অন্তর সুধায় ভ'রে যায়।
গৃহিণী সমান আর নাহি দেখি চমৎকার
প্রাণ জুড়াবার বস্তু আছয়ে ধরায়॥"

আমি হাসিলাম। কিন্তু আগে যেমন গৃহিণীর কথায় প্রাণভরা আমোদ পাইতাম,—প্রাণ খুলিয়া হাসিতে পারিতাম, আজ যেন তেমনটা হইল না। বৃষ্টির পর মন্দ বিদ্যুতের মত হাসি অতীব্র—অনুজ্জ্বল। কেমন যেন জ্ঞান হইতে লাগিল—গৃহিণীর অন্তরস্থ বিরাট চৈতন্য মায়ার বিকাসে আমাকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছেন। যাহাকে গৃহিণী বলিয়া বুঝিতেছি,—যে হাসি দেখিতেছি—যে কটাক্ষ বর্ষিত হইতেছে,—ও সবইত জড়—সবইত মায়া। এই আছে, এই নাই। উহা স্বপ্নের রমণীর ন্যায় মিথ্যা। জাগরণে মিলাইয়া যাইবে। যাহা সত্য—যাহা অবিনাশী—সেই ধ্যেয়। কিন্তু সে কেমন?

গৃহিণী বুঝিলেন, তাহার স্বামী আর তেমন নাই। তিনি বুঝি বিপদ্ গণিলেন।

তারপর ছয় মাস কাটিয়া গেল। ক্রমেই সংসারের উপর আমার চিত্ত যেন বীতরাগ হইয়া পড়িল। কোন কার্য্য মনে থাকিত

না। বিষয় কাজে অনেক গোলযোগ চলিতে লাগিল। তখন আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সে সকলের ভার গ্রহণ করিল।

আমিও অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু হস্ত পদ বিশিষ্ট একটা মানুষ আমি,—না ধর্ম্মের দিকে যাইতে পারিতেছি, না কাজ কর্ম্মের দিকে থাকিতে পারিলাম। তখন স্থির করিলাম, কলিকাতায় গিয়া একটা চাকুরী করি, তাহাতে নিয়মিত আফিসের কাজ করা ব্যতীত অপর ঝঞ্ঝাট কিছুই নাই। আর সমস্ত সময় অলসভাবে কাটাইতে পারিব। এখন আমার পক্ষে তাহাই সুবিধা।

বাড়ী হইতেই এক সওদাগরী আফিসে চাকুরীর জন্য দরখাস্ত করিলাম। দশ দিনের পরে উত্তর আসিল,—অশীতি মুদ্রা মাসিক বেতনে চাকুরী হইয়াছে। যথা সময়ে ব্যাগ-ব্যাগেজ সহ গৃহিণীর নিকট বিদায় লইয়া কলিকাতায় গমন করিলাম।

তখন আশ্বিন মাস। বর্ষার পরে শরতের আগমনে প্রকৃতি প্রফুল্ল। আর দিবা রাত্রি বারিপাত ও বিদ্যুদ্বিকাশ নাই। আকাশ নীল,—কেবল মধ্যে মধ্যে সেই দিগন্ত প্রসারিত নীলিমার মধ্যে দুই একখানি বর্ষণলঘু, ক্রীড়াচঞ্চল, শুভ্র অভ্র ভাসিয়া যায়। তাহাদের বিদ্যুদ্বিকাশ রোগ-কাতর শীর্ণ অধরে ম্লান হাসির সহিত উপমেয়। আমি সিমলার এক পল্লীতে বাসা লইয়াছিলাম,—এবং অফিসের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলাম।

কিন্তু এই প্রবাস-বাসেও যে, মনে সবিশেষ কোন শান্তি পাইয়াছিলাম, তাহা নহে। বরং নিস্তব্ধ পল্লীগ্রামে আপন মনে দিন কাটাইতে পারিতাম, আর কলিকাতায় আসিয়া যেন কর্ম্ম-স্রোতের মধ্যে ডুবিয়া পড়িতে লাগিলাম। আমার মনে হইত, দিন-গুলা বৃথাই কাটিয়া যাইতেছে,—যাহার আশায় গৃহের বাহির

হইলাম, তাহা মিলিল না,—তবে এখন কি করি, কোথায় যাই। কখনও ভাবিতাম, আরও দূরে যাই—কোন পর্ব্বতগুহায় কিম্বা গহন বনে আশ্রয় লইগে। কিন্তু কেন যাইব- সেখানে গিয়া কি করিব, তাহাও বুঝিতে পারিতাম না।

বুঝিতেছি, আপনারা আমার এই নীরস কাহিনী শুনিতে বড়ই বিরক্ত হইতেছেন। গল্পের মধ্যে না আছে ছুটো মেয়ে মানুষ,—না আছে প্রেমের 'হা হতোস্মি', না আছে মনসিজের মহদ-ভিনয়!

না তা' নাই। কিন্তু একজনের প্রাণের কাহিনী, একটি মানবের জীবনতত্ত্ব শ্রবণ করা উচিত।

আপনারা যদি একান্ত আমার কাহিনী না শুনিতে চান,—তবে আমার কলিকাতা বাসের ফলে আমি যাহা দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছিলাম, এবং যে ঘটনার সহিত পদ্মলোচন ঠাকুরের আশীর্ব্বাদ লাভে সক্ষম হইয়াছিলাম,—সেই ঘটনা বলিতেছি শুনুন। তাহাতে সুন্দরী রমণী আছে—প্রেমের নিশি-জাগরণ আছে—সতীর দিব্য তেজ আছে!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দম্পতি।

বিভূতিভূষণ রায়; কলিকাতার কোন এক পল্লীতে বাস। সংস্কৃত কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিয়াছেন। হঠাৎ পিতৃহীন হওয়াতে আর কলেজে পড়া হইল না। মাতৃদেবী তৎপূর্ব্বেই পরলোক গমন করিয়াছেন। সংসারে চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্কা এক মাত্র পত্নী ব্যতীত আর কেহই নাই। সন্তানাদি হয় নাই। সন্তান সন্ততি হইবার জন্য অনেক দৈবকার্য্য ইত্যাদি করা হইয়াছে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। বিভূতিভূষণের বয়স দ্বাত্রিংশ বৎসর। বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মালোচনা করিতেন। সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা করিতেন, যথাশক্তি তাঁহাদের আতিথ্যসৎকার করিতেন, দেবদ্বিজে ভক্তি, দরিদ্রকে দান, আতুরের শুশ্রূষা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল তাঁহার হৃদয়ে বিরাজ করিত। পিতা কিছু সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর বিভূতিভূষণকে অগত্যা চাকুরীর চেষ্টা করিতে হইল। পিতা কিছু ঋণও রাখিয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং বিভূতিভূষণের অবস্থা তাদৃশ নহে, তাহা বোধ হয় পাঠক বুঝিয়াছেন। পঞ্চাশ টাকা বেতনের একটী চাকুরী জুটিল। তাহা হইতেই স্বামী স্ত্রীতে দুই জনে সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

দম্পতি-যুগলে পরম সুখে দিন কাটাইতে লাগিলেন; কিন্তু

নিরবচ্ছিন্ন সুখ কয় জনের ভাগ্যে ঘটে। মাঘ মাসে বিভূতিভূষণের স্ত্রী কমলমণির সঙ্কটজনক পীড়া উপস্থিত হইল। ৭।৮ দিন যাবৎ জ্বর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে জ্বর বাতশ্লেষ্মা বিকারে পরিণত হইল। বিভূতিভূষণের আফিস বন্ধ, দিন রাত্রি সেবা শুশ্রূষা করিতে হয়। সুচিকিৎসা ও শুশ্রূষা সত্ত্বেও দেখিতে দেখিতে ৪০ দিন অতিবাহিত হইল। কমলমণি আরোগ্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু দেহ কঙ্কালসারবিশিষ্ট। তখন বসন্তকালের দক্ষিণা বাতাস বহিতে আরম্ভ করিয়াছে। এবং উষ্ণ নিশীথের চন্দ্রালোকও সীমন্তিনীদের উন্মুক্ত শয়নকক্ষে নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

কমলমণি শয্যায় শয়ন করিয়া আপন মনে চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় বিভূতিভূষণ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন আছ?" তখন তিনি সেই রোগশীর্ণ মুখে সকৃতজ্ঞ নয়নে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে "ভাল আছি" বলিয়া উত্তর দিলেন।

মানুষের মনে যখন একটা প্রবল আনন্দ, একটা বৃহৎ প্রেমের সঞ্চার হয়, তখন মানুষ মনে করে আমি সব করিতে পারি। তখন হঠাৎ একটা আত্মবিসর্জ্জনের ইচ্ছাও বলবতী হইয়া উঠে। স্রোতের উচ্ছ্বাস যেমন কঠিন তটের উপর আপনাকে সবেগে মূর্চ্ছিত করে, তেমনি প্রেমের আবেগ আনন্দের উচ্ছ্বাস একটা মহৎ ত্যাগ— একটা বৃহৎ দুঃখের উপর আপনাকে যেন নিক্ষেপ করিতে চাহে।

সেইরূপ অবস্থায় অত্যন্ত পুলকিত চিত্তে একদিন কমলমণি স্থির করিলেন যে, আমার স্বামীর জন্য আমি খুব বড় একটা কিছু করিব। কিন্তু হায়! মানুষ যাহা ইচ্ছা করে, সকলগুলিই যে পূর্ণ হইবে, তাহা হয় না। ঐশ্বর্য্য নাই, বুদ্ধি নাই, ক্ষমতা নাই, শুধু

একটা প্রাণ আছে; সেটাও যদি কোথাও দিবার ক্ষমতা থাকে, এখনি দিয়া ফেলি, কিন্তু তাহারই বা মূল্য কি?

আর স্বামীকে যদি দুগ্ধফেনের মত, শুভ্র নবনীর মত, শিশু কন্দর্পের মত সুন্দর একটী স্নেহের পুত্তলি সন্তান দিতে পারিতাম, তাহা হইলে জীবনের সমস্ত সাধ পূর্ণ হইত। কিন্তু মানুষের হাত নাই, প্রাণপণ চেষ্টা করিলেও, মরিয়া গেলেও তাহা হইবার উপায় নাই। তখন ভাবিলেন যে, স্বামীর আর একটা বিবাহ দিতে হইবে কমলমণি মনে করিলেন স্ত্রীলোকে এই কার্য্যে এত কাতর হয় কেন? ইহা এমন কি কঠিন কাজ! স্বামীকে যে ভালবাসে, সপত্নীকে ভালবাসা তাহার পক্ষে কি এমন অসাধ্য!

কমলমণি বিভূতিভূষণের কাছে বিবাহ প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু বিভূতি তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বারও কর্ণপাত করিলেন না। কমলমণিও দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়া বসিলেন যে, পুত্রার্থে স্বামীর বিবাহ দিবেন।

এদিকে বিভূতিভূষণেরও মনের ভাব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধে কোন আলোচনা হয় নাই, সুতরাং পুত্রকামনায় দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করিবেন, তাহা কখনও মনে উদয় হয় নাই। কমলমণি বারংবার এই প্রস্তাব করায় ক্রমে তাঁহার মনে পুত্র-কামনার বীজ অঙ্কুরিত হইল। যত দিন যায়, ততই সেই বীজ বৃদ্ধি হইয়া বৃহৎ আশাবৃক্ষে পরিণত হইতে লাগিল। অর্থাৎ সন্তানপরিবৃত গৃহের সুখময় চিত্র তাঁহার মনে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল।

কমলমণি নিজেই চেষ্টা করিয়া একটী ত্রয়োদশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যার সন্ধান পাইলেন। সপত্নীর উপর সহজে কেহ বিবাহ দিতে

সম্মত হয় না, তাহার উপর বিভূতিভূষণ অতুলৈশ্বর্য্যের অধিকারী নহে, সামান্য গৃহস্থ মাত্র। কিন্তু বিদ্যা বুদ্ধিতে যথেষ্ট খ্যাতি এবং তাহার স্ত্রীই নিজে চেষ্টা করিয়া বিবাহ দিতেছে, সুতরাং পাত্রীর অভাব হইল না। কমলমণি কন্যাটীকে নিজের বাড়ীতে আনাইলেন। বিভূতিভূষণ তাড়াতাড়ি আফিসে যাইতে হইবে বলিয়া স্ত্রীকে ভাত বাড়িতে বলিলেন। কমলমণি স্বামীর আহারের আয়োজন করিয়া দিয়া সম্মুখে একখানি আসনে সেই কন্যাটিকে বসাইয়া রাখিলেন। বিভূতি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ কে ?"

কমল। আমার মাস্‌তুতো ভগিনী।

বিভূতি। উহাকেত কই কখনও দেখি নাই!

কমল। দেখাইবার জন্য আনাইয়াছি।

বিভূতি। বেশ ভাল! তোমার নাম কি ?

কমল। লজ্জা মেয়েমানুষের কি বুড়ী হলে হয়, না কচি খুঁকির থাকে ? লজ্জা যা কিছু ঐ ১২।১৩ বছরের মেয়ের। ও তোমাকে বিয়ে ক'র্‌বে ব'লে আপনি এসেছে।

বিভূতি। আমার বিয়ে হ'য়েছে, এখন উহার দিদি যদি বিয়ে করে ত করুক্‌।

কমল। ও সব কথা থাক্‌; এখন উহার মা বাপ হাতে তুলিয়া দিয়া গিয়াছে, আমিও তাহাদের আশ্বাস দিয়াছি, পুরুত ঠাকুরকে ডাকিয়া একটা দিন দেখিয়া বিবাহ কর। ছেলে পিলে নইলে কি সংসার ভাল লাগে।

বিভূতি। তুমি নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারিলে। ভবিষ্যতে আমাকে দোষ দিতে পারিবে না।

কমল। আমার স্বামীপ্রেমের নূতন আশা আর কিছু করি না। সে অমৃত-ধারা যাহা পান করিয়াছি, তাহাতেই বিভোর আছি।

বিবাহ হইয়া গেল। কমলমণি সপত্নীকে আপন কন্যাজ্ঞানে যত্ন করিতে লাগিলেন। বিভূতিভূষণ বিবাহ করিয়া যেন কেমন সর্ব্বদা অপ্রতিভ থাকিতেন। কিন্তু এদিকে রূপের আকর্ষণে তাঁহার চিত্তবৃত্তিকে প্রবলভাবে টানিতেছে। নূতন পত্নী লীলাকে দেখিবার জন্য আকুল হইতেন, অন্যদিকে লীলার সন্মুখে পড়িলে পাছে কমলমণি দেখে, এই ভয়ে পলাইয়া যাইতেন। কমলমণি যে তাহা বুঝিত না, তাহা নহে। কিন্তু তাহাতে কমলের ক্ষতি কি? কমল বিভূতিভূষণের এই বিষম বিপদ দেখিয়া মনে মনে বড় আমোদ বোধ করিতেন। এক একদিন হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিতেন,—"আহা পালাও কোথায়, নতুন বৌ ত আর খাইয়া ফেলিবে না" বিভূতিভূষণ দ্বিগুণ শশব্যস্তভাবে বলিতেন,—"না, না, আমার একটু বিশেষ কাজ আছে।" কমলমণি দ্বার আটক করিয়া বলিত—"আজ ফাঁকি দিয়া পলাইতে পারিবে না।" সুতরাং বিভূতি নিরুপায় হইয়া বসিয়া পড়িতেন। কমল কানে কানে বলিতেন, "পরের মেয়েকে ঘরে আনিয়াছি, অযত্ন করিতে নাই।" এই বলিয়া লীলার হাত ধরিয়া বসাইয়া দিয়া আপনি বাহিরে গিয়া শিকলটী লাগাইয়া দিতেন। বিভূতি উদাসীনভাবে পাশ ফিরিয়া নিদ্রার ভাণ করিয়া শয়ন করিতেন; লীলা ঘোমটা টানিয়া গুটিসুটি মারিয়া কোণের দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়া থাকিত।

একেবারে পাকা আম্রের মধ্যেই যে পতঙ্গ জন্ম লাভ করিয়াছে, যাহাকে কোন কালে রস অন্বেষণ করিতে হয় নাই, অঙ্গে অঙ্গে

রসাস্বাদ করিতে হয় নাই, তাহাকে একবার বসন্তকালের বিকশিত পুষ্পবনের মধ্যে ছাড়িয়া দেওয়া হউক দেখি—বিকচোন্মুখ গোলাপের আধ খোলা মুখটীর কাছে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাহার কি আগ্রহ ? এক-টুকু যে সৌরভ পায়, একটুকু যে মধুর আস্বাদ লাভ করে, তাহাতে তাহার কি নেশা !

বিভূতিভূষণ প্রথম প্রথম, কখন বা একটা গাউন পরা কাঁচের পুতুল, কখনও বা এক শিশি এসেন্স, কখনও বা কিছু মিষ্ট দ্রব্য কিনিয়া আনিয়া গোপনে দিয়া যাইতেন। এইরূপে লীলাবতীর লজ্জা কমিয়া আসিল, তখন প্রণয়ের নূতন জোয়ার প্রণয়ী যুগলের হৃদয়ে প্রবলভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

কমলমণি একদিন গৃহকার্য্যের অবকাশে হঠাৎ আসিয়া দ্বারের ছিদ্র দিয়া দেখিলেন, বিভূতি ও লীলা দশ পঁচিশ খেলিতেছে। বুড়া বয়সে এই খেলা বটে ! বিভূতি একদিন আহারাদি করিয়া আপিসে যাইবেন, না দেখে দ্বিতলে লীলার সঙ্গে গল্প করিতেছে। এ প্রবঞ্চনার কি আবশ্যক ছিল ? হঠাৎ একটা বজ্রশলাকা দিয়া কে যেন কমলমণির চক্ষু খুলিয়া দিল। সেই তীব্রতাপে চোখের জল বাষ্প হইয়া শুকাইয়া গেল।

তখন কমলমণির বড় দুঃখ হইল। মনে মনে বলিতে লাগিলেন, —আমিই ত উহাকে ঘরে আনিলাম, আমিই ত মিলন করাইয়া দিলাম, তবে আমার সঙ্গে এমন ব্যবহার কেন ? তবে কি আমি উহাদের সুখের পথে কাঁটা হইলাম।

কমলমণি লীলাবতীকে গৃহকার্য্য শিখাইত। একদিন বিভূতি মুখ ফুটিয়া কহিলেন, ছেলে মানুষ, উহাকে তুমি বড় বেশী পরিশ্রম করাইতেছ। উহার শরীর তেমন সবল নহে। বড় একটা তীব্র

উত্তর কমলমণির কানে বাজিল, কিন্তু কিছু না বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।

সেই অবধি কমলমণি লীলাবতীকে আর কোন কাজকর্ম্ম করিতে দিত না। রাঁধা বাড়া ঘর কন্নার সমস্ত কাজ নিজেই করিতেন। ক্রমে এমন হইল যে লীলাবতী আর নড়িয়া বসিতে পারে না, কমলমণি দাসীর মত তাহার সেবা করে এবং স্বামী বিদূষকের মত তাহার মনোরঞ্জন করে। সংসারের কাজ করা, পরের দিকে তাকান যে, জীবনের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ শিক্ষা লীলাবতীর হইল না। কমলমণি যে নীরবে দাসীর মত কাজ করিতে লাগিলেন, ইহার মধ্যে ভারি একটা গর্ব্ব আছে। তাহার মধ্যে ন্যূনতা ও দীনতা নাই। কমলমণি ভাবিলেন, স্বামীত সুখী হইয়াছে তাহাতেই আমার যথেষ্ট সুখ; এখন উহারা দুজনে শিশুর মত খেলা করুক, আমি সংসারের সমস্ত ভার লইলাম।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—)০*০(—

নব পন্থা।

হায়! আজ কোথায় সে বল, যে বলে কমলমণি মনে করিয়াছিল স্বামীর জন্য চির জীবনকাল সে আপনার প্রেমের দাবির অর্দ্ধেক অংশ অকাতরে ছাড়িয়া দিতে পারিবে? হঠাৎ এক দিন পূর্ণিমার রাত্রে জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন দুই কুল প্লাবিত করিয়া মানুষ মনে করে, আমার কোথাও সীমা নাই। তখন যে একটা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসে, জীবনের সুদীর্ঘ ভাঁটার সময় সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে তাহার সমস্ত প্রাণে টান পড়ে। হঠাৎ ঐশ্বর্য্যের দিনে লেখনীর এক আঁচড়ে দানপত্র লিখিয়া দেয়, চির দারিদ্রের দিনে পলে পলে তিল তিল করিয়া তাহা শোধ করিতে হয়। তখন বুঝা যায়, মানুষ বড় দীন, হৃদয় বড় দুর্ব্বল, তাহার ক্ষমতা অতি যৎসামান্য।

দীর্ঘ রোগাবসানে ক্ষীণ রক্তহীন পাণ্ডু কলেবরে কমলমণি সে দিন শুক্লা দ্বিতীয়ার চাঁদের মত ক্ষীণ রেখা মাত্র ছিল; সংসারে নিতান্ত লঘু হইয়া ভাসিতেছিল। মনে হইয়াছিল যেন আমার কিছুই না হইলেও চলে। ক্রমে শরীরে বল হইল, রক্তের তেজ বাড়িতে লাগিল, তখন কমলমণির মনে কোথা হইতে এক দল শরীক আসিয়া উপস্থিত হইল; তাহারা ক্রুদ্ধভাবে বলিল, তুমিত ত্যাগ পত্র লিখিয়া বসিয়া আছ, কিন্তু আমাদের দাবী আমরা ছাড়িব কেন?

কমলমণি যে দিন আপন অবস্থা বুঝিতে পারিল, সেই দিন বিভুতি ও লীলাবতীকে আপন শয়নগৃহ ছাড়িয়া দিয়া ভিন্ন গৃহে একাকিনী গিয়া শয়ন করিল।

বিভূতি ভুষণের জীবনের নিম্নস্তরে যে যৌবন উৎস বরাবর চাপা পড়িয়াছিল, আঘাত পাইয়া হঠাৎ বড় অসময়ে তাহা উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল। কেহই সে জন্য প্রস্তুত ছিল না; এই হেতু অকস্মাৎ তাহার বুদ্ধি শুদ্ধি এবং সংসারের সমস্ত বন্দোবস্ত উল্টাপাল্টা হইয়া গেল। বিভুতি কোন কালে জানিত না, মানুষের ভিতরে এমন সকল উপদ্রবজনক পদার্থ থাকে, এমন সকল দুর্দ্দাম শক্তি বিরাজ করে, যাহা সমস্ত হিসাব কেতাপ, শৃঙ্খলা সামঞ্জস্য একেবারে নয় ছয় করিয়া দেয়।

কেবল বিভুতিভুষণ নহে, কমলমণিও একটা নূতন বেদনার পরিচয় পাইল। এ কিসের আকাঙ্ক্ষা, কিসের যন্ত্রণা! মন এখন যাহা চায়, কখনও ত তাহা চায় নাই; কখনও ত তাহা পায় নাই। যখন ভদ্রভাবে বিভুতি নিয়মিত সময়ে আপিসে যাইত, যখন নিদ্রার পূর্ব্বে কিয়ৎকালের জন্য গয়লার হিসাব, দ্রব্যের মহার্ঘতা, এবং লৌকিকতার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা চলিত, তখন ত এই অন্তর্ব্বিপ্লবের কোন সূত্রপাত ছিল না। ভাল বাসিত বটে, কিন্তু তাহার ত কোন উজ্জ্বলতা, কোন উত্তাপ ছিল না। সে ভালবাসার অপ্রজ্বলিত ইন্ধন মত ছিল মাত্র।

আজ কমলের মনে হইল, জীবনের সফলতা হইতে যেন চিরকাল কে তাহাকে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে। তাহার হৃদয় যেন চির দিন উপবাস করিয়া আছে।

বিভুতিভুষণ নূতন ভার্য্যার প্রণয়ে এত মুগ্ধ হইল যে, আপিস কামাই করিতে করিতে ক্রমে চাকুরীটী গেল। নূতন চাকুরীর জন্য

যে বিশেষ চেষ্টা করে, তাহাও নহে। বিলাস বাসনায় গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে। সংসার কিসে চলিবে, পিতৃঋণ কিসে শোধ হইবে, সে সকল চিন্তাই নাই। মধ্যে মধ্যে কেবল অতিথ ফকির সাধু সন্ন্যাসী দেখিলে তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তা কহে মাত্র। নচেৎ বন্ধুবান্ধবের নিকট পর্য্যন্ত যাওয়া বন্ধ করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

নিরুদ্দেশ।

এক দিন ঘনঘোর মেঘ করিয়া বর্ষা আসিয়াছে। এমনি অন্ধকার করিয়া আসিয়াছে যে ঘরের মধ্যে কাজকর্ম্ম করা অসাধ্য। বাহিরে ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি হইতেছে, কমলমণি তাহার নূতন শয়ন গৃহের নির্জ্জন অন্ধকারে জানালার নিকট চুপ করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময় বিভূতিভূষণ ধীরে ধীরে দ্বারের কাছে প্রবেশ করিল। ফিরিয়া যাইবে, কি অগ্রসর হইবে, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না। কমলমণি তাহা লক্ষ্য করিল কিন্তু একটী কথাও কহিল না। তখন বিভূতিভূষণ একেবারে তীরের মত কমলমণির পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিল, "গোটা কতক গহনার দরকার হইয়াছে। জানত বাবা ধার করিয়া গিয়াছেন, তাহারা বড়ই তাগাদা করিতেছে ; তাহাদের অপমান আর সহ্য হয় না। বন্ধক দিয়া কতক দেনা শোধ করিতে হইবে। তবে শীঘ্রই ছাড়াইয়া দিব।" কমলমণি কোন উত্তর দিল না, বিভূতি চোরের মত দাঁড়াইয়া রহিল, অবশেষে ধীরে ধীরে বলিল "তবে কি আজ হবে না ?" কমলমণিও আস্তে আস্তে বলিল "না।"

ঘরে প্রবেশ করাও যেমন শক্ত, বাহির হইয়া যাওয়াও তেমনি কঠিন। (আহা! বিভূতির কেন এত ভয় ও লজ্জা)। বিভূতি একটু এদিক ওদিক চাহিয়া ইতস্ততঃ করিয়া বলিল, "তবে অন্যত্র চেষ্টা দেখিগে যাই।"

ঋণ কোথায় এবং গহনা কোথায় বাঁধা দিতে হইবে, কমল-

মণি সমস্তই বুঝিল। বুঝিল নববধু পূর্ব্বরাত্রে তাহার এই হতবুদ্ধি পোষা পুরুষটিকে অত্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া বলিয়াছিল, "দিদির সিন্দুকভরা গহনা; আর আমি বুঝি একখানি পরিতে পাইনা ?"

বিভুতিভুষণ চলিয়া গেলে, কমলমণি ধীরে ধীরে উঠিয়া লোহার সিন্দুক খুলিয়া একে একে সমস্ত গহনা বাহির করিল। লীলাবতীকে ডাকিয়া প্রথমে আপনার বেনারসী শাড়ীখানি পরাইল। তাহার পর তাহার সমস্ত গহনা গুলি পরাইয়া দিল এবং ভাল করিয়া চুল বাঁধিয়া দিয়া বলিল, "যাও একবার তোমার আরাধ্য দেবতাকে দেখাওগে।"

এক একজন লোক স্বপ্নাবস্থায় নির্ভীকভাবে অত্যন্ত শঙ্কটের পথ দিয়া চলিয়া যায়। মুহূর্ত্তমাত্র চিন্তা করেনা। অনেক জাগ্রত মানুষেরও তেমনি চির স্বপ্নাবস্থা উপস্থিত হয়, কিছুমাত্র জ্ঞান থাকে না; বিপদের সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া, নিশ্চিন্ত মনে অগ্রসর হইতে থাকে; অবশেষে নিদারুণ সর্ব্বনাশের মধ্যে গিয়া হঠাৎ জাগ্রত হইয়া উঠে।

বিভুতিভুষণ পিতৃঋণের জন্য গোপনে গোপনে পৈতৃক ভদ্রাসন বিক্রয় করিয়াছে; এখন চাকুরী নাই কিন্তু বিলাসিতা কমে নাই। সংসার খরচ, বিলাস ব্যয় ইত্যাদির জন্য প্রায় আড়াই হাজার টাকা ঋণ। পাওনাদারেরা অবস্থা বুঝিয়া নালিশ করিয়াছে। টাকা না দিলে জেলে যাইতে হয়। বিভূতি নিরুপায় হইয়া কমলমণির কাছে গিয়াছিল, কিন্তু আত্মদোষের জন্য কমলের কাছে সমস্ত প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে নাই। অদ্য পুনরায় কমলের নিকট গিয়া কাতরতার সহিত নিজ অবস্থা জানাইল। কমলমণি শুনিয়া একেবারে পাংশুবর্ণ হইয়া গেল;

বিভূতি। গহনাগুলি এই বিপদে না দিলে আমাকে জেলে যাইতে হইবে।

কমল। সমস্ত গহনাই আমি ছোট বৌকে দিয়াছি।

বিভূতি। কেন দিলে ছোটবৌকে, কেন দিলে, কে তোমাকে দিতে বলিল ?

কমল। তাতে ক্ষতি কি, সে ত আর জলে পড়ে নাই।

বিভূতি। তবে যদি কোন ছুতা করিয়া তাহার নিকট হইতে বাহির করিতে পার। কিন্তু আমার মাথা খাও, বলিওনা যে আমি চাহিতেছি।

কমল বিরক্ত হইয়া বলিল, "এই কি তোমার ছুতা করিবার, সোহাগ দেখাইবার সময়! চল," বলিয়া ছোট বৌয়ের ঘরে প্রবেশ করিল। ছোটবউ সমস্ত শুনিয়া শেষে বলিল "তা সে আমি কি জানি।" বিভূতি লীলাবতীর হাতে ধরিয়া নিজের অবস্থা সমস্ত জ্ঞাপন করিল। লীলাবতী বলিল, "তুমি পুরুষ মানুষ, রোজগার করিয়া দেনা পরিশোধ করিবে, তা বলিয়া স্ত্রীলোকের পুঁজি দুখানা গহনা, তাহার উপর নজর কেন! ঈশ্বর না করুন, তোমার যদি কিছু হয়, তা'হলে আমার দশা কি হবে।" এই বলিয়া লীলাবতী শয়ন করিল, আর একটী কথাও কহিল না।

বিভূতিভূষণ রাত্রে আহার না করিয়া বহুদিন পরে তাহার সেই পতিব্রতা সতীস্ত্রী কমলমণির শয্যায় শয়ন করিল; কিন্তু নিদ্রা একেবারেই হইল না। কমল স্বামীকে আহার করাইবার জন্য বহু চেষ্টা করিল, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। অগত্যা নিজেও কিছু না খাইয়া শয়ন করিল। কমল নানা যুক্তি তর্ক ও প্রলোভন-বাক্য দ্বারা স্বামীকে আশ্বস্ত করিতে লাগিল বটে, কিন্তু

বিভূতির আজ হঠাৎ চমক ভাঙ্গিয়াছে সে তখন মায়ার বন্ধন কাটাইবার চেষ্টা করিতেছে।

রাত্রি প্রভাতে কমল উঠিয়া দেখে শয্যায় স্বামী নাই। পরদিন অনেক অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু বিভূতিভূষণের আর সন্ধান পাইলেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার তীর্থযাত্রা।

আমরা দুই বন্ধুতে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখিব বলিয়া যাত্রা করিয়াছিলাম। ৯।৩৫ মিনিটে বম্বে মেলে উঠিব বলিয়া গমন করিয়াছি। পঞ্জাব ও বম্বে মেল, দুইখানি মেল ট্রেণ যাইবে, সুতরাং হ্যারিসন রোড হইতে হাবড়া পোল পর্য্যন্ত ভিড় ঠেলিয়া কোন রকমে হাবড়া ষ্টেশনে গেলাম। ট্রেণ ছাড়িতে দশ মিনিট বাকি। তাড়াতাড়ি ২য় শ্রেণীর দুইখানি টিকিট কিনিয়া গাড়ীতে উঠিতে যাইব, কিন্তু ২য় শ্রেণীর সমস্ত গাড়ীগুলিতেই লোক পূর্ণ; অধিকাংশ যাত্রীই লালমুখ; আমাদের বাঙ্গালী পোষাক, যে গাড়ীতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, সেই গাড়ী হইতেই লালমুখের খিঁচুনী খাইতে হয়। এ দিকে গাড়ী ছাড়িবার আর বিলম্ব নাই; অগত্যা খিঁচুনী খাইয়াও একটা কামরায় ঠেলিয়া ঢুকিলাম। একটা কামরায় পাঁচ জন বসিবার স্থান,

চারিটী পূর্ব্বেই পূর্ণ হইয়াছিল; একটী খালি ছিল, তাহাতেই দুই জনে কোন রকমে বসিলাম। অপর চারিটী সাহেব আরোহী, তৎক্ষণাৎ তাহারা আপত্তি উত্থাপন করিয়া, পাঁচ জনের স্থানে ছয় জন বসিলে স্বাস্থ্যহানি ঘটিবে এবং রেলওয়ে-নিয়ম লঙ্ঘন করা হইবে বলিয়া একটা বিতণ্ডা আরম্ভ করিল। ইত্যবকাশে গাড়ী ছাড়িয়া দিল বাষ্পযান অজগর সর্পবৎ সাঁ সাঁ করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। দেখিতে দেখিতে, গাড়ী বৰ্দ্ধমান ষ্টেশনে পঁহুছিল। একজন সাহেব আরোহী বৰ্দ্ধমানেই নামিয়া গেলেন। তখন অপর তিন জন সাহেব আরোহীদের আর কোন বিশেষ আপত্তি দেখা গেল না। তবে বাঙ্গালী পোষাকধারী বাবু দেখিয়া কিছু ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আমার বালককাল হইতেই একটা রোগ আছে; সকল জাতির সকল ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার জন্য লোককে বিরক্ত করিয়া তুলি। এই সাহেব তিন জন তাঁহা-দের ধর্ম্মের কোন তত্ত্ব রাখেন কিনা একটু জানিবার জন্য কৌতু-হল হইল। কথাপ্রসঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলাম। তাঁহারাও আমাদের প্রয়াগ (এলাহাবাদ) যাইবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে মেলা দেখা ও সাধুসঙ্গ ইত্যাদি সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। একটী সাহেব সাধুসঙ্গ ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদির কথা শুনিয়া বিস্তৃত বিবরণ শুনি-বার জন্য নিতান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আমিও যতদূর জানি বর্ণনা করিলাম। দেখিলাম, ধর্ম্মসম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে শুনিয়া তিনটী সাহেবই নিদ্রাদেবীর আরাধনা না করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক আরম্ভ করিলেন। তাহাতে আমিও আনন্দলাভ করিলাম। সনাতন হিন্দুধর্ম্মই যে সকল অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, তাহা প্রতি-পাদন করিবার জন্য বিশেষ ভাবে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগি-

লাম। আপন আপন ধর্ম্ম যে শ্রেষ্ঠ, তাহা সকলেই বলিয়া থাকেন। সাহেব তিন জন তাঁহাদের নিজ ধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার প্রমাণ প্রয়োগ আরম্ভ করিলেন। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, আনিবেসান্ত প্রভৃতির কথাও বলিতে ছাড়িলাম না। সাহেবত্রয় ধর্ম্মের সূক্ষ্মতত্ত্ব অবগত নহেন, তবে স্থূল তত্ত্ব লইয়া আলোচনা আরম্ভ করিলেন। বর্ত্তমান কালে তাঁহারাই যে, জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য অনেক কথার অবতারণা করিলেন। কথায় কথায় বিজ্ঞাপনের উন্নতি সম্বন্ধে ইউ-রোপ ও আমেরিকা-বাসিগণই যে শ্রেষ্ঠ, তাহাও বলিতে ছাড়ি-লেন না। আমিও কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ইংরাজি সংবাদপত্র ইংলিশম্যানের সেই কথাটা বলিতে ছাড়িলাম না। পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তাহার মর্ম্ম এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম।

আমেরিকাবাসী দুইজন পর্য্যটক ইংলিশম্যান পত্রিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহারই বঙ্গানুবাদ,—

"আমরা আমেরিকাবাসী দুইজন পর্য্যটক ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিব বলিয়া বাহির হইয়াছি। অনেক দেশ পরিভ্রমণ করিয়া হিমালয় পর্ব্বতের নীচে বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের সীমার মধ্যে টেলিগ্রাফ আপিসে আশ্রয় লইয়াছি। শুনিলাম অদূরে হিমালয়পর্ব্বত, উহাতে দেখিবার অনেক জিনিষ আছে এবং পর্ব্বতের উপরি-ভাগের দৃশ্যও অতি মনোহর। আমরা উভয়ে, প্রাতঃভোজন সমাপনান্তে পর্ব্বত ভ্রমণে বহির্গত হইলাম। পর্ব্বতে যতই উঠিতে আরম্ভ করিলাম, ততই মনোহর দৃশ্যে বিমোহিত হইতে লাগিলাম। সঙ্গে বন্দুক ইত্যাদি শিকার-উপযোগী অস্ত্রাদি আছে। বিহ্বল হইয়া যতই দেখি, ততই অনির্ব্বচনীয় আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। যখন

ক্ষুধাতৃষ্ণায় ক্লান্ত হইয়া পড়িলাম, তখন চমক ভাঙ্গিল। কিন্তু কোথা হইতে কোথায় আসিলাম, বাসা কতদূর, কোথায় পথ, কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। তখন বাসায় ফিরিয়া আসিবার জন্য ব্যস্ত হইলাম, কিন্তু কে বলিয়া দিবে কোথায় পথ! তখন বিচলিত হইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটী আরম্ভ করিলাম। যে দিকে যাই, সেই দিকেই নিবিড় জঙ্গল, পথশূন্য, বন্ধুর উপত্যকা। ঘন তরুরাজি-পরিপূর্ণ জনশূন্য পর্ব্বত। আকুল হইয়া ঘুরিতে লাগিলাম; কিন্তু পথ পাইলাম না! বেলা অবসানপ্রায়, সূর্য্যদেব তাঁহার কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আপন আবাসে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন।

সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া মনে অত্যন্ত ভয় হইল। তখন নিরুপায় হইয়া নিদানের বন্ধু ভগবানকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম। ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায় এ বিশ্বাস আমাদের ছিল না। কিন্তু কে যেন আমাদের কানে কানে বলিয়া দিল যে, বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য ভগবানকে ঐকান্তিক মনে ডাক, তিনি অবশ্যই বিপদ হইতে মুক্ত করিবেন। জীবনের শেষ দিন ভাবিয়া উভয়ে যুক্ত করে তাঁহাকে ডাকিতে আরম্ভ করিলাম; এমন সময় দেখি সম্মুখে জটাজূটধারী একটী মনুষ্যমূর্ত্তি ঝরণার জলে স্নান করিতেছেন। যদিও পূর্ব্বে আমরা ঐরূপ বীভৎস মনুষ্যমূর্ত্তি নয়নগোচর করি নাই, যদিও আমরা ভাবিয়াছিলাম, ইহাও বোধ হয় এক প্রকার হিংস্র জন্তু বিশেষ, তথাপি মনুষ্যমূর্ত্তির সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া সাহসে ভর করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি হস্ত উত্তোলন করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা আমাদিগকে বসিতে আদেশ করিলেন। আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া সেই স্থানে ক্লান্তভাবে বসিয়া পড়িলাম। অল্পক্ষণ পরেই তিনি স্নানাদি কার্য্য সমাধা করিয়া

আমাদিগকে কি এক বিজাতীয় ভাষায় প্রশ্ন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আমরা বাঙ্গালা বা হিন্দি কোন ভাষাই বুঝি না। তখন তিনি আমাদের সহিত ইংরাজীতে কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। আমরা তাঁহাকে জানাইলাম যে, আমরা ক্ষুধা তৃষ্ণায় এতই কাতর যে, তাঁহার সহিত কথা কহিতেও অক্ষম। তিনি তৎক্ষণাৎ একটী লতার মূল উৎপাটন করিয়া তাহাই কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের খাইতে দিলেন এবং ঝরণার জল আনিয়া পান করিতে দিলেন। সেই মূল ভক্ষণে ও জলপানে আমাদের ক্ষুধাতৃষ্ণা সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়া গেল, মনে হইল যেন পরিপূর্ণ রূপে আহার করিয়াছি। এই অদ্ভুত ব্যাপার প্রতক্ষ্য করিয়া আমরা আর তাঁহাকে সামান্য মনুষ্য বলিয়া ধারণা করিতে পারিলাম না। অতঃপর সেই মহাপুরুষ আমাদের সেই স্থানে আগমনের কারণ, কোথায় নিবাস, কোথায় যাইব ইত্যাদি অনেক প্রশ্নই জিজ্ঞাসা করিলেন। আমরাও সঙ্ক্ষেপে আত্মপরিচয়, ভ্রমণবৃত্তান্ত ইত্যাদি যথাসম্ভব বর্ণনা করিলাম। তখন মহাপুরুষ বলিলেন, তোমরা যে স্থানে ছিলে, তথায় অদ্য ফিরিয়া যাইবার কোন আশা নাই। করণ সেই স্থান এখান হইতে অনুমান ১২ মাইল হইবে। অতএব অদ্য এই স্থানে অবস্থান কর, আগামী কল্য প্রাতে আমি তোমাদের গন্তব্য স্থানে রাখিয়া আসিব। আমরাও অনন্যোপায় হইয়া অগত্যা তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলাম। তিনি একটী পর্ব্বতগুহার নিকট আমাদের লইয়া গেলেন, এবং গুহা-মুখ পরিষ্কার করিয়া আমাদিগকে আদেশ করিলেন যে, অদ্য তোমরা ইহার মধ্যে অবস্থান কর; আগামী প্রাতে আমি আসিয়া তোমাদিগকে পথ দেখাইয়া দিব। হিংস্র জন্তু ইত্যাদি ভয়ের বিষয় জ্ঞাপন করিলে তিনি

বলিলেন, গুহামুখ প্রস্তর দ্বারা রুদ্ধ করিয়া দিব, তাহাতে তোমাদের কোন আশঙ্কাই থাকিবে না। এবম্বিধ ব্যাপারে আমরা অনেকটা সন্দিহান হইলাম বটে, কিন্তু নিরুপায়। বাহিরে থাকিলে হিংস্র জন্তুতে বধ করিবে। মহাপুরুষের আকৃতি ও কথা-বার্ত্তায় সহৃদয়-তারই পরিচয় পাইতেছে সুতরাং ভয় না করিয়া তাঁহার আদেশ পালন করিলাম। ভগবানকে স্মরণ করিয়া উভয়ে গুহামধ্যে প্রবেশ করিলাম। মহাপুরুষ এক খণ্ড প্রস্তর দ্বারা গুহামুখ রুদ্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা পরীক্ষার্থ গুহামুখের প্রস্তর খণ্ডখানি উত্তোলন করিরার চেষ্টা করিলাম কিন্তু বিফল চেষ্টা। বিন্দু মাত্র নড়াইতে পারিলাম না।

প্রভাতে সেই মহাপুরুষ আসিয়া অনায়াসেই সেই প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তরিত করিয়া আমাদিগকে বাহিরে আসিতে আদেশ করিলেন। আমরাও পুনর্জ্জীবন পাইলাম ভাবিয়া সত্বর বাহির হইলাম। মহাপুরুষের সেই অমানুষিক শক্তি দর্শনে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণের অদ্ভুত ঔষধ দর্শনে আমরা একেবারে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। অতঃপর তাঁহার ইঙ্গিত মতে তাঁহারি পশ্চাৎ পশ্চাৎ পর্ব্বতের দুর্গম বন্ধুর পথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলাম।

আসিবার সময়ে কথাপ্রসঙ্গে সেই লোকালয়শূন্য নির্জ্জন পর্ব্বতশিখরে বাস করিবার কারণ জিজ্ঞাসু হইলে তিনি সানন্দমনে সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার মর্ম্ম যথাসঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করিতে লাগিলেন। আর্য্যধর্ম্মই যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, আর্য্যজাতিই যে জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জাতি, তাহাই তিনি স্পর্দ্ধার সহিত কহিতে আরম্ভ করিলেন।

আমাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জাতি জগতে ছিল; ইহা বিশ্বাস করিতে

আমাদের প্রবৃত্তি হইল না। আমরাও তাঁহার সহিত তর্ক আরম্ভ করিলাম। কথাপ্রসঙ্গে বিজ্ঞানের উন্নতি সম্বন্ধে আমরাই জগ-তের শ্রেষ্ঠ; পূর্ব্বে এত উন্নত বিজ্ঞান কখন ছিল না বলাতে মহাপুরুষ হাসিয়া উত্তর করিলেন যে, বিজ্ঞানের উন্নতি আর্য্যজাতির মধ্যে যাহা ছিল, জগতে আর কোন জাতির তাহা ছিল না, ভবিষ্যতে হইবে না।

এই সময়ে আমরা আমাদের বাসা সেই টেলিগ্রাফ আফিসে আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন মহাপুরুষকে আমরা বলিলাম যে, এই দেখুন, এই টেলিগ্রাফ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি ইহা কি আপনাদের কখনও ছিল? মহাপুরুষ বলিলেন ইহাপেক্ষা সহস্র গুণ উন্নত টেলিগ্রাফ ছিল, যাহা তোমরা কল্পনাতেও আনিতে পারিবে না। তোমাদের টেলিগ্রাফ তার না থাকিলে হয় না, আর আমাদের তারবিহীন টেলিগ্রাফ ছিল। টেলিগ্রাফে সংবাদ জানিতে তোমাদের যত সময় লাগে, আমাদের টেলিগ্রাফে তাহা-পেক্ষা শত গুণ কম সময় লাগে। আমরা বলিলাম, ছিল, তাহার প্রমাণ কিছু নাই, বর্ত্তমান কালে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে বিশ্বাস করি। মহাপুরুষ বলিলেন তোমরা কোন্ বিষয় জানিতে চাও বল, পরীক্ষা দিতেছি।

আমরা বলিলাম, ঠিক্ এই সময় আমেরিকায় আমার মা বাপ কি করিতেছেন বলুন। মহাপুরুষ তখনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ৫ মিনিট পরে বলিলেন—তোমার মা বাপ পরস্পর সন্মুখীন হইয়া টেবিলে বসিয়া আহার করিতেছেন, তোমার ভগিনী পার্শ্বে একখানি ইজি চেয়ারে বসিয়া সংবাদপত্র পাঠ করিতেছেন, তৎপার্শ্বে একটী কুকুর শয়ন করিয়া আছে। আমরাও তন্মুহূর্ত্তে টেলিগ্রাফ করি-

লাম। মহাপুরুষ বলিলেন, ইহার উত্তর আসিলে মিলাইয়া দেখিও, আমি চলিলাম। আমরা বলিলাম, "তাহা হইবে না, আপনাকে আর কোথায় খুঁজিয়া পাইব? আপনি উত্তর না আসা পর্য্যন্ত থাকুন।" মহাপুরুষ বলিলেন, "উত্তর আসিতে তিন দিন, আমি এই তিন দিন এখানে বসিয়া থাকিলে আমার কার্য্যের ক্ষতি হইবে। তোমরা অবিশ্বাস করিও না, আমি যাহা বলিলাম, তাহাই ঠিক্। উত্তর আসিবামাত্রেই আমাকে এখানে দেখিতে পাইবে।" এই বলিয়া মহাপুরুষ কোথায় চলিয়া গেলেন, আর দেখিতে পাইলাম না। বাহির হইয়া অনেক অনুসন্ধান করিলাম, কিন্তু আর দেখিতে পাইলাম না। সকলেই মনে ভাবিল যে, তিনি একটা বাজে কথা বলিয়া চলিয়া গেলেন।

তিন দিন পরে টেলিগ্রাফের উত্তর আসিল। মহাপুরুষের কথাই ঠিক্, আমরা একেবারে স্তম্ভিত; কিন্তু হায়, কই সেই মহা-পুরুষ।

আমরা এইরূপ অনুশোচনা করিতেছি, এমন সময়ে দেখি পৃষ্ঠদেশে সেই মহাপুরুষ দণ্ডায়মান। সেই সমস্ত মহাপুরুষের কার্য্যই অদ্ভুত! আমরা যোড় হাতে তাঁহাকে বিস্তর স্তুতিবাদ করিলাম, এবং শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলাম। বিশেষতঃ এই আশ্চর্য্য বিজ্ঞান শিক্ষা করিবার কৌতূহল বর্দ্ধিত হইল। মহাপুরুষ বলিলেন "আমাদের এই বিজ্ঞান কৌশলে শিক্ষা হয় না, ইহা সাধনার কার্য্য এক জন্মে হইবে কি না সন্দেহ, ইহা কঠোর সাধনা।" এই বলিয়া সেই মহাপুরুষ ক্ষণেক মধ্যে কোথায় অদৃশ্য হইলেন আর দেখিতে পাইলাম না।

এই গল্পটী সাহেব তিনটী বিশেষ মনোযোগ সহকারে শুনিলেন।

অতঃপর ঘড়ী খুলিয়া দেখি ৩টা বাজিয়াছে। তখন গল্প বন্ধ করিয়া একটু নিদ্রাদেবীর আরাধনা করা গেল। পরদিন প্রাতে দেখি সাহেব তিনটী গাড়ীতে নাই, আমরাও মধ্যাহ্নকালে এলাহাবাদ ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। তখন একটী বাসা ঠিক করিয়া আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

——০:*:০——

নবীনা ভৈরবী।

প্রয়াগের নাম শুনিলেই পুলকে শরীর রোমাঞ্চ হয়। গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলের ন্যায় পবিত্র সুন্দর দৃশ্য বুঝি পৃথিবীর আর কোথাও নাই। আহা! কৃষ্ণ-পাদপদ্ম-পূতা কালিন্দীর কি মাধুরী, আর শুভ্রা নির্ম্মলা ভাগীরথীর পবিত্রতা ও মধুরিমায় হিন্দুজাতিকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে। এই পবিত্রতা ও মাধুরীর মিলন অপূর্ব্ব। যে দেখিয়াছে সেই মজিয়াছে—ভাবসাগরে ডুবিয়াছে। এই পুণ্য মধুর সঙ্গম স্থলে দ্বাদশ বৎসর পরে উত্তরায়ণ সংক্রান্তির দিনে কুম্ভ-মেলা আরম্ভ হয়। ভগবানের মঙ্গল হস্তের অহ্বান, বিজ্ঞাপন দেওয়া হয় না,—দামামা দগড়া বাজান হয় না, কিন্তু কোথা হইতে লক্ষ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হয়, কতশত লোক আসিয়া উপস্থিত হয়। এখানে ধনী দরিদ্র, বালক বালিকা, প্রবীণ প্রবীণার বাছাবাছি নাই, সকলেই পাপ দূর করিবার মানসে এই পুণ্যক্ষেত্রে আসিয়া সমবেত হয়।

এই মহামেলার দিনে ঐ মহাতীর্থে একস্থানে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। জটাজূটধারী তেজঃপুঞ্জশরীর একটী যোগী পুরুষ। এই কুম্ভমেলায় সাধু সন্ন্যাসীর অভাব নাই; কিন্তু এই মহা-পুরুষকে দেখিয়া আমার অধিকতর ভক্তির উদয় হইল। ইহার শরীরের জ্যোতিঃ দেখিলে সাধারণ মনুষ্যকে চমকিত হইতে হয়।

এই মেলায় আরও কত সাধু মহাজনের আগমন হইয়াছে, তন্মধ্যে ইনিই যে প্রকৃত সাধু, তাহা অনেকেই বর্ণনা করিতেছেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই এক স্বর্গীয় ভাব! আমি স্থির দৃষ্টিতে তাঁহার মূর্ত্তি অবলোকন করিতে লাগিলাম। দেখিলাম—মহাপুরুষের দৃষ্টি তাঁহার সম্মুখস্থ সেই তাম্রকমণ্ডলুর উপর। তাঁহার সম্মুখে ত্রিশ-বত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক একজন যুবক গৈরিক বসন পরিধান করিয়া অধোবদনে ধীরভাবে বসিয়া আছেন। যুবকের শরীরের লাবণ্য-কান্তি দেখিয়া মনে হয় নবীন বয়সেও কোন মহাবস্তু লাভের প্রত্যাশায় গৃহত্যাগী হইয়াছেন। যুবকের প্রশস্ত ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম, মুক্তাবিন্দুর ন্যায় শোভা পাইতেছে। তাঁহাকে দেখিয়া বোধ হইল, তিনি কোন উচ্চ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন; বিশেষ কোন মনোবিকারে যৌবনেই গৃহত্যাগী হইয়াছেন।

কুম্ভমেলায় লোকে লোকারণ্য। একপার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীরে আমি এই দুই সন্ন্যাসীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে একটী প্রকাণ্ড কদম্ববৃক্ষ যেন উন্নত মস্তকে ভগবানের অসীম কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে এবং গঙ্গা-যমুনার অপূর্ব্ব মিলন দর্শন করিতেছে। প্রয়াগের সঙ্গমস্থলের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া হৃদয় আনন্দ-রসে আপ্লুত হয়; আমি একাগ্রমনে তাহাই দর্শন করিতেছি, সহসা সেই জনসঙ্ঘ ভেদ করিয়া 'ভৈরবী ভৈরবী' শব্দে এক মহাকোলাহল উত্থিত হইল। সকল লোকই ভৈরবী দেখিবার মানসে মহা-সংঘর্ষ আরম্ভ করিল। আমি তখন সাধু পুরুষদ্বয়ের নিকট হইতে ভৈরবী অভিমুখে ধাবমান হইলাম। ভিড় ঠেলিয়া ভৈরবীর নিকটস্থ হইয়া দেখি, এ আবার এক অদ্ভুত দৃশ্য! ইতঃপূর্ব্বে যে 'ভৈরবী ভৈরবী' রব উঠিয়াছিল, সম্মুখে সেই ভৈরবী-মূর্ত্তি। ভগবানের কি খেলা!

দেখিয়াই মনে কেমন এক নূতন ভাবের উদয় হইল। পূর্ণযৌবনা গৈরিক-বেষ-ধারিণী ত্রিশূল-হস্তা ভৈরবীমূর্ত্তি। সহস্র সহস্র লোক ভৈরবীকে ঘেরিয়া তাহার গমনপথ রোধ করিতেছে। নবীনা ভৈরবী চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া হঠাৎ বসিয়া পড়িল। পূর্ণযৌবনা রমণী ভৈরবী-বেশে বেড়াইতেছে দেখিয়া বোধ হইল, যেন কোন মহাবস্তু (হৃদয়ের ধন) অনুসন্ধান জন্য সংসারসুখে জলাঞ্জলি দিয়া, কত দেশ দেশান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া এই প্রয়াগধামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। নবীনা ভৈরবীর মুখের দিকে চাহিয়া আমার বোধ হইল, যুবতী কোন সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা বা কুলবধূ। নবীনা ভৈরবী পরমা সুন্দরী,—মলিন গৈরিক বসনে ও ভস্মাদিতে রূপ-লাবণ্য ঢাকিবার চেষ্টা করিলেও রূপ-লাবণ্য মলিন দেখান দূরে থাকুক, আরও ফুটিয়া বাহির হইতেছে ভ্রমণজনিত কষ্টে গণ্ডস্থল আরক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে। সুন্দর পদযুগল—বহু পথ পর্য্যটন জন্য চারিধার ফাটিয়া গিয়াছে। তাহার চক্ষু যেন পৃথিবীর বস্তু দেখিতে চাহে না ; অন্ত-দৃষ্টিতে অপার্থিব বস্তুর আকাঙ্খা করিতেছে। বহু লোকে বহু কথাই কহিতেছে, অনেকে ভৈরবীকেও অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে ; কিন্তু তাহার নিকট কোন উত্তরই পাইতেছে না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে উন্মাদিনীর ন্যায় দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল দীর্ঘ নিশ্বাস সহ "আমি অপরাধিনী কিসে ?" এই শব্দ শুনা যাইতেছে। ভৈরবীর এবংবিধ অবস্থা দর্শন করিয়া আমি পুনরায় সেই সাধু পুরুষদ্বয়ের কুটীরে আসিলাম। দেখি, তথায় আর কেহই নাই। সেই মহাপুরুষকে দেখিয়া অবধি আমার কেমন ভক্তির উদয় হইয়াছিল, সুতরাং আমি তাঁহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। সেই অগণিত লোকসঙ্ঘ-মধ্যে দুইটী মাত্র লোককে

সন্ধান করিয়া বাহির করা অসম্ভব। তাথপি চেষ্টার ত্রুটি করিলাম না। বহু অনুসন্ধানেও তাঁহাদের দর্শন না পাইয়া, যেখানে নবীনা ১—রবী ছিল, পুনরায় তথায় ফিরিয়া আসিলাম। আসিয়া দেখি, ায় ভৈরবীও নাই, আর লোকের ভিড়ও নাই। অগত্যা হতাশ া বাসায় ফিরিলাম।

আমরা দুই বন্ধুতে কুম্ভমেলা দেখিতে আসিয়াছিলাম। উভয়ে ার স্থানে গিয়াছিলাম, কিন্তু ভিড়ের মধ্যে উভয় বন্ধুতে ছাড়া-ড় হইয়া পড়ি। বন্ধুটী পূর্ব্বেই ফিরিয়াছিলেন। আমি বাসায় সিবা মাত্রই বন্ধু ব্যস্তভাবে বলিলেন, "ভাই এত দেরী হইল ন? আমি কত খুঁজিয়াও তোমাকে পাই নাই।" আমি বিলম্বের রণ—সাধু দর্শন, যুবতী ভৈরবীর কথা, তাঁহাদের অনুসন্ধান াদি সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিলাম। অতঃপর আহা-রে সমাপনান্তে উভয়ে শয়ন করিলাম। বন্ধুটী অল্পক্ষণ পরেই দ্রিত হইয়া পড়িলেন। আমার আর সে রাত্রে নিদ্রা হইল না। নিদ্রার পরিবর্ত্তে নানাবিষয়িণী চিন্তা আসিয়া মনে উদয় হইতে গেল। যেমন একটু তন্দ্রা আসিল, অমনি স্বপ্ন দেখিলাম – সেই পুরুষ, তাঁহার সেই যুবক শিষ্যটিকে লইয়া, ধীরে ধীরে আমার খে উপস্থিত। আমাকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "বৎস, তুমি আমাদিগের অনুসন্ধান করিবার জন্য খুঁজিয়া ক্লান্ত হইয়া য়াছ। আর খুঁজিও না, এখানে আর আমাদের সন্ধান পাইবে অমরনাথের পথে তোমাকে আমি আর একবার দেখা দিব; ন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।" এই বলিয়া মহাপুরুষ ও তাঁহার অন্তর্হিত হইলেন। আমারও তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। উঠিয়া লাম, আর নিদ্রা হইল না। নানাপ্রকার চিন্তায় রাত্রি প্রভাত

হইয়া গেল। কিন্তু মনের উদ্বেগ গেল না। ফলতঃ সাধু পুরুষকে দর্শন করিয়া অবধি আমার মনে কি এক প্রকার ভাবাবেশ হইয়াছিল। পূর্ব্বদিন সাধু দর্শনের পর হইতেই তাঁহার জন্য আমার মন কেমন করিতেছিল। আর একবার দর্শন করিবার লালসা বলবতী হওয়ায় আমি ঐ লোকারণ্যমধ্যে বহু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। বহু চেষ্টাতেও দর্শন না পাইয়া অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও বাসায় ফিরিলাম। রাত্রিতে স্বপ্নে সেই সাধু পুরুষকে দর্শন করিয়া অবধি আমার মন আরও উদাস হইয়া গিয়াছে। আরও ৫।৬ দিন কাল আমারা মহামেলাতে সাধু সন্ন্যাসী দর্শন করিয়া বেড়াইতেছি; কিন্তু আমার মন যেন কিছুতেই স্থির হইতেছে না। অনেক অনুসন্ধান করিলাম, সমগ্র মেলাস্থান পরিভ্রমণ করিলাম; কিন্তু আর একবারের জন্যও তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। সপ্তম দিবসে সন্ধ্যার সময়ে বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। দুই বন্ধুতে আগামী কল্য প্রয়াগ পরিত্যাগ সম্বন্ধে জল্পনা কল্পনা হইতেছে; কিন্তু আমার মনের ভাব তখন অন্যবিধ দাঁড়াইয়াছে। আহারাদির পরে উভয়ে শয়ন করিলাম। বন্ধুটী বেশ নিদ্রা গেলেন, আমার ভালরূপ নিদ্রা হইল না। যাহা হউক, রাত্রি কাটিয়া গেল। প্রভাতে উঠিয়া আহারাদির ব্যবস্থা করা গেল। বেলা ১টার সময়ে ট্রেণ। তৎপূর্ব্বেই আহারাদি সমাপন করিয়া ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিলাম। ট্রেণ আসিতে বিলম্ব আছে,—আমি টিকিট করিতে গেলাম। পূর্ব্ব হইতেই আমার মনের অভিসন্ধি অন্যরূপ ছিল; সুতরাং দুইখানি টিকিট না করিয়া একখানি টিকিট করিলাম, দেখিতে দেখিতে ট্রেণ আসিয়া উপস্থিত হইল। আরোহীরা ত্রস্তভাবে আপন আপন স্থান খুঁজিয়া লইল। বন্ধুটীও অগ্রেই একটী কামরায় উঠিয়া আমাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। আমিও

'উঠিতেছি' বলিয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। বন্ধুও আমাকে অতি ব্যস্ত ভাবে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। তখন আমি হাসিয়া বন্ধুকে বলিলাম, "ভাই, তুমি বাড়ী ফিরিয়া যাও; আমি অমরনাথ দর্শনে যাইব ইচ্ছা করিয়াছি।" এই কথা শুনিয়া বন্ধু বিস্মিত হইলেন, এমন সময়ে গাড়ী ছাড়িয়া দিল। বন্ধুকে বলিলাম, "ভাই, দুঃখিত হইও না, শীঘ্র দেশে ফিরিব।

আমি পুনরায় পূর্ব্ব বাসায় ফিরিয়া আসিলাম! মন প্রবোধ মানিল না, তথা হইতে আবার মেলার স্থানে সেই মহাপুরুষের সন্ধানে বাহির হইলাম। সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সন্ধান করিলাম, কিন্তু, আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। অগত্যা রাত্রিতে বাসায় ফিরিলাম। সামান্যমাত্র আহার করিয়া রাত্রিটা কাটাইলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—০:*:০—

কাশীধাম-সাধু দর্শন।

প্রভাতে উঠিয়াই লোটা কম্বল সংগ্রহ করিলাম। বাসা-ভাড়া দেনা-পাওনা চুকাইয়া দিয়া ষ্টেশনাভিমুখে গমন করিলাম। হঠাৎ কাশীধাম দর্শন-লালসা হৃদয়ে উদয় হইল। তখন ষ্টেশনে গিয়া মোগলসরায়ের একখানি টিকিট কিনিলাম। যথা সময়ে মোগল সরাইয়ে পৌঁছিয়া তথা হইতে ডেরাডুন মেলে আরোহণ করিয়া কাশী-রাজঘাটে আসিয়া পৌঁছিলাম। আসিতে আসিতে গঙ্গার উপরের পোল হইতে বারাণসীক্ষেত্রের অপূর্ব্ব শোভা দর্শনে আমার মন প্রাণ মোহিত হইয়া গেল। এই স্থানে গঙ্গা অর্দ্ধচন্দ্রাকারে কাশী-ধামকে যেন বিন্দুরূপে কোলে করিয়া রহিয়াছেন। তদুপরি বেণী-মাধবের ধ্বজা যেন স্থির হইয়া গৌরীপীঠের মধ্যস্থ শিবলিঙ্গবৎ দাঁড়া-ইয়া বারাণসীধামের আরও শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। দেখিতে দেখিতে রাজঘাট ষ্টেশনে গাড়ী আসিয়া থামিল। আমি নামিয়া একা ভাড়া করিয়া রামাপুরার মোকামে আমার সুপরিচিত কোন সুধার্ম্মিক সুহৃদের বাটীতে উঠিলাম।

দশাশ্বমেধের ঘাট, সন্ধ্যার প্রাক্কাল, একটী যুবক একাগ্রমনে বসিয়া কি চিন্তা করিতেছিলেন। সম্মুখে পবিত্রসলিলা ভাগীরথী, অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পতিতা রহিয়াছেন। আহা! ঐ স্থানে মায়ের ধীর মন্থরগতি দেখিলে সহজেই লোকের মনে একপ্রকার আনন্দলহরী খেলা করিতে থাকে। তাই যুবক একাগ্রমনে বুঝি মায়ের সেই পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া আত্মহারা হইয়াছেন।

করিতেছে। যুবক নয়ন ফিরাইয়া একদৃষ্টে গঙ্গাবক্ষের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ইতিঃপূর্ব্বে গান শুনিয়া যাঁহারা যুবককে দেখিতেছিলেন, যুবকের বিলম্ব দেখিয়া একে একে তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে গমন করিয়াছেন। যুবক ও আমি নবাগত হই-লেও অকুতোভয়ে সেই গাঢ় অন্ধকাররাশি মধ্যে দাঁড়াইয়া গঙ্গার মধ্যদেশে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছি সহসা গঙ্গাগর্ভে একটী অলৌকিক গোলাকৃতি আলোক প্রজ্বলিত হইয়াই নির্ব্বাপিত হইল। যুবক অপূর্ব্ব আলোক দৃষ্টে হাস্য করিয়া প্রণাম করিলেন। আমি মর্ম্মার্থ কিছু বুঝিলাম না। হঠাৎ অন্ধকারমধ্যে এই-প্রকার আলোক দৃষ্টে আমি শিহরিয়া উঠিলাম। যুবক মুখে অনবরত "জীব রাম শিব রাম" বলিতে লাগিলেন। আমিও যুবকের সঙ্গে সঙ্গে ঐ শব্দ করিতে থাকিলাম। কিন্তু তখনও নাম করায় উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম না। এমত সময় ঐ আলোক পুনরায় উপরি উপরি তিনবার প্রকাশিত ও নির্ব্বাপিত হইল। আমার মনে ভয়, বিস্ময় ও কৌতুহল আসিয়া উপস্থিত হইল। বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণার আরতি দর্শন-মানসে যে রামাপুরার বাসাবাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম, কিছুক্ষণের জন্য তাহা বিস্মৃত হইলাম। গঙ্গাগর্ভে ঐরূপ আলো যে স্থানে প্রজ্বলিত হইয়াছিল, সেই স্থান লক্ষ্য করি-য়াই দাঁড়াইয়া থাকিলাম। গাঢ় অন্ধকার,—কোথাও কিছু দৃষ্টি-গোচর হইতেছে না। তবুও নড়িতে পারিতেছি না। এইরূপ ভাবে প্রায় পনর মিনিট কাল অতিবাহিত হইল। আর কোথাও কিছু দেখিলাম না। মনে নানাপ্রকার অপ্রাসঙ্গিক চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। মনে করিলাম, হয় ত কোন নৌকাই বা মধ্যগঙ্গা দিয়া বাহিয়া যাইতেছিল, তন্মধ্যস্থ আলোই দৃষ্টি

করিয়া থাকিব; কিন্তু তখন সে বিশ্বাসের উপরও নিশ্চিত স্থির মনঃসংযোগে পদচালনা করিতে পারিলাম না। নয়ন যে আলো দর্শন করিয়াছে, তাহা যেন এ পৃথিবীর নয়। প্রদীপের, বাতীর, গ্যাসের কিংবা বিদ্যুতের আলো, হইতেও যেন সে আলো স্বতন্ত্র, তীব্র। এমত সময় অন্ধকারমধ্যে দেখিতে পাইলাম, একখানি ক্ষুদ্র নৌকা অতি দ্রুত বেগে ছুটিয়া আসিতেছে! যে স্থানে যুবক ও আমি দাঁড়াইয়া আছি, তাহারই ঠিক সম্মুখভাগেই,—কাশীবাসীদিগের পূজা আহ্নিকের জন্য যে তক্তা ফেলা আছে, সোপান-সংলগ্ন জলের নিকট হইতে দুই হাত প্রস্থের দুই তিনখানি তক্তা দ্বারা গঙ্গা মধ্যে আট দশ হাত পর্য্যন্ত যে মাচান বা মালতোলা জেঠির ন্যায় গিয়াছে, প্রাতে ও সন্ধ্যায় কাশীবাসী অনেক নর-নারী তাহারই উপর বসিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাদি করিয়া থাকেন। এ দৃশ্য যে পাঠক কাশীর দশাশ্বমেধ ও মণিকর্ণিকার ঘাট দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আর বুঝাইতে হইবে না। সহসা ঐ ক্ষুদ্র নৌকাখানি আসিয়া আমাদিগের সম্মুখস্থ ঐ তক্তা-সাকোর অগ্রভাগে সংলগ্ন হইল এবং নৌকা-মধ্য হইতে একটী দেবমূর্ত্তি ঐ তক্তার অগ্রভাগেই অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে তীরভুমি স্পর্শ করিলেন। আমরা যে স্থানে দাঁড়ইয়াছিলাম, তাহার আটদশ হাত দূরে জলের উপরে তক্তার অগ্রভাগে এই মূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, এখন ক্রমে আমাদিগের নিকটবর্ত্তী হইতেছেন দেখিয়া আমি স্পষ্ট তাঁহার অবয়ব দেখিতে পাইব বলিয়া বিশেষ কৌতূহলী হইয়া, অগ্র পশ্চাৎ না সরিয়া ঠিক একই ভাবে একই স্থানে দাঁড়াইয়া আছি, আবার সেই অলো দপ্ করিয়া জলিয়াই নির্ব্বাপিত হইল। আমি ঐ তীব্র আলোক-সাহায্যে সহসা সেই দেবমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই হতচৈতন্য হইয়া পড়িলাম।

যখন চৈতন্য হইল, চাহিয়া দেখি, আমার পার্শ্বে সেই অলোক-সামান্য যুবা পুরুষ বসিয়া আছেন, আর শিরোদেশে দণ্ডায়মান এক বৃদ্ধ। তাঁহার সুপক্ক-শ্মশ্রুবিশিষ্ট মুখ, উন্নত নাসিকা, তেজোব্যঞ্জক চক্ষু, সূক্ষ্ম অধর, বলিষ্ঠ গৌরবর্ণ বপুঃ এবং দক্ষিণ হস্তে একটী দড়ীয়া নারিকেলের কমণ্ডলু। সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে যুগপৎ ভয় ও ভক্তির উদয় হইল, সহসা তাঁহার মুখের দিকে তাকাইয়াই আমার অপূর্ব্ব আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। তখনও মাথা ঘুরিতেছে। আমি কোথায় কি দেখিতেছি, সে স্মৃতি ভাল-রূপে আসে নাই। সহসা আমাকে এইরূপেভাবাপন্ন দেখিয়াই যেন বৃদ্ধ পুরুষ আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিতে বলিলেন, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

সহসা আমি কি বলিতে যাইতেছিলাম। আমার সঙ্গী যুবা—যদিও এ পর্য্যন্ত ঐ যুবার সহিত আমার বাক্যালাপ হয় নাই, তবু এখানে সঙ্গী ভিন্ন আর কি বলিব?—তিনি ইঙ্গিতে আমায় নিষেধ করিলেন, আমি একদৃষ্টে ঐ মহাপুরুষের দিকে চাহিয়া রহিলাম।

মহাপুরুষ তখন হস্তস্থিত কমণ্ডলুটী আমার শিরোদেশে নামাইয়া বিন্দু-পরিমাণ জল আমার মস্তকে প্রক্ষেপ করিলেন, আমি আনন্দে উঠিয়া বসিলাম। এমত সময় ঐ সাধুপুরুষ সম্মুখস্থ সেই যুবকের দিকে সহাস্য-বদনে চাহিয়া তাঁহাকে সংস্কৃতে কি দু'চারিটী কথা বলিলেন, তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম না। যুবকও সহাস্যবদনে তাঁহার কথায় কি উত্তর দিলেন, ভাষানভিজ্ঞতার দরুণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণে সাধুপুরুষ যুবককে সম্বোধন করিয়া বাঙ্গলা ভাষায় কথাবার্ত্তা বলিতে আরম্ভ করিলেন। বলিলেন, "বৎস! এই নবাগত পথিক তত্ত্বতৃষ্ণাতুর বটে, কিন্তু পথহারা

পথিক; ইহাকে তুমি সদুপদেশ দিয়া পথ দেখাইয়া দিও।" তখন যুবক বলিলেন, "বহু সুকৃতি-ফলে ঐ ব্যক্তি যখন আপনার দর্শন লাভ করিয়াছে, তখন দয়া প্রকাশে আপনিই উহাকে দু'চার কথায় কিছু জ্ঞানোপদেশ দিন। আপনাদিগের কার্য্যই ত এই—পতিত উদ্ধার করা, অন্ধকে পথ দেখান, দীন জনে দয়া বিতরণ।" তখন মহাপুরুষ আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিনিক্ষেপে বলিলেন,—"বৎস!

রাম রামেতি যে নিত্যং জপন্তি মনুজা ভুবি।
তেষাং মৃত্যুভয়াদীনি ন ভবন্তি কদাচন॥
রামনাম্নৈব মুক্তিঃ স্যাৎ কলৌ নান্যেন কেনচিৎ॥

যিনি রামভক্ত, শাস্ত্র তাঁহাকে বলিতেছেন—কলিকালে এই রাম নামেই তোমার মুক্তি হইবে।" এই বলিয়া সহাস্যবদনে আমাকে উপদেশসূচক বাক্য বলিতে লাগিলেন, "বৎস, তুমি কি দেখিতে পাইতেছ? কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছ? তোমার জীবনের যাহা সংখ্যা, তাহা হইতে আজকার একটী দিন কাটিয়া গেল, অর্থাৎ যে কয় বৎসর আয়ুঃ আছে, তাহা হইতে আরও একদিন কমিল। একবার দেখা উচিত, কোন্ দিকে অগ্রসর হইতেছ।"

অন্যান্য শাস্ত্রে মরিবার পরে কি হইবে, এ কথা বড় বলে না। পরকাল যাঁহারা না মানেন, আমরা তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলি। শাস্ত্রমতে পরকাল না মানাই নাস্তিকতা।

কোন্ পথে যাইতেছি, এই জীবনের কর্ম্মেই তাহা বুঝিতে-পারা যায়। মানুষের দুইটী পথ,- একটী কল্যাণপথ আর একটী পাপ-পথ। "বিষয়ং বিষবৎ ত্যজ" এই একটী বাক্য শুনা যায়। যাহারা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত, তাহারাই দুঃখী; বিষয়কার্য্য করিয়া পরের প্রাণে দুঃখ দিয়া এই জন্মেই এই সমস্ত লোক প্রচুর দুঃখ পায়, আবার

মৃত্যুর পরে ইহারা ভীষণ নরকযাতনা পাইয়া পাপের কতকাংশ অবশিষ্ট থাকিতে তাহার ফলভোগ জন্য পৃথিবীতে আইসে। কে কিরূপ পাপ করিয়া আসিয়াছে, তাহার চিহ্ন ইহারা অঙ্গে ধারণ করিয়া থাকে। যাহারা কুনখী, যাহারা হাঁপানি-রোগগ্রস্ত যাহারা হাসিলে দন্তের মাড়ী বাহির হইয়া পড়ে, যাহাদের ছয় অঙ্গুলি, যাহাদের গাত্রে দুর্গন্ধ, যাহারা কুষ্ঠরোগী ইত্যাদি সকলেই পাপ করিয়া আসিয়াছে; রোগমাত্রেই পাপের চিহ্ন। নীরোগ দেহ পুণ্যের পরিচয় দেয়।

পুত্র-কন্যার অকাল-মৃত্যু ইহাও পাপের চিহ্ন। সর্ব্বদা অসন্তোষ অথবা জড়ভাবে দিন কাটান, ইহাও ভীষণ পাপের চিহ্ন। এই সমস্ত দেখিয়া মানুষ যদি সাবধান না হয়, তবে তাহার মনুষ্য-জন্মই বৃথা। স্ত্রী-পুত্র-পরিবার প্রতিপালন কোন কোন মনুষ্যরূপী পশুতেও করে।. ভবিষ্যতের সংস্থান অনেক পশু পক্ষীতেও করিয়া থাকে। ইহার জন্য মনুষ্যত্ব নহে। মনুষ্যত্বের কার্য্য—যাহাতে আর ক্লেশ পাইতে না হয়, আর রোগ শোকের হস্তে পড়িতে না হয়, আর আধি-ব্যাধি ভুগিতে না হয়, যাহাতে অর্থের জন্য পরের চাকর হইতে না হয়, আর রোগগ্রস্ত স্ত্রী-পুত্র-কন্যা লইয়া ও অসন্তুষ্ট পরিবার লইয়া জ্বালা-যন্ত্রণাময় সংসার করিতে না হয়; যাহাতে অতি কঠোর ক্লেশ যে মৃত্যু,-অতি ভীষণ যাতনা যে মাতৃগর্ভে বাস—ইহার মধ্যে আর না পড়িতে হয়। যে কর্ম্মের দ্বারা এই সমস্ত ভাবী দুঃখের হাত এড়াইতে পারা যায়, মানুষের কর্ম্ম তাহাই। ভগবান্ বলিতেছেন, "জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে"—যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরামরণ হইতে বিমুক্তি নিমিত্ত যত্নপরায়ণ হয়েন,—তাঁহারাই মানুষ। ভগবানের আশ্রয়

গ্রহণ করিয়া মৃত্যু-সংসার-সাগর অতিক্রম করাই মানবের কার্য্য। প্রকৃত মনুষ্যত্ব তাহাই,—যদ্দারা মানুষ এই কর্ম্মের জন্য মিলিত হইয়া যত্ন করে, এই কর্ম্ম জন্য সংসার করে, এই কর্ম্ম অন্যকে শিক্ষা দেয়, এই কর্ম্মের দিকে মানবজাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

যাহাই করি না কেন, সকল কর্ম্মের মূল লক্ষ্য ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করা। যে সংসার, ধর্ম্মের জন্য নহে,—যে সংসারে ভগবানের জন্য অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হয় না, যে বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ঈশ্বরের জন্য কোন কর্ম্ম করিতে শিক্ষা পায় না, তাহা ম্লেচ্ছের বাড়ী, ম্লেচ্ছের সংসার। কোন সাধু এরূপ সংসারীরি সঙ্গ করেন না। আজ ভারতের দুর্ভাগ্য, তাই বহু সংসারই এইরূপ। অথচ এই বড় বাড়ীর ধনবান্ কর্ত্তৃগণ ভারত উদ্ধারে যত্ন করেন, ইহা কিরূপ ভারত উদ্ধার আমরা জানি না। ভারত যদি বিলাতের মত হয়, অথবা জাপানের মত হয়, তবে ভারতের কোন সুখই হইবে না। কি সুখ হইবে বল? সেই রোগ, সেই আধি, সেই ব্যাধি, সেই বিয়োগ, সেই তাপ, সেই পাপ সেই মনের ছট্‌ফটানি, সেই পুত্রকন্যার নিত্য রোগ-যাতনা,—এই সমস্তই যদি থাকিয়া গেল, তবে কি হইল? রোগ হইলে ডাক্তার দেখান উচিত, এ কথা মন্দ নহে। কিন্তু এখনি রোগ সারান হইল, আবার অত্যাচার করিয়া রোগ হইল, ইহাতে লাভ কি? যাহাতে আর রোগ হইতে না পারে, যাহাতে আর ডাক্তার আনিতে না হয়—এই শিক্ষা যিনি দিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ শিক্ষক। এই শিক্ষা মত যাঁহারা চলেন, তাঁহারাই যথার্থ শিক্ষিত। বিপদ আসিতে না দেওয়াই ভারতের শিক্ষার বিশেষত্ব।

শাস্ত্র বলেন—ভগবানের জন্য শরীর, মন ও বাক্য স্পন্দিত কর,

তুমি ইহজীবনে সুস্থ থাকিতে পারিবে। এবং এই জীবনেই যদি সিদ্ধিলাভ করিতে পার, তবে আর জরা-মরণের অধীন হইবে না।

বর্ষশেষে কিংবা যুগান্তেও কি একবার আলোচনা করা উচিত নহে যে, শরীর মন ও বাক্য ভগবানের জন্য কতটুকু স্পন্দিত হইল? ভগবানের জন্য মন কতটুকু খাটিল? যে সমস্ত দোষ আমার আছে, তাহার কতটুকুর শান্তি হইল। আমি যে ঈশ্বর আশ্রয় করিলাম, আমার হইল কি? রাগ দ্বেষ কি আমার কমিল? লোকে ভাল বলিলে সুখ, মন্দ বলিলে দুঃখ—ইহা কি আমার উপেক্ষার বস্তু হইল? আমি কি ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায় আছে, তাহার কোন একটীও অভ্যাস করিতে পারিলাম? আমি কি ভাবনাভ্যাসী হইলাম?

অভ্যাসে চেষ্টা করিলাম তথাপি হইল না, ইহাতে আর কি করিব?—ইহাই অনেকে বলিয়া থাকেন। আমরা বলি, সখের চেষ্টায় অভ্যাস হয় না। তেমন করিয়া কিছু করা হয় নাই। চেষ্টা করিয়াও যখন তুমি জপ বা ধ্যান বা আত্মবিচার অভ্যাস করিতে পারিতেছ না, তখন তোমার জানা উচিত, তুমি বহু পাপ করিয়াছ। কত পাপ করিয়াছ—অন্যে জানিতে না পারুক, কিন্তু তুমি আপনি তাহা জান। পাপ তোমার প্রচুর, এজন্য তোমার কিছুই অভ্যাস হইতেছে না, রাগ দ্বেষ যাইতেছে না, পরের কথায় সুখ-দুঃখ উপেক্ষা হইতেছে না। যে যে ইন্দ্রিয় দ্বারা পাপ করিয়াছ, আগামী বৎসরের প্রথম হইতেই সেই সেই পাপের দ্বারগুলি রক্ষা কর। এক বৎসর ধরিয়া চেষ্টা কর—পাপ কমিবে, তোমার অভ্যাসও স্থায়ী হইবে, তুমি ধারণাভ্যাসী হইয়া মরিতে পারিবে। যদি সিদ্ধিলাভের পূর্ব্বে দেহ ছুটিয়া যায়, তাহাতেও তোমার লাভ। তুমি

একবারে ত জন্ম-মরণের হস্ত এড়াইতে পারিবে না। পাপত্যাগের চেষ্টা শাস্ত্রমতে ত, কর নাই, এখন হইতে কর; তবু কল্যাণপথে অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারিবে। নতুবা যেমন আছ সেইরূপই যদি চল, তবে পাপপথে যাইতে যাইতে তুমি মরিবে, তোমায় আবার জন্মিতে হইবে, আবার এই কলিযুগের সংসার করিতে হইবে। যদি আশা দিয়া নিরাশ করিয়া থাক, নিজেও নিরাশ হইবে। যদি মন খুলিয়া দান করিয়া না থাক, তবে দরিদ্র হইবে। কলিযুগের দরিদ্রকে ধনের জন্য কত কি করিতে হয়, তাহা ত দেখিতেছ। তাই বলিতেছি, বর্ষশেষে বা যুগান্তে একবার করিয়া নিজে নিজে বিচার করিয়া দেখ—কোন্ দিকে কত অগ্রসর হইলে। শাস্ত্র পুরাণাদি কিছুতেই অবজ্ঞা করিও না, এক একবার দেখিও, বহু উপকারে আসিবে। মহাভারত বলিতেছেন—

হস্ত, বাক্য, উদর ও উপস্থ এই চারিদ্বার দ্বারাই মনুষ্য পাপে লিপ্ত হয়। এই চারিদ্বার সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে হইবে। বয়সের ধর্ম্মে কোন কোন ইন্দ্রিয় অবশ হইয়াছে অথবা নিতান্ত অপব্যবহারে তাহাদের শক্তিহ্রাস হইয়াছে; কিন্তু মনের ভিতরে গূঢ়-ভাবে সকল ইচ্ছাই রহিয়া গিয়াছে। আবার একটু যুবা-ভাব যদি তোমাকে দেওয়া যায়, তবে তুমি আবার সেই সমস্ত পথ অবলম্বন করিয়া পাপই করিবে। কেন না তুমি কখনও পাপত্যাগের জন্য বিশেষ যত্ন চেষ্টা কর নাই। সুপথও ধর নাই।

মহাভারত আবার বলিতেছেন ;—

(১) অক্ষক্রীড়া, পরধনাপহরণ, নীচজাতির যাজন এবং ক্রোধ বশতঃ কাহাকেও প্রহার না করিলেই হস্তদ্বার রক্ষিত রহিল।

(২) যে ব্যক্তি সতত মিতভাষী ও সত্যব্রত, যিনি, অপ্রমত্ত

হইয়া ভগবানের নাম করতঃ ক্রোধ, মিথ্যাবাক্য, কুটিলতা ও লোক-নিন্দা পরিত্যাগ করেন, তাঁহারই বাক্‌দ্বার সুরক্ষিত। কঠোর বাক্য বলা, অহঙ্কারের কথা কহা, অনেক গল্প করা—ইহাও ব্যভিচার।

(৩) যে ব্যক্তি অতিভোজন ও লোভ পরিত্যাগ পূর্ব্বক শরীর-রক্ষার্থ যৎকিঞ্চিৎ আহার ও সতত সাধুদিগের সহবাস করেন, তিনিই জঠরদ্বার রক্ষা করিতে পারেন।

(৪) যে ব্যক্তি এক পত্নী সত্ত্বেও সম্ভোগার্থ অন্য কামিনীর পাণিগ্রহণ, পরস্ত্রীগমন, ঋতুকাল ব্যতীত স্বীয় পত্নীতে বিহার না করেন, তাঁহার উপস্থদ্বার পরিলক্ষিত হয়।—শান্তিপর্ব্ব। ২৬৯।

কর্কশ কথা কহিয়া কাহারও প্রাণে ক্লেশ দেওয়া, সর্ব্বদা নিজের শ্লাঘা করা, কথায় কথায় অহঙ্কার প্রকাশ করা, বৃথা সমালোচনা দ্বারা পরের নিন্দা করা, ক্ষুধায় অস্থির হইয়া ভক্ষ্যদ্রব্য প্রাপ্তি-মাত্রে প্রমত্ত হইয়া ভক্ষণ করা ইত্যাদি দোষ পরিত্যাগ জন্য কলির মানুষের সহজ উপায় বলিতেছি,—আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম্ম যথাসময়ে ত সম্পন্ন করিতেই হইবে, তাহার পর সর্ব্বক্ষণ তোমার ইষ্ট দেবতার নাম জপ করিবে। যদি সর্ব্বদা নাম-জপ অভ্যাস কর, তাহা হইলে তুমি বহু দোষ এড়াইতে পারিবে। লোকসমাজে আহূত হইয়া তুমি অধিকক্ষণ থাকিতে পার না, অন্য লোকে কথা কহিতেছে—তোমার যদি অনুকূল না হয় তবে তুমি ছটফট কর, কেন কর? যে যাহা বলে বলুক না, তোমার ক্ষতি কি? তুমি ইষ্ট-মন্ত্র জপ করনা কেন! তুমি প্রাণের ভিতর কি করিতেছ, অন্যে তাহা জানিবে কি করিয়া? ইহাতে তুমি কোথাও কাহারও প্রাণে ব্যথা দিলে না, অথচ আপন কর্ম্মও হারাইলে না, আর অন্যের কথার মধ্যভাগে ছন্ন জ্ঞান করিয়া উঠিয়াও গেলে না। ভোজনকালে

নিবেদনটা চট্ পট্ সারিয়া প্রমত্ত হইয়া যে ভোজন করা, ইহাতে বহু দোষ। প্রতি গ্রাসে ভগবানের নাম জপ করিতে করিতে পান ভোজন কর,—শাস্ত্র ইহাই বলিতেছে। খোস গল্প করিতে করিতে ইয়ার বন্ধুর সঙ্গে আহার করা, ইহা ধর্ম্মশূন্য আহার। আহার আমাদের দেশে মহাযজ্ঞ; অন্য কথা না কহিয়া ভগবানের নাম করিতে করিতে আহার করিলে আয়ুঃ বৃদ্ধি হয়।

পূর্ব্বে যে রাম-নামের কথা বলিয়াছি, ঐ নামই যাহার কুল-মন্ত্র, তাহাকে ঐ নাম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা ব্যভিচার ঘটিবে। কুলগুরু অথবা কুলমন্ত্র ত্যাগ করা কাহারও কর্ত্তব্য নহে। যাহার কুলমন্ত্র শিব বা কালী, দুর্গা বা কৃষ্ণ, তাহাকে ঐ ঐ মন্ত্রই গ্রহণ করিতে হইবে। তোমার রুচি বা অরুচি এখানে তুলাদণ্ড নহে। কারণ রামভক্তের কাছে থাকিলে তোমার রামে রুচি, কৃষ্ণভক্তের কাছে কৃষ্ণকথা শুনিলে আবার কৃষ্ণে রুচি হয়। আবার শক্তি-উপাসকের কাছে থাকিলে শক্তিই ভাল লাগে। তোমার রুচির ত এই অবস্থা। অতএব কুলগুরু ও কুলমন্ত্রেরই উপাসনা কর, কিন্তু অন্য দেবতাতে অভক্তি করিও না। তোমার ইষ্টদেবতাই রাম, তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই কালী, তিনিই শিব, তিনিই দুর্গা। পরমেশ্বর এক—তাঁহার নাম বহু, রূপ বহু। তোমার বংশপরম্পরায় যাঁহার উপাসনা হইয়াছে, তিনি সহজেই তোমার উপর প্রসন্ন হইবেন। তাঁহাকেই অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। লাভ কিছু থাকুক আর নাই থাকুক, ক্ষতি বিশেষ কিছু ত নাই; যদিই লাভ থাকে, তবে না ক'রে তা হারাও কেন?

আমি এতক্ষণ এই মহাপুরুষের বাক্য একাগ্রমনে শুনিতে ছিলাম। কি আশ্চর্য্য! আমার মুখে 'জীব রাম, শিব রাম, তারক

ব্রহ্ম রামনাম, এই কথা শুনিয়াই বুঝি ইনি এত কথা আমাকে উপদেশ দিতেছেন। আজ আমার সুপ্রভাত যে, সাধু যুবকের দর্শন পেয়েছিলাম। আজ আমি ধন্য হ'লেম। আমার আজ কাশী দর্শন সার্থক হ'ল। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। এ মহাপুরুষ কে? ইনি কোথায় থাকেন? এত অযাচিত দয়াই বা আমার প্রতি কেন বিতরণ করিতেছেন? মনে মনে বাবা বিশ্বনাথকে উদ্দেশে প্রণাম করিয়া জানাইলাম,—বাবা! এ তোমার কি খেলা। অধম সন্তানকে কি এইরূপেই উপদেশ দিতেছ? তোমার খেলা তুমিই জান, আমি তোমার ক্ষুদ্র সন্তান তাহার কি বুঝিব?

মনে ভাবিলাম,—নিশ্চয়ই এ চক্রীর চক্র, নচেৎ আমি নবাগত অপরিচিত পথিক, এই মহাপুরুষের সঙ্গে আমার কস্মিন্ কালেও সাক্ষাৎ নাই, ইনি কি করিয়া জানিলেন যে, আমার ইষ্টদেব রাম নহেন। আমি কিছু আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম, এবং যুগপৎ আনন্দও আসিয়া আমার হৃদয় অধিকার করিল। আমি এতক্ষণ পরে উঠিয়া ভাল হইয়া বসিলাম এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া মহাপুরুষের পদধূলি গ্রহণ করিতে গিয়া দেখি—তিনি নাই। তখন যে মনের ভাব কি হইল, তাহা আর লেখনী দ্বারা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। আমার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিল। কিছুক্ষণ এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া নানা চিন্তার পর একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখি—অন্ধকার ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, সম্মুখে পবিত্রসলিলা গঙ্গা যেন আমাকে তিরস্কার করিয়াই কুল কুল রবে বহিয়া যাইতেছেন, সে কুল কুল রবের অর্থ যেন—পাইয়া হারালি অবোধ! চিনিলি না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—‍‍‍‍‍‍‍‍—

প্রার্থনা ও উন্মাদ কল্পনা।

আমি হতাশ হইয়া কিয়ৎক্ষণ বসিয়া থাকিয়া—উঠিয়া দাঁড়াইলাম। মস্তক ঘুরিতে লাগিল। এতক্ষণ যে দৈববাণী শুনিতেছিলাম, তাহার সার মর্ম্ম মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলাম। কোথাও সাড়া শব্দ নাই,—ঘোর অন্ধকাররাশির মধ্যে আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলাম,—এই উপদেশ দিতেছিলেন, হঠাৎ কোথায় গেলেন! এরূপ অদৃশ্য ত এক যোগী পুরুষেরাই হইতে পারেন শুনিয়াছি; কিন্তু কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই। তবে কলিকাতায় গ্রসী ও থারষ্টন্ দেখিয়াছি বটে, তাহারা যাদুবিদ্যাবলে এরূপ অদৃশ্য হইতে পারে এবং আরও অনেক অনেক অলৌকিক আশ্চর্য্যজনক ব্যাপার দেখাইয়া থাকে। এও কি তাই! না তাহা কখনই না। ইনি প্রকৃতই মহাপুরুষ। বিশেষ বাল্যকাল হইতে শুনিতেছি, এই কাশীধামে অনেক মহাপুরুষের বাস। এখানে প্রকাশ্য ও গুপ্তভাবে অনেক যোগী পুরুষ বাস করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে ত্রৈলঙ্গস্বামীর কথা শুনিয়াছি। বোধ হয় পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নাম শুনিয়া বা তাঁহাকে দেখিয়া থাকিবেন। তিনি একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তাই মনে মনে ভাবিলাম, হয়ত ইনিও সেই শ্রেণীর কেহ হইবেন।

যাহাই হউক, আমার আর এ বিষয়ে বিচার করিবার শক্তি বেশীক্ষণ থাকিল না। আমি যেন মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় কি এক রকম হইয়া গেলাম। সাধু দর্শনে কি মানুষ এইরূপ হয়? আমার শরীরের মধ্যে যেন কি এক প্রকার তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে লাগিল, সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়া আসিল, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম। ইতিপূর্ব্বে যে আমি কত উৎসাহ করিতেছিলাম—কাশী আসিয়াছি, বিশ্বেশ্বর ও মা অন্নপূর্ণা দর্শন করিব,—মুহূর্ত্ত মধ্যে আমার সে সমস্ত উৎসাহ কোথায় ভাসিয়া গেল। এখন আমার মনের গতি ভিন্নভাব ধারণ করিয়াছে। আমি পার্শ্ববর্ত্তী সাধু যুবার গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া, কাঁদিয়া বলিলাম, "আমার কি হইবে?" তিনি হাস্য করিয়া বলিলেন, "চিন্তা কি? বীজ বপন হইয়াছে, কালে বৃক্ষরূপে শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ফলভারে নত হইবে, এখন কর্ম্ম কর।"

সহসা আমার মনে হইল। লোক-ব্যবহার ত ঠিক হইল না। যেহেতু সর্ব্বচিত্ত আরাধনা করা গেল না। সকলকে সন্তুষ্ট রাখা গেল না। আর বৈদিক কর্ম্ম অভ্যাসও বন্ধ হইল না। ভাব স্থায়ী হইল না। চিত্ত সর্ব্বদা ভগবান লইয়া থাকিল না।

হে প্রভু! হে আত্মদেব! আমি আবার প্রাণপণ করিব, তুমি প্রসন্ন হও। কার্য্যে সকলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকিতে পারিলাম না। বহুলোকের নিকট উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, কৃতঘ্ন হইতে আদৌ ইচ্ছা নাই। কৃতজ্ঞ থাকিতেই সম্পূর্ণ ইচ্ছা। তথাপি কৃতজ্ঞ হইয়া সকলকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না। হে হৃদয়বাসিন্! আমি নিতান্ত তোমার আশ্রিত, আমি তোমার সন্তোষার্থে প্রাণপণ করিতে পুনরারম্ভ করিতেছি। তুমি প্রসন্ন হও। তাহ'লে জগৎ আর আমাকে কৃতঘ্ন বলিবে না। হরি হরি! কৃতঘ্নতা নামেই আমি ভীত হই।

শাস্ত্র সকল অপরাধের ক্ষমা ব্যবস্থা করিয়াছেন। গোহত্যা, সুরাপান, চৌর্য্য, ব্রতভঙ্গ—সাধুগণ এ সমস্ত অপরাধের নিষ্কৃতি বিধান করিয়াছেন; কিন্তু 'কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ'। শাস্ত্র আরও বলেন—"কৃতঘ্নঃ সর্ব্বভূতানাং বধ্যঃ।" হে ভগবন্! আমি তোমাকে প্রসন্ন করিতে প্রাণপণ করিতেছি, তুমি তোমার সর্ব্বজীবকে আমার উপর প্রসন্ন করিয়া দাও। আমি জনে-জনের সন্তোষ সাধন করিতে পারিলাম না।

কথায় যাহা করিব প্রতিজ্ঞা করিলাম, কাজে তাহা করিলাম না। আমি বড়ই দুরাচার। হে প্রভু! আমায় পরিত্রাণ কর। বড় সাধ ছিল—এখনও আছে, সংসার হইতে আমায় মুক্ত কর। আমায় জ্ঞান প্রদান কর। ইহার জন্য আমায় কর্ম্ম করাইয়া লও। আমিও প্রাণপণ করিয়া কর্ম্ম করি। জ্ঞানলাভ করিয়াও আমার প্রাণের সাধ যেন থাকিয়া যায়। আমার মনে হয় আত্মজ্ঞানী হইয়া তোমার সেবা করি। আত্মজ্ঞানী হইলে কি সেবায় অধিকার থাকে না? না থাক্ জীবাত্মায় পরমাত্মায় প্রভেদ; নির্গুণ ব্রহ্ম যে কারণে সগুণ হয়েন, আমিও সেই কারণে এক হইয়াও পৃথক হইয়া যাহা করিতে হয় করিব। শুনিয়াছি—জ্ঞানী ভগবান্ বশিষ্ঠদেব ইহাই করেন, ভক্ত ভগবান্ শ্রীনারদ শুকদেবাদিও এইরূপ করিয়া থাকেন। মহাজনেরা লোকশিক্ষার্থ কার্য্য করেন, আমরা আর শিখিব কোথা হইতে?

এ সাধ পূর্ণ করিতে হইলে কর্ম্ম চাই। কিন্তু কর্ম্ম ত করিলাম না। ইহা বলি না যে, করিতে পারিলাম না। যাঁহারা বলেন পারিলাম না, তাঁহারা ত চেষ্টা করিয়া পরে বলেন 'পারিলাম না।' আমি বলি—করিলাম না। কর্ম্ম করিতে প্রাণপণ করিলাম না। যাহা

করি বলিয়া মনে হয়, তাহা প্রাণপণ করিয়া করি না। এ কর্ম্ম করা সখের। যখন ভাল লাগিল—করিলাম, যখন ভাল লাগিল না—করিলাম না। এ সখের সাধনায় তোমায় পাওয়া যাইবে না প্রভু! বেলা আর কতটুকু আছে জানি না, যতটুকুই থাক্, একবার সখ মিটাইব। এ সখটুকু আর থাকে কেন? সব মিটিয়াছে, সংসারও দেখা হইল, লোকসঙ্গও করা হইল, ভারত উদ্ধারও দেখা হইল। এ দিকের সখ মিটিয়াছে, এখন ঋষিদিগের দিকটা বাকী। সে সখ মিটাইব।

ভাল, পুনরারম্ভ করিলে হয় না? এতদিন ধরিয়া যাহা করিয়াছি, যেন কিছুই করি নাই। আর একবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিব।

যেন কল্য হইতে আমার নূতন জন্ম হইল। দেহত্যাগের পরে যে জন্ম, তাহাতে বাল্যকাল থাকিবে, যৌবন থাকিবে, কতদিন বৃথা যাইবে। আবার অজ্ঞের মত কত কার্য্য করিতে হইবে, কত পাপ করিতে হইবে, কত ন্যায়-অন্যায়-সংস্কার পড়িবে, কত ক্লেশ ভোগ করিয়া—কত দাগা পাইয়া—কত ঠেকিয়া শিখিয়া এখনকার এই অবস্থা লাভ করিতে হইবে, কতবার চোর পলায়নের পর বুদ্ধি বাড়িবে। তায় কাজ কি? অনেক ঠেকিয়া, অনেক শিখিয়া, এখন একরূপ দাঁড়াইয়াছি। মনে করি অদ্য আমার মৃত্যু হইল, কাল জন্মিলাম। যাহারা পরিচিত, তাহারা গত জন্মের পরিচিত। ইহাদের কাছে কোন না কোন বিষয়ে আমি ঋণী। এ ঋণ আমার শোধ করিতে হইবে, নতুবা কর্ম্মক্ষয় হইবে না। বাহিরে চেনা লোকের মত ব্যবহার করিতে হইবে কিন্তু ভিতরে দেখিব এরা কেহই নহে, কোন সম্পর্ক ইহাদের সহিত আমার নাই। তথাপি

একটা ব্যবহারিক সম্পর্ক রাখিতে হইবে। লৌকিক ব্যহবার পালন করিতে সকলেই বলিয়া থাকেন।

৺কাশীক্ষেত্র আনন্দকানন। বল ভাই সংসারী! বল ভাই পরিবার-জঠর-ভরণে সর্ব্বদা ব্যাকুলাত্মা! বল ভাই, সত্য বল এ কাশীধাম আনন্দকানন কিসে? চারিদিকে কি দেখিতে পাও? এখানেও সর্ব্বত্রই ত মৃত্যুর চিহ্ন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা যে গৃহে নাই, এমন গৃহ কমই দেখা যায়। রাস্তায় বাহির হইলে রোগগ্রস্ত জরাজীর্ণ মানুষ যে সময়ে না দেখা যায়, সে সময়ই নহে। যে দিন 'রাম রাম সত্য হ্যায়' 'হরি হরি বোল' না শুনা যায়, সে দিনই নয়। তা ছাড়া বালক বালিকা যুবক যুবতীও মরে।

রামাপুরা মোকামে প্রাতঃস্মরণীয় ভিষকৃশ্রেষ্ঠ কলিকাতা কুমারটুলি-নিবাসী ৺নীলাম্বর সেনের মধ্যমপুত্র; পুত্রশোকাতুর পরদুঃখ-কাতর দেব-দ্বিজে ভক্তিমান্ সদা-সহাস্যবদন সুধার্ম্মিক সুচিকিৎসক বয়োবৃদ্ধ আদর্শগৃহী কবিরাজ শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সেন, তাঁহার মৃতপুত্রের আকাঙ্ক্ষা পূরণার্থে স্বীয় পুত্রবধূ অশেষগুণ-সম্পন্না, বদনকমলা দেবীতুল্যা শ্রীমতী ক্ষীরদাসুন্দরীর আনন্দবৃদ্ধি করিবার জন্য যে শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, আমি সেই মন্দিরেই আজ বেলা ১১টার সময় উপস্থিত হইয়াছি। ভক্তের টানে ভগবানেরও মন আকৃষ্ট হয়। তাই বুঝি কিছু দিনের জন্য বাঁধা পড়িয়াছি। নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার সময় এই দশাশ্বমেধের ঘাটে উপস্থিত হইয়াছি। এখন রাত্রি আন্দাজ এক প্রহর। এই কাল মধ্যে এই কাশীপুরীর দৃশ্য দেখিয়া আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে যে জ্ঞান জন্মিয়াছে, তাইতে বলিতেছি; কে বলে ভাই ৺কাশীক্ষেত্র আনন্দকানন!

তথাপি ৺কাশী আনন্দকানন। সংসারীর পক্ষে নহে, মৃত্যু-ভীত মানুষের পক্ষে নহে। কর্ম্মের জন্য যাহাকে সংসার করিতে হয়, তাহার পক্ষে নহে। কাশী আনন্দকানন ভক্তের জন্য, কাশী আনন্দকানন সাধকের জন্য, কাশী আনন্দকানন মুমুক্ষুর জন্য। যিনি গান বাঁধিয়াছিলেন,—

"আমি চ'ল্লেম রে ভাই আনন্দকাননে।
সংসারী লোক যাঁরে শ্মশান ব'লে ভয় পায় মনে॥"

তিনি সত্যই বলিয়াছেন কাশী মহাশ্মশান, সংসারীর এই শ্মশানে সর্ব্বদা ভয়। যাহারা মরিতে আসিয়াছে, যাহারা মরিতে প্রস্তুত, তাহাদের জন্য কাশী। সংসারীর বড় বিপত্তি এই কাশীক্ষেত্রে। কাশীপুরাধিপতি স্থানে অস্থানে, সময়ে অসময়ে, যাহাকে তাহাকে পুত্রহীন বা কন্যাহীন, পিতৃহীন বা মাতৃহীন, পতিহীন বা স্বজনহীন করিয়া বুঝাইয়া দিতেছেন—রে সংসারী! কাশী তোমার জন্য নহে। প্রায়ই শুনা যায় যে, ভাই মরিল, কন্যা মরিল, স্ত্রী মরিল, পতি মরিল, পুত্র মরিল,—ইহারা কোন কার্য্য না করিয়া কোন সাধ না মিটাইয়া মরিল। প্রভু বিশ্বেশ্বর বালক বালিকাকে ক্রোড়ে লইলেন সত্য, বালক বালিকাকে মুক্তি দিলেন সত্য; কিন্তু সংসারী পিতা মাতা তাঁহার দয়া হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিল না, শোকে আচ্ছন্ন হইয়া ভগবানের চরণ আশ্রয় করিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু যাঁহারা সাধক, তাঁহারা ভগবানের ইঙ্গিত বুঝিয়া, ভগবানের কৃপা দেখিয়া মহাশ্মশানে সঙ্কল্প পাঠ করিতে করিতে, হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেলেন।

এইস্থানে আমি কাশীর সঙ্কল্পপাঠ শুনিয়া বড় প্রীত হইয়াছিলাম। "কাশীধাম-বারাণসীক্ষেত্রে গৌরীপীঠে আনন্দকাননে মহাশ্মশানে"

এই সকল বাক্য উচ্চারণ পূর্ব্বক এ স্থানে রাম নাম শুনিতে শুনিতে যাহার মৃত্যু হয়, সে জীবের কি আর জন্ম হয়?

তাই ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই কাশীক্ষেত্রে এই জাহ্নবী লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"মাতঃ শাম্ভবি! শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং-
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রি দ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে,
ভূয়াৎ ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী॥"

মা! হরজটাজূটাটবী-চারিণি! মা, তুমি কাশীপুরাধিপতি শিবশম্ভুর অঙ্গে মিলিত আছ। গঙ্গাজল তাঁহার বড় প্রিয়, তাই সকলে এই মজ্জজ্জনোত্তারিণী গঙ্গা হইতে জল তুলিয়া সেই জল তাঁহার জটাজূট-বিহারী তোমার জলের সঙ্গে মিলাইয়া দেয়। আমি মৌলিদেশে অঞ্জলি ধরিয়া এই প্রার্থনা করিতেছি মা! তোমার তীরে দেহাবসান-সময়ে আমি যেন যম-যাতনা অগ্রাহ্য করিয়া নারায়ণের চরণারবিন্দ আনন্দে স্মরণ করিতে পারি। আমার যেন সেই অন্তিম কালে অদ্বৈত হরিহরাত্মক পরব্রহ্মে ভক্তি অচলা থাকে।

এইরূপ জন্ম মৃত্যু ত কতবারই হইয়া গিয়াছে, প্রত্যেক বারেই নিদারুণ যাতনা ভোগ করা গিয়াছে। সকলেই ইহা ভুগিয়াছে, তাই সকলেরই মৃত্যুকে বড় ভয়। যতদিন ধর্ম্মজীবন লাভ না হইতেছে, যতই ভারত উদ্ধার বা জগৎ উদ্ধারে প্রাণপণ করনা কেন, শেষে মনে হইবে হায় কি করিলাম! কেন তখন গুরুবাক্য স্মরণ করিয়া আত্মোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে ভারত বা জগৎ উদ্ধারের চেষ্টা না করিয়াছিলাম। হায়। কেন তখন

বুঝিলাম না, প্রকৃত শক্তিমান্ না হইয়া জগতের কার্য্য করিতে গিয়া জগতের কার্য্য ও হইল না, নিজের শান্তিও মিলিল না।

তখন সাধু যুবা আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "ভাই শুধু মুখে বলিলে কি হইবে? যে বেলাটুকু আছে সেইটুকুর যদি সদ্ব্যবহার কর, যাহাদের অনেক সময় আছে তাহারা যদি এখন হইতে সময়ের সদ্ব্যহার করিতে অভ্যাস করে' তবে নিশ্চয়ই কাঙ্গালের বন্ধু অধমকে ত্রাণ করিবেন। — -

তবে এস আবার একবার চেষ্টা করি, আবার একবার অভ্যাস করিতে প্রাণপণ করি। যে চেষ্টা করে, তিনি তাহার সহায়। কৃপা তাঁহাকেই করেন—যে আপন শক্তি দ্বারা প্রাণপণ করে।

প্রথমেই সন্ধ্যা উপাসনা কর, তার পর পরিপূর্ণ আত্মার কথা মনে কর।, আত্মা অখণ্ড জ্ঞান।" এই যে জগৎ ভাসিয়াছে, ইহার যেখানে যাহা আছে তাহার অনুভবকর্ত্তা একজন আছেন। তিনিই আত্মা, তিনিই জ্ঞান, তিনিই জ্ঞানময় দেহ ধারণ করেন।

আমি যখন নিদ্রায় ছিলাম, তখন যে কি অনুভব করিতেছিলাম কিছুই ত মনে নাই। এখন জাগিয়াছি। জাগিয়াই আপন দেহ এবং আপন সঙ্কল্পপূর্ণ মনের কার্য্য অনুভব করিতেছি। অনুভব করিতেছি, তাই বলিতেছি ইহারা আমাতে আছে। যতক্ষণ অনুভব না করিয়া ছিলাম, ততক্ষণ অন্ততঃ আমাতে ছিল না। কিন্তু ইহারা ছিল এইজন্য যে আর একজনের অনুভবে ছিল—সেই সামান্য চৈতন্যে ইহা ছিল। বিশেষ চৈতন্য যে চিদাভাস, তাহা তখন জাগ্রতাবস্থায় ছিল না।

আত্মার চিন্তা করিতে করিতে একবার দেহের কথাটাও ভাব।

যত দুঃখ দিতেছে এই 'দেহটা। আত্মার সহিত ইহার কিছু মাত্র সম্পর্ক নাই; মূঢ় ব্যক্তিই নিজ সঙ্কল্প দ্বারা দেহের সহিত একটা সম্পর্ক পাতাইয়া পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাসে দেহের সুখদুঃখকে আত্মার সুখদুঃখ মনে করিয়া বৃথা ক্লেশ ভোগ করে। তুমি মূঢ় হইয়াও না, তুমি পণ্ডিত হও। প্রতিদিন স্মরণ কর, আত্মা বস্তুতঃ আৰ্ত্ত হন না। তবে দেহ আৰ্ত্ত হওয়ায় তিনি আৰ্ত্ত বলিয়া প্রতিভাত হন। আত্মাতে কোন পীড়া নাই, আলস্য অনিচ্ছা আত্মাতে নাই, জড়তা আত্মাতে নাই, মনের চাঞ্চল্য আত্মাতে নাই। চর্ম্মের থলিয়া পূর্ণ থাক্, অপূর্ণ থাক্, তাহাতে আত্মার কি? দেহ নষ্ট, ক্ষত বা ক্ষীণ হউক, তাহাতে আত্মার ক্ষতি কি? দেহ পতিত হউক বা উত্থিত হউক, তাহাতে আত্মার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। পুষ্প নষ্ট হইলে তদীয় সৌরভের ক্ষতি কি? সৌরভ আকাশ আশ্রয় করিবে। আমাদের শরীররূপ পদ্মে সুখদুঃখরূপ তুষারপাত হউক না কেন, আমাদের ক্ষতি কি? যাহারা আকাশে উড্ডয়নশীল মধুকর, তাহারা আকাশে উড়িয়া যাইবে। দেহ পতিত হউক, উত্থিত হউক বা অগ্নিমধ্যে গমন করুক, আমি যখন দেহ হইতে পৃথক, তখন আমার কি ক্ষতি হইবে? মেঘের সহিত বায়ুর যে সম্বন্ধ, ভ্রমরের সহিত পদ্মের যে সম্বন্ধ, সরোবরস্থিত জলে চন্দ্রের যে সম্বন্ধ, শরীরের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ।

এইরূপে দেহ যাক বা থাক, আত্মদেবের কোনই ক্ষতি নাই ভাবনা করিয়া, সেই পরিপূর্ণ জ্ঞানস্বরূপ আত্মদেবকে আমি স্মরণ করি তিনি সর্ব্বলোক ব্যাপিয়া আছেন, সেই দ্যুতিমান্ বিভু তাঁহার উপাসনীয় শক্তির সহিত এক, সেই শক্তি আমাদিগের বুদ্ধিকে তাঁহার নিজের দিকে প্রেরণ করেন।

ব্রাহ্মণগণ যে গায়ত্রীর উপাসনা করেন, সেই শক্তিরূপা ব্রহ্মবাদিনী গায়ত্রী তিনিই।

"আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসাং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তু তে॥"

মা! আমার আর কেহ নাই মা! যাহারা ছিল তাহারা ভুলে ছিল। তাহারা সকলে চলিয়া যাইতেছে, কেহ বা শীঘ্রই যাইবে। কেহবা গিয়াছে। ইহাদিগকে আমার আমার করিতাম ভুলিয়া। যে আমার, সে ত চিরদিনই আমার থাকিবে। সে কেবল তুমি। তাই বলি, মা! তুমি আমার। আমার আর কেহ নাই। ও মা! আমি তোমায় প্রসন্ন করিবার জন্য সন্ধ্যাবন্দনাদির মন্ত্রে তোমার নিকটবর্ত্তী হইবার অভিলাষ করি। মা, জগজ্জননি! আমি বলহীন, আমাকে বল দিয়া আমাকে প্রাপ্ত হও। আবার বলি, পতি যেমন জায়াকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, মা যেমন দুর্ব্বল বালককে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, গাভী যেমন বৎসকে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ তুমি আমাকে প্রাপ্ত হও। আমি তোমার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া শাস্ত্রবিধিমত সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছি। সন্ধ্যাই প্রথম কার্য্য।

পরে দ্বিতীয় কার্য্য। দ্বিতীয় কার্য্য—মাতার আশ্বাস পাইয়া শক্তিমূর্ত্তি বা শক্তিমানের মূর্ত্তি দর্শনে ব্যাকুলতা। তাঁহাকে দর্শন করিব—তজ্জন্য জপ। ইহা দ্বিতীয় প্রকারের জপ। ইষ্ট মন্ত্র জপে যতক্ষণ না দেহের তমোভাব ছুটে, ততক্ষণ ঘন ঘন মুখস্থ করার মত স্থির আসনে শরীরকে নৃত্য করাইয়া মন্ত্রজপ। এই মন্ত্র জপে কূটস্থে এক প্রকার স্পন্দন হয়। ইহা যাহাদের অনুভবে আইসে না, তাঁহারা কল্পনায় ইহা চেষ্টা করিবেন! ইহার পরে মানসে ইষ্ট দেবতার পূজাদি। তদন্তর তাঁহাকে স্থির ভাবে হৃদয়ে ধরিয়া

প্রাণায়ামাদি ব্যাপারে তাঁহার দর্শনে ব্যাকুলতা। ইহার পরে ধ্যানে দর্শন-উৎকণ্ঠা, পরে স্তবস্তুতি, বিচারগ্রন্থপাঠ, প্রত্যহ ইহার অভ্যাস। প্রাতঃকৃত্যাদির পর সমস্ত দিনের জন্য তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকা। ইহাই শাস্ত্রবিধি। এই বিধিতে কার্য্য করিলে জপ, ধ্যান, আত্মবিচার নিষ্পন্ন হইবে। ইহাতেই জ্ঞান লাভ হইলে নিশ্চয় জ্ঞানময় দেহে তিনি দেখা দিয়া চিরদাস বা চিরদাসী করিয়া রাখিবেন। ইহাই জীবনমুক্তি। ইহার অভ্যাসে যতটুকু অগ্রবর্ত্তী হওয়া যাইবে তাহাই কার্য্য।"

যুবক এই অমৃতময় বাক্য দ্বারা আমাকে কর্ম্ম শিক্ষা দিতে লাগিলেন। পুনঃ বলিলেন,—

"সকলের জীবনেই প্রাণত্যাগ কালে একটা ব্যাপার ঘটে। জীবের সমস্ত শক্তি হৃদয়ে আসিয়া একত্র হয়। নাভিশ্বাস, কণ্ঠশ্বাস ইত্যাদি যখন হয়, তখন লোক হাহাকার করে; কিন্তু প্রাণ তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়াদিশক্তিগুলিকে শরীরের সর্ব্ব অঙ্গ হইতে আহ্বান করিয়া হৃদয়ে আনিতে থাকে। এদিকে পা শীতল হইতে লাগিল, আর ওদিকে শক্তিগুলি হৃদয়ে আনীত হইল। শক্তি সমস্ত একত্র হইলেই যেমন কুম্ভকে জ্যোতিঃ বাহির হয়, সেইরূপ জ্যোতিঃ প্রকাশ পায়। প্রাণ সেই সময়ের মধ্যে ভাবনাময় দেহ গড়িয়া প্রস্তুত থাকে। জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইবামাত্র মানুষ হয় কাঁদে, না হয় হাসে। পরক্ষণেই প্রাণবায়ু দেহ ত্যাগ করে। সকলেরই ইহা হয়, তবে যাঁহাদের জ্ঞাতসারে ইহা হয় তাঁহারাই সাধক।

বহুবার মৃত্যুযাতনা জীব ভোগ করিয়াছে। তাই মরিতে হইবে ভাবিলেই জীব চমকিয়া উঠে, হায় হায় করে, বড় কাতর হয়। কিন্তু কাতর হইলে কি হইবে? দেহ ছাড়িতেই হইবে। ভাড়াটীয়া

বাড়ী হইতে কাহাকেও তুলিয়া দিতে হইলে, আগে বাড়ীওয়ালা একটা খবর দেয়। কিন্তু এই ভাড়াটীয়া বাড়ী হইতে কখন যে "নিকালো বেটা" বলিয়া তাড়াইয়া দিবে তাহার কোন ঠিকানা নাই।

এমনই কড়া বাড়ীওয়ালা (যমরাজ)—একবার যাহাকে বাড়ী ছাড়িতে বলিয়াছে, সে শত অনুনয় বিনয় করুক, শতবার বলুক—আমার ছোট ছেলেটী বড় নাবালক, ছেলে গুলি কেহই মানুষ হইতে পারে নাই, আর দিন কতক অপেক্ষা করুন যাইতেছি, এসব কথা তার কাছে খাটে না। তোমার ছেলে সাবালক বা নাবালক হউক, তোমার পরিবারের কোন বন্দোবস্ত হউক বা না হউক, তোমার কারবারের হেপাজাত করিবার লোক যুটুক চাই নাই যুটুক, তোমার দেনা শোধ হউক চাই নাই হউক, তোমার উইল করা হউক চাই নাই হউক, সেই কথা—"নিকালো ব্যাটা"। যদি বাড়ীতে চিরদিন থাকিবার ইচ্ছা ছিল, তবে প্রথম হইতে বন্দোবস্ত কর নাই কেন? মেয়ে হইবা মাত্র দশ বৎসরের হিসাব করিয়া মাসে মাসে ২।১ শত টাকা জমা রাখিয়া ছিলে, কিন্তু এ ঘর যে তোমায় ছাড়িতে হইবে, তাকি তোমার মনে ছিল না? কতবার বলা হইল "বেলা নাইরে, তুলে নাও পশার, তোমায় যেতে হবে ভবনদীপার।" এসব তুমি গ্রাহ্য কর নাই। এখন "নিকালো" এত বলাবলিরও সময় দেয় না। প্রারব্ধ ভোগ করিতে হয় কিরূপে, বুঝিয়া কার্য্য করাই নিতান্ত আবশ্যক। তাই বলা যাইতেছিল, দেহ ছাড়িতেই হইবে। দেহের প্রকৃত কার্য্যই প্রারব্ধ ভোগ করা—দেহের প্রয়োজন কর্ম্মফল ভোগ করা। কর্ম্মফল ভোগ যেমন শেষ হইয়া যায়, অমনি দেহের পতন হয়, দেহের

অন্ত বা নাশ হয়। ইহা হইবেই। এই জন্য বলা হয় দেহের অন্ত বা নাশ ধ্রুবসত্য—"অন্তবন্ত ইমে দেহাঃ।"

দেহটা ভোগায়তন। জীব ধর্ম্ম করুক বা অধর্ম্ম করুক, আসক্তি পূর্ব্বক যাহা করিবে তাহাই সঞ্চিত হইবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম্মভোগের জন্য এই দেহ। বহুজন্ম ধরিয়া মানুষ যাহা সঞ্চয় করে, সেই ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম-সংস্কার জীবে পুঞ্জীকৃত হয়। সেই সঞ্চিত কর্ম্মের একাংশ দিয়া এই দেহ গঠিত হয়। জন্ম হইবা-মাত্র কর্ম্মভোগের প্রারম্ভ হয়। উপস্থিত জীবনের প্রথম দিন হইতে শেষ দিন পর্য্যন্ত জীবনে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহাই তাহার প্রারব্ধ। আবার এই প্রারব্ধ কর্ম্মসমূহ একবারে ফলদান করে না; প্রত্যেক কর্ম্মের ফলদানেরও সময় আছে। কর্ম্ম যখন ফলদান করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন ঐ কর্ম্মকে ক্রিয়মাণ বলা যায়।

সুতরাং কর্ম্ম ত্রিবিধ,—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ। এই জন্মে প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ কর্ম্মই ভোগ হইবে। ভোগ করিবার সময় সাবধান না হইলে আবার কর্ম্ম নূতন সঞ্চিত হইতে থাকে। দেহ না থাকিলে প্রারব্ধ ভোগের উপায় নাই। তাই জীব দেহ ধারণ করে। সকলেরই প্রারব্ধ ভোগ হয় সত্য; কিন্তু যে প্রারব্ধ ভোগের কৌশল জানে না, তাহার বহু নূতন কর্ম্ম সঞ্চিত হইতে থাকে। এই সমস্ত নূতন কর্ম্ম ভোগ জন্য আবার তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হইবে, আবার সুখদুঃখ ভোগ করিতে হইবে। জীব যতদিন অজ্ঞান থাকে ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে পুনঃ পুনঃ দেহ ধারণ করিতে হয়, পুনঃপুনঃ দেহত্যাগের যাতনা ভোগ করিতে হয়। দেহত্যাগ বা মৃত্যুর যাতনা অতি উগ্র। তাহা পূর্ব্বেই অবগত করান গিয়াছে।

ধরা যাউক একটী ব্রাহ্মণের দেহ। প্রারব্ধ ভোগের কৌশল

তিনিই জানেন—যিনি আপনার স্বধর্ম্ম জানেন। যথার্থ ব্রাহ্মণ যিনি, তিনি জানেন—ঈশ্বর দর্শনই জীবনের উদ্দেশ্য। ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভই জীবনের প্রকৃত কার্য্য। ক্লেশকর তপস্যাই তাহার সোপান,—

"ব্রাহ্মণস্য তু দেহোঽয়ং ন কামার্থায় জায়তে।
ইহ ক্লেশায় তপসে প্রেত্য ত্বনুপমং সুখম্॥"

কামোপভোগের জন্য ব্রাহ্মণ-দেহ জন্মে না। ইহা ক্লেশভোগের জন্য—ইহা তপস্যার জন্য। তপস্যা কর, অনুপম সুখ লাভ হইবে।

প্রারব্ধ ভোগ করিতে হইলে আপনার আপনার তপস্যা লইয়া থাকা চাই। কর্ম্মের দ্বারাই কর্ম্মের সঞ্চয় এবং খণ্ডন হইয়া থাকে। এই স্থানে তীক্ষ্ণ প্রারব্ধের একটী উপদেশ শুন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

-০:*:০-

ধর্ম্মবন্ধু ও পাপবন্ধু।

কোন গ্রামে দুটী বন্ধুতে বাস করিতেন। বাল্যকাল হইতে উভয়ের অভেদ্য প্রণয়। কিন্তু বর্ত্তমানে উভয়ের কার্য্য ও মনের গতি বিভিন্ন, এক জন সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ, দেব-আরাধনা, শাস্ত্রপাঠ, জীবে দয়া ও দান ইত্যাদি পুণ্যকার্য্য করিয়া জীবন কাটাইতেন। তাঁহাকে ধর্ম্মবন্ধু বলিব। অপরটী যত কিছু কুৎসিত কার্য্যে—সর্ব্বপ্রকার পাপকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। বেশ্যালয় গমন, মদ্য পান, বেশ্যান্ন আহার, অকারণ মনুষ্যমনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি কার্য্যেই যৌবনকাল অতিবাহিত করিয়া প্রৌঢ়াবস্থায় পৌঁছিলেন। একদিন দুই বন্ধুতে একস্থানে বসিয়া কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ধর্ম্মবন্ধু বলিলেন "বন্ধো! জীবনের প্রায় অধিকাংশ সময়ই ত পাপকার্য্যে কাটিল, সামান্য সময় মাত্র এ মানবদেহ ছাড়িতে বাকি, বল দেখি কি লাভ করিলে? আর প্রকৃত সুখ কি কিছু পাইলে? অতএব আজ তোমাকে আমাদের আশ্রমে যাইতে হইবে। তথায় দ্বাদশ জন সাধুর সমাবেশ হইবে, তন্মধ্যে আমার গুরুদেব থাকিবেন। তাহা ছাড়া আমার গুরুর গুরু (পরমগুরু) এবং তাঁহার বন্ধু—তাঁহারা দুই জনও নাকি আজ উপস্থিত থাকিবেন। এরূপ সাধুসমাবেশ তোমার আমার এ জীবনে আর হইবে কিনা সন্দেহ। শুনিয়াছি মহাপুরুষ দর্শনে সর্ব্বপাপ হরণ হয়, সর্ব্ববন্ধন মোচন হয়। ভাই! তুমি আমার

প্রাণের বন্ধু, তাই তোমাকে বড় ভালবাসি। এইজন্য আমার নিতান্ত ইচ্ছা আজ তোমার এই সাধুদর্শনটী ঘটিয়া যায়। ' ভাই! কি বল, ইচ্ছা হয় কি ?"

পাপবন্ধু ঈষৎ হাসিয়া বলিল "বন্ধু! তোমাতে আমাতে এরূপ বন্ধুতা যে কেন, তাহার কারণ কিছুই আমি ভাবিয়া পাই না। তোমার আমার কর্ম্ম বিভিন্ন, মনের গতি বিভিন্ন, তথাচ তোমায় না দেখিলে আমি থাকিতে পারি না। আমায় না দেখিলে তুমি থাকিতে পার না। ভাই, তোমায় আমায় এককর্ম্মা, একপথগামী হইলে আমরা আরও যে কত সুখী হইতাম, তাহা অনুভব করিতে অক্ষম। কিন্তু ভাই, এত দিন পর্য্যন্ত ত ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিয়া কাটাইলে, কঠোরতাই করিলে, বিলাসিতা বা সুখের মুখ দেখিলে না। তাই বলি, আজ আমা'র আড্ডায় লখ্নৌ হইতে জনৈক তোফা বাইজী আসিয়াছে, তাহার সহিত দুটী সুরসিকা যুবতী আসিয়াছে। আর সুগন্ধযুক্ত মদ্য আনাইয়াছি। আজ বড়ই আনন্দ হইবে। একবার তুমি আমার সহিত তথায় গিয়া দেখিয়া শুনিয়া এবং ভোগ করিয়া সুখী হও। ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

পাপবন্ধুর বাক্য শুনিয়া, ধর্ম্মবন্ধু মর্ম্মান্তিক দুঃখ পাইয়া বলিলেন "পুনঃ ও সকল কথা আমায় বলিও না। আমাকে মাপ কর। তোমাকে যে সাধুদর্শন করিতে বলিয়াছি, সে আমার অপরাধ হইয়াছে। অতএব তুমি তোমার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য কর।"

এইরূপ কথাবার্ত্তার পর উভয় বন্ধু নিজ নিজ বাটীতে উপস্থিত হইয়া আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিলেন। কিছু সময় পরে পার্শ্বের ঘরে ঘড়ীতে ঢং ঢং করিয়া ৪টা বাজিয়া গেল। ঘড়ীর বাদ্যে পাপবন্ধু

বিচলিত হইয়া উঠিয়া মনে মনে ভাবিতে লাগিল – বন্ধু আমার, ৪টার পর তাঁহার গুরুদেবের আশ্রমে যাইবেন, তথায় সাধুসঙ্গ করিবেন, সেরূপ সাধুদর্শন আর এজীবনে হইবে কিনা সন্দেহ, বলিয়াছেন। অতএব আজ সে সুযোগ আমি ছাড়িব না। আমি এখনই বন্ধুর বাটী গিয়া বন্ধুর সঙ্গে সেই আশ্রমে যাইব। পাপবন্ধুর মানসিক ভাব হঠাৎ পরিবর্ত্তন হওয়ায় তৎক্ষণাৎ বস্ত্রাদি লইয়া বন্ধুর সন্ধানে চলিল। কিয়ৎকাল পরেই বন্ধুর বাটীতে গিয়া উপস্থিত। উভয় বন্ধুতে দর্শন হইল। ধর্ম্মবন্ধু সদানন্দ। পাপবন্ধুকে দর্শন করিয়াই হাসিয়া বলিলেন, ' কি বন্ধু অসময়ে কি মনে করিয়া ?"

পাপবন্ধুও উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল, "ভাই, আমার বাইজী সাজসজ্জা করিয়া বসিয়া আছে, তাই তোমাকে নিতে এসেছি।"

ধর্ম্মবন্ধু একটু বিরক্ত হইয়া বলিলেন "ভাই, আর বিরক্ত করিও না ; সকল সময় রহস্য ভাল লাগে না। আমার পথ ছাড়, আশ্রমে যাইতে আমার বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। আমি আর দাঁড়াতে পারি-তেছি না।" তখন পাপবন্ধু হাস্য করিয়া বলিল, "না ভাই, তোমাকে বিরক্ত করিতে আসি নাই, আমিও তোমার সঙ্গে তোমার গুরুদেবের আশ্রমে সাধুদর্শনে যাইব। তুমি চলিয়া আসিলেই প্রাণের ভিতর কেমন একটা সাধুদর্শন-আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইল। তাই শীঘ্র শীঘ্র তোমার নিকট ছুটিয়া আসিলাম।"

তখন উভয় বন্ধুতেই সহাস্যবদনে রওনা হইলেন। কিছু দূর যাইতে যাইতে আশ্রমের অতি নিকটেই উপস্থিত হইয়াছেন, আশ্রম হইতে সাধুগণ উহাদিগের আগমন দেখিতে পাইতেছেন, এমন স্থানে পথিমধ্যে একটী কাষ্ঠখণ্ডে একটী লৌহশলাকা পোতা

ছিল, যাইতে যাইতে দৈবাৎ ধর্ম্মবন্ধুর পদে বিদ্ধ হইয়া একেবারে এ ফোড় ও ফোড় হইয়া গেল যুবক "বাপরে।" বলিয়া একবার চীৎকার করিয়াই মুর্চ্ছিত ও অচেতন হইয়া পড়িলেন।

তখন পাপবন্ধু উপায়ান্তর না দেখিয়া তাড়াতাড়ি বন্ধুকে বাহু-প্রসারণ পূর্ব্বক কোলে তুলিয়া লইলেন এবং পতিত বন্ধুকে তুলিবামাত্রেই সেই স্থানে একখানি অতি চাকচিক্যময় হীরক-খণ্ড কুড়াইয়া পাইলেন। ঐ হীরকখণ্ডের মূল্য পঞ্চসহস্র মুদ্রা হইবে। তখন হীরাখানি পকেটে রাখিয়া বন্ধুকে কোলে লইয়া ২০।২৫ হস্ত গমন করিয়াই আশ্রমে উঠিলেন এবং ধর্ম্ম বন্ধুকে তাঁহার গুরুদেবের পদমূলে রাখিলেন। বন্ধু তখনও অচৈতন্য।

এদিকে গুরুদেব হঠাৎ প্রিয় শিষ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলেন, কাষ্ঠখণ্ডখানি তখনও পদে ঝুলিতেছে। তিনি ক্ষিপ্র হস্তে তাহা টানিয়া লৌহ-শলাকা সমেত বাহির করিলেন। অবিশ্রান্ত রক্ত বিনির্গত হইতে লাগিল, তখন তাড়াতাড়ি কি একটী বৃক্ষের পত্র আনিয়া জল দ্বারা বাটিয়া ক্ষত স্থানে বন্ধন করিয়া দিলেন।

এদিকে উচ্চ আসনে বসিয়া আগন্তুক গুরু ও তাঁহার সহকারী সাধু, উভয়ে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া হাস্য করিতেছিলেন, এমন সময় ধর্ম্মবন্ধু কিঞ্চিৎ চৈতন্য পাইয়া বলিলেন "গুরুদেব! বড় পিপাসা।" শ্রবণ মাত্র তাঁহার কমণ্ডলুতে যে জল ছিল, তাহাই পান করাইলেন। তখন ধর্ম্মবন্ধু উঠিয়া বসিলেন।

ধর্ম্মবন্ধুর গুরু স্বীয় গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গুরুদেব, এই ঘটনাটী দেখিয়া কিছু মাত্র দুঃখ প্রকাশ না করিয়া আপনারা উভয়ে হাসিতেছিলেন? কেন হাসিতেছিলেন, দয়া করিয়া

তাহার কারণ বুঝাইয়া বলুন। আমি নিতান্ত কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ইহার মধ্যে কি গূঢ় রহস্য নিহিত আছে জানিবার জন্য একান্ত উৎসুক হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি, অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

তখন ঐ উচ্চ আসনোপবিষ্ট গুরুদেব বলিতে লাগিলেন "না, বৎস! আমাদের হাসিবার অন্য কারণ নাই, তোমার এই সাধু শিষ্যটীর ও তাহার বন্ধুর কর্ম্মজনিত ফল সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দর্শন করিয়া হাসি পাইল, তাই হাসিলাম।

ইহারা উভয়েই বিপরীত মার্গগামী, বিভিন্নকর্ম্মী; কিন্তু ফলভোগ একই রূপে একই স্থানে। তাহাই মনে উদিত হওয়ায় বিশ্বনিয়ন্তার বিশ্বকৌশলের পরিচালনা-ব্যাপার দর্শন করিয়া বড় আনন্দ হইল।

দেখ, আজ তোমার এই শিষ্যটী—যাহাকে ধর্ম্ম-বন্ধু বলিতেছ; উহার ঐ মুহূর্ত্তে লৌহ-শেলাঘাতে মৃত্যুযোগ ছিল। কিন্তু এই ব্যক্তি সদ্‌গুরুলাভে সৎকর্ম্মের বশবর্ত্তী থাকায় উহার জীবনের এত দিনে তাহা ক্ষয়িত হইয়া—সেই মৃত্যুদণ্ডও সৎকর্ম্মজনিত পুণ্যের তীব্র ঘর্ষণে সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত ও সামান্য লৌহশলাকাকারে পরিণত হইয়া যথাসময়ে বিদ্ধ হইল, কিন্তু মৃত্যু হইল না। এই ব্যক্তি আরো কিছু সময় পাইলে এই শলাকাটীকে সামান্য একটী সূচীরূপে পরিণত করিতে পারিত।

আর উহার সঙ্গী পাপবন্ধুটীরও এই সময় একটী বিশাল রাজত্ব-প্রাপ্তি-যোগ ছিল। কিন্তু আজীবন পাপকার্য্য করিতে করিতে এত কালে তাহা ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া ক্রমশঃ পাঁচ সহস্র টাকা মূল্যের একখানি হীরকখণ্ডরূপে পরিণত হইয়াছে।"

পাপবন্ধু তখন পকেটে হাত দিয়া শিহরিয়া উঠিল। সাধু বলি-

লেন, "না, উহা তোমার বাহির করিতে হইবে না।" সে কিন্তু সেই হীরকখণ্ড বাহির করিয়া সকলের সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সাধুর পদপ্রান্তে পতিত হইল।

তখন সাধু বলিলেন, "এ সকল অলৌকিক ব্যাপার বড় আশ্চর্য্য। জ্যোতিষশাস্ত্রবিদেরা গণনা দ্বারা স্থির করেন, যোগিগণ তত্ত্বজ্ঞানে অবগত হইয়া থাকেন। বহু সুকৃতি-ফলে যোগপথ অবলম্বন ভিন্ন জ্ঞানচক্ষু লাভ হয় না। তাহা লাভ করিতে না পারিলে এরূপ দর্শন বা জ্ঞান হয় না। ইহার তাৎপর্য্য—কর্ম্মে কর্ম্ম ক্ষয় করে।"

এই বলিয়া সাধু যুবা গমনোদ্যত হইলেন। আমি গমনে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "ভাই, তোমার বয়স ত অতি অল্পই দেখিতেছি। তুমি এত অল্প বয়সে এত সারতত্ত্বজ্ঞান কিরূপে উপার্জ্জন করিলে?"

যুবা। সাধুসঙ্গই প্রধান সোপান, তৎপরে যোগপথ অবলম্বন করিলে এক জন্মে ফল না ফলিলেও পর জন্মে প্রথম হইতেই সংস্কার-বশবর্ত্তী হওয়ায় অতি বালককেও মহাজ্ঞানী দেখা যায়। সে সকল দৃষ্টান্ত আর হিন্দু হইয়া হিন্দুকে কত দিব? ধ্রুব, প্রহ্লাদ, জড়-ভরত প্রভৃতি মহাপুরুষগণের জীবনী আলোচনা করিলেই উত্তম প্রতীতি হইবে।

আমি। ভাই, 'যোগ' 'যোগ' ত কেবল পুস্তকেই পড়ি—আর লোকের মুখেই শুনি; কিন্তু ইহার সার মর্ম্ম ত কিছুই এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম না।

যুবা। মুখে শুনিয়া, পুস্তক পাঠ করিয়া ইহার আস্বাদ পাওয়া যায় না। সে কেবল বানরের ঝুনা নারিকেল খাওয়ার ন্যায় হইবে। ইহা সাধনসাপেক্ষ, ও সদ্‌গুরুর দয়ায় লভ্য।

আমি। এতে কিছু সার মর্ম্ম বুঝিলাম না। কিরূপ মনুষ্য যোগ-সাধনোপযোগী?

যুবা। ভাই, আমার আর বিলম্ব করিবার অবসর নাই। এখনই যাইতে হইবে। কেবল মাত্র তোমার ঔৎসুক্য দেখিয়া এবং মহাপুরুষের বাক্য রক্ষার্থে তোমাকে আরও কয়েকটী সার কথা বলা বলিয়া যাই। সময়ে উপকার হইলেও হইতে পারে।

যোগশাস্ত্রটা কি, যোগের কার্য্য কিরূপ এবং করিলেই বা কি হয়? কেই বা করিতে পারে, এই প্রশ্নের মীমাংসা বিশেষ গুরুগম্য বিষয়। ইহা বুঝানও সময়সাপেক্ষ। তবে সংক্ষেপে এইটী ধারণা রাখ যে, যোগ সাধনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা প্রভৃতি সদ্‌গুরুর উপদেশানুসারে শিক্ষা করিতে হয়। এই জন্যই সাধারণের হস্তে পড়িলে ব্যভিচারের সম্ভাবনায় ব্রাহ্মণেরা যোগশাস্ত্র অতি গোপনে রাখিতেন। এই শাস্ত্র, গুরু শিষ্যকে বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দিবেন। কদাচ অভক্ত ও তামসিককে দিবেন না।

দেবাদিদেব মহাদেব এইরূপ অনুজ্ঞা করিয়াছেন,—

> "ন দাতব্যং ন দাতব্যং ন দাতব্যং কদাচন।
> দেয়ং শান্তায় শিষ্যায় বিষ্ণুভক্তিরতায় চ॥"

ভগবান্‌ও বলিয়াছেন—

> "ইদন্তু নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
> ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি॥"

আমি। দিলে কি হইবে?

যুবা। কাঁচা মৃৎপাত্রে কাঁচা দুগ্ধ রাখার ন্যায়।

আমি। তবে এ সাধনাটা ব্রাহ্মণদেরই একচেটে বুঝাইতেছে?

যুবা। কথাটা একরূপ তাহাই সত্য। তবে এ কালের কথা ছাড়িয়া দাও। যে যাহা বুঝে, তাহাই করে। নিয়মপ্রণালীর বা শাস্ত্রবাক্যের বশবর্ত্তী হয় না। সকলেই মানুষ- এই ধারণায় বর্ত্তমান-কালে নব্য সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ, যে জাতিই হউন না কেন, যদি বি, এ, এম্, এ,পাস করিলেন, এবং দুই একখানি গীতা উপনিষদ্ পড়িলেন, তবে আর তাঁহাকে পায় কে? তখন তিনি বর্ণধর্ম্ম ত মানেনই না, অধিকন্তু শিষ্য হইতে আদৌ স্বীকৃত নহেন, একেবারে গুরু হইয়া বসেন। যজ্ঞসূত্রধারী ব্রাহ্মণদিগকেও প্রণাম করিতে কুণ্ঠিত হন এবং এই অহঙ্কার করেন যে, আমিই অধিকারী, জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও যোগী। তবে সাদা কথায় তুমি যেমন বুঝিতেছ, ঠিক তাহা নহে। যোগ একপ্রকার নহে। ভিন্ন ভিন্ন অধিকারিভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে। ব্রহ্মবিদ্যা কেবল শুদ্ধ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে। একটী অপকর্ম্মকারী হীনজাতীয় মনুষ্যও মনুষ্য, এবং ধর্ম্মাবতার পৃথ্বীপতি রাজাও মনুষ্য। টাকা বলিলেই হয় না। একটী মেকী টাকাও টাকা, আর এককোটী অকৃত্রিম টাকাও টাকা। একজন চণ্ডাল ও একজন ব্রাহ্মণের প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখিলেই মনুষ্যের বিভিন্ন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। কর্ম্মানুসারেই প্রাপ্তির অধিকারী হইয়া থাকে। যোগাভ্যাস আধুনিক পাণ্ডিত্য লাভের ন্যায় সহজ নহে। ইহাতে বর্ণবিচার চাই, অধিকারভেদ চাই, সদ্গুরু-লাভ চাই। শুধু তাহাতেও হইবে না। সেবা দ্বারা গুরুকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার দয়া পাইলে তবে যদি কিঞ্চিৎ লাভ হয়।

এখন বর্ণধর্ম্ম বিলুপ্তপ্রায় বলিয়াই উপযুক্ত শিষ্য ও গুরু প্রায়ই

দুর্লভ হইয়াছে। ব্রাহ্মণের প্রতি সাধারণের তেমন ভক্তি নাই। ব্রাহ্মণও উদরের জন্য অবশ্য-অবলম্বনীয় দুর্লভ যোগশাস্ত্রের আশ্রয় না লইয়া কাচ লোভে কাঞ্চন-পরিত্যাগের ন্যায় অর্থলোভে পরমার্থ ত্যাগ করিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তির অনুষ্ঠান করিতেছেন। কেহ স্বর্ণবিক্রয়ী, কেহ চর্ম্মপাদুকা-বিক্রয়ী, কেহ অন্নবিক্রয়ী হইয়া বসিয়াছেন। হীন জাতির দাসত্ব করিয়া, কেহ কেহ কুসীদজীবী হইয়া ছদ্মবেশে দিন কাটাইতেছেন *। ঘোর কলির এখন প্রবল রাজত্ব। সাচ্চা ঝুটার সমান দর। প্রকৃত জ্ঞানার্জ্জনের সোপানস্বরূপ মহারত্ন যোগশাস্ত্র কেন, সকল শাস্ত্রই প্রায় লোপে পাইতে বসিয়াছে। কারণ ব্রাহ্মণগণ ক্রমশঃই পতিত। নাবিকবিহীন নৌকার ন্যায় ব্রাহ্মণ্য-শক্তি মলিন, ব্রাহ্মণগণও ঘূর্ণিত হইতেছেন। কালমাহাত্ম্যে গো ও ব্রাহ্মণের পতন দাঁড়াইয়াছে। এই অবসরে কলির কার্য্য তীব্র ভাবেই চলিবে, তাই পাশ্চাত্যবিকৃতশিক্ষাভিমানী ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ আচার্য্যপদবাচ্য হইবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। কিন্তু একদণ্ডী যজ্ঞ-সূত্র আবার তাঁহাদের এই ইচ্ছার বিরোধী হইল। কেহ কেহ সদ্বংশের প্রকৃতিগত আকর্ষণে পিতা পিতামহের পথ স্মরণ করিয়া এই স্থানেই ক্ষান্ত হইলেন, কেহ কেহ চতুরতা অবলম্বনপূর্ব্বক ভাবিলেন "বামুন বেটারা ত আর যজ্ঞ-সূত্র লইয়া মাতৃগর্ভ হইতে

---

* "স্বর্গান্নিরাকৃতাঃ সর্ব্বে তেন দেবগণা ভুবি।
বিচরন্তি যথা মর্ত্ত্যা মহিষেণ দুরাত্মনা॥"

যখন মহিষাসুর বলবান্ হইয়া উঠিল, তখন দেবগণ স্বর্গ ছাড়িয়া ছদ্মবেশে নানা স্থানে নানা কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। সে দিন গিয়াছে, এ দিনও থাকিবে না, "ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" শ্রীভগবানের এই বাণী কখনই বিফল হইবে না। দৈববাণী শীঘ্রই প্রচার হইবে।

ভূমিষ্ঠ হয় নাই। এই খানেই উহাদের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে। আমরাও তাহাই করিয়া লই। তখন কোন কোন অর্থলোভী ভেক-ধারী ব্রাহ্মণ ঘরের বিভীষণ হইয়া তাহাদের সহায়তা করেন, আর তাহারাও পৈতাধারী হইয়া যায়। এইরূপে আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ভুক্ত দ্বিজাতি ভিন্ন ব্যক্তিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও গলদেশে এখন ব্রাহ্মণের ন্যায় সূত্র শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত অহং-মদ-মত্ত ব্যক্তিগণ শাস্ত্রবাক্য কিংবা পূর্ব্বপুরুষাচরিত সনাতন পন্থার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া যদৃচ্ছা ব্যবহার করেন এবং তেঁতুল বৃক্ষে আম্রফল—কুক্কুটের মুখে রাম নামের আশা করেন। ব্রাহ্মণ্য কি সামান্য ক্রীড়ার দ্রব্য? কর্ম্মফলে অশীতিলক্ষ যোনি ভ্রমণে সাধনোচিত দুর্লভ মনুষ্যজন্ম। তৎপরে, আরও চতুর্লক্ষ যোনি ভ্রমণের পর হীন ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, নিষ্ঠা, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহের অনুষ্ঠানে যখন মানুষ গুরু ও শ্রীভগবানের অবলম্বনে নিষ্কিঞ্চন হন, তখনই তিনি ব্রাহ্মণ্যের অধিকারী হন। বৃক্ষের ফল পাড়িবার ন্যায় ব্রহ্মবিদ্যা অত সহজসাধ্য নহে।

আমি যুবকের সুন্দর, সরল ও তেজঃপূর্ণ কথাগুলি শুনিতে-ছিলাম, সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে কি সকল ব্রাহ্মণেও যোগ শিক্ষার অধিকারী নহেন?"

যুবক দৃঢ়স্বরে বলিলেন "নিশ্চয়ই না। তবে ঠাকুরঘরে প্রবেশের অধিকার পাইয়াছে বটে। তুমি প্রাচীন আদর্শের প্রতি দৃষ্টি কর।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—*—

সাধনা-দৃষ্টান্ত।

দেখ, মহাতপা ক্ষত্রিয়পুত্র বিশ্বামিত্র সাধনার দ্বারা মহর্ষিত্ব প্রাপ্ত হইয়াও একবিন্দু আত্মম্ভরিতা থাকা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ-পদবাচ্য হইতে পারেন নাই। অভিমানশূন্য হইয়া যখনই তিনি বিনয়ী হইলেন, তৎক্ষণাৎ সেই চিরশান্ত একমাত্র ব্রহ্মণ্যদেব-অবলম্বী বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে "ব্রহ্মর্ষি" বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন। দুইটী ঠিক একরূপ মূর্ত্তির একটী অগুরুগন্ধস্রাবী ও অন্যটী গন্ধ-হীন। কারণানুসন্ধানে জানা গেল, একটী মূর্ত্তি চন্দনকাষ্ঠ-নির্ম্মিত, অপরটী তেঁতুল কাঠের। এ যে মূল প্রকৃতি বা বীজগত পার্থক্য, তাহার আর সন্দেহ কি ?

"পতিতোঽপি দ্বিজঃ পূজ্যঃ, ন চ শূদ্রো জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥"

ব্রাহ্মণ পতিত হইলেও জিতেন্দ্রিয় শূদ্র হইতে পূজ্য। কারণ, সে আর কিছু না করুক, কতকগুলি সদাচার অনুষ্ঠান সে অবশ্য করিতে বাধ্য। তাই বলি "অগ্রসর হও, অগ্রসর হও"—"আগাড়ি আউর কুছ হায়।" পথের খবর আমার ন্যায় অনেকের নিকটেই পাইবে। পৌঁছান সংবাদ—নিজে না পৌঁছিলে বুঝিবার কোন উপায় নাই। যে কখনও অমৃত ফল খায় নাই, সে কি অন্যের মুখে শুনিয়া স্বাদ অনুভব করিতে পারে ?"

"যোগের প্রত্যক্ষ ফল স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবন লাভ এবং পরিণাম-

ফল মোক্ষ। এ পথে গমনকারী মনুষ্যের কৃতকর্ম্ম কথনই বিফল হয় না। গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন,—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে॥"

ফলতঃ যোগসিদ্ধির প্রাক্কালে যোগভ্রষ্ট হইয়া মৃত্যু হইলেও, পরকালে স্বর্গভোগ করিয়া বৈরাগ্যবান্ হইয়া ইহলোকে আসিয়া ধনী বা সম্রাট্‌গৃহে জন্ম গ্রহণ করে। যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ শ্রীমানের গৃহেই জন্ম গ্রহণ করেন। এখনও পর্ব্বতগুহায় কত কালের কত যোগী সুস্থ শরীরে প্রশান্তচিত্তে পরমানন্দে ঈশ্বরারাধনা করিতে-ছেন, কয় জন তাঁহাদের সংবাদ রাখে বা বিশ্বাস করে? আমরা যে শ্রেণীর ছাত্র, আমাদের সেই শ্রেণীর বালকের সঙ্গেই আলাপ পরিচয়। তৃতীয় শ্রেণীর একটী ছাত্র কি বি, এ, কিংবা এম্, এ শ্রেণীর ছাত্রের কোন পাঠ্য পুস্তক দেখিয়া বুঝিতে পারে তাহাতে কত মধুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় আছে?

এই ভবসংসারে যে যেমন অধিকারী, সে তেমনি সঙ্গই লাভ করিয়া থাকে। যে যেমন অধিকারী, সে তেমন সহকারী পাই-লেই তৃপ্তি লাভ করিবে। বিষয়ীর নিকট যাও, বিষয়ের কথা; উকীলবাড়ী যাও, মোকদ্দমার কথা; চিকিৎসকের বাড়ী যাও, নানা বিধ রোগের ও ঔষধের কথা, ব্যবসায়ীর নিকট যাও, লাভ লোক-সানের কথা; ধনীর নিকট যাও, ধনবৃদ্ধির পন্থা ও টাকার সুদের কথাই শুনিবে। এইরূপই সর্ব্বত্র।

আবার সাধুর নিকট যাও, সৎকথা সংপ্রসঙ্গই শুনিতে পাইবে। তোমার কর্ম্মবীজ ভাল থাকিলে শুনিতে শুনিতে তত্ত্বদর্শী হইবার লালসা জন্মিবে। লালসা হইতে আকাঙ্ক্ষা, তখন প্রকৃত তীব্র

আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে সময়ে আশা মিটিলেও মিটিতে পারে। তাই প্রবাদ—"যার যেমন ভাব, তার তেমন লাভ।"

কিনিবার দরকার নাই, মেছোহাটায় শুট্‌কী ও পচা মাছের দোকানে কিংবা চামড়ার গুদামে গেলে আঁশ্‌টে ও চাম্‌সিটে গন্ধই পাইবে; আবার আতরের দোকানে গেলে, তুমি ক্রয় কর বা না কর আতর, গোলাপ, জুঁই, চামেলীর সুরভি গন্ধে প্রাণ আমোদিত হইবে। সেইরূপ দেবালয়ে গেলে ধূপ ধূনা পুষ্প-চন্দনের পবিত্র গন্ধে তোমাকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিবে। এখন তোমার রুচি অনুসারে কার্য্য কর।

আমরা যেমন, জগৎকে তেমনি দেখি। আমাদের নিকট সন্ন্যাসী. বৈষ্ণব প্রভৃতি সাধুমূর্ত্তি আসিলেই ভাবি, প্রতারক ব্যবসাদার। সকলেই কি সমান? সৎ কাজের ভেকও ভাল। কাহার ভিতর কি আছে জানিবার কুলুপটি ভগবানের নিজ হাতে। তবে তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষগণ তাঁহার অনুকম্পায় কিছু কিছু বুঝিতে ও খুলিতে পারেন। মনুষ্যহৃদয়ের ছায়া তাহার মুখেই প্রকাশ পায়। অন্ধ তাহা দর্শনে অক্ষম। চক্ষুষ্মান্ স্পষ্টই দেখিতে পান।

এ ভিন্ন জীবের হৃদয় দেখিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। কে কি ভাবে আসে যায়, কে বলিতে পারে?

এই কলেবর—কলের শ্রেষ্ঠ দেহটির কোথায় কোন্ কলটী কিরূপে কি ভাবে সন্নিবেশিত আছে, তাহা বলিতে পার কি?

কবে জন্মিবে, কবে মরিবে, জন্ম মরণের সংবাদ পর্য্যন্ত যখন আমরা রাখি না, তখন সব-জান্তা বলিয়া অহঙ্কার করি কিসে?

নির্গুণ ব্রহ্ম ভগবান্ সগুণ রূপে এক হইতে বহু হইয়া নানা কাজে নানা সাজে জগৎজীবকে সতত মঙ্গল শিক্ষা দিয়া বেড়াইতে-

ছেন। ধর, তুমি কাহারও সর্ব্বনাশ করিবার চিন্তায় মগ্ন আছ, নিপুণ ভাবে উপায় অনুসন্ধান করিতেছ; হঠাৎ কোন বৈষ্ণব-বেশধারী ভিখারী আসিয়া তোমার কর্ণমূলে খঞ্জনী বাজাইয়া গাহিল,—

হরি বল হরি বল হরি বল ভাই রে।
হরিনাম বিনা জীবের আর গতি নাই রে॥

তোমার চমক ভাঙ্গিল। হ'তে পারে "আর গতি নাই রে" কথাটীর উপর মন সংলগ্ন হইয়া তোমার সে চিন্তা তিরোহিত হইল। তুমি বিবেকবুদ্ধি প্রাপ্ত হইলে।

পল্লীগ্রামে চৌকীদার ফুকারে—জাগ, জাগ, জাগ। নিদ্রিত গৃহস্থ চেতনা পাইয়া তস্করের হস্ত হইতে নিস্তার পায়! তদ্রূপ তুমি আমিও সর্ব্বদা সংসারমায়া-নিদ্রায় নিদ্রিতের ন্যায় সাধুবেশ-ধারী চৌকীদারের গীত বা যাজ্ঞারূপ বাক্যে চৈতন্য প্রাপ্ত হই। কিন্তু বুঝি না, এটী কার প্রেরিত কোন্ দেশের চৌকীদার। তাই রামপ্রসাদ গাহিতেন,—

তারা (মা) আমার সকল পারে।
সে যে চোর ছেড়ে দেয় চুরি কোর্ত্তে,
গৃহস্তেরে দেয় সজাগ কোরে॥
পিপীলিকার পক্ষ দিয়ে উড়িয়ে দেয় পবন-ভরে।
(ওরে) উড়ে যায় সে পিপীলিকা,
পক্ষী দিয়া খাওয়ায় তারে॥
সে যে সাপ হয়ে দংশন করে,
ওঝা হয়ে ঝাড়ে তারে।

(মা আমার) আপন ভাবে আপ্‌নি খেলায়,
কেঁউ কি তাহা বুঝ্‌তে পারে ॥

ভাই! আমরা কত ভ্রমে ঘুরিতেছি। পরমুখে আপন ধর্ম্ম-কাহিনী শুনিয়া তাহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতে যাই। স্বগৃহের নিয়ম-প্রণালীর বশবর্ত্তী কি অদর্শবাক্যে বিশ্বাসী হই না। তাই বলি, মাথম চিন বা না চিন, প্রত্যহ খাইয়া যাও, শরীরে তাহার কার্য্য হইবেই হইবে।

যোগসিদ্ধি দ্বারা পূর্ণ আনন্দ ও অন্তে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ হয় অর্থাৎ পরমব্রহ্মে লীন হওয়া যায়। এ লীন হওয়া নিষ্ক্রিয়তা বুঝিবে না। স্বগুণ ব্রহ্মে নিত্য ক্রিয়া-শীলত্ব আছেই, সুতরাং তাঁহাতে মানবাত্মা লীন হইলে, নিত্য ক্রিয়াশীল হইয়াই থাকে।*

যেমন ঘটী, ঘড়া, গাড়ু বা গেলাসের জল নদীজলে মিশাইতে পারিলে এক হইয়া যায় বলিয়াই স্রোতের সহিত তাহার গতি অনিবার্য্য।

"আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি ॥"

জীবমাত্রেরই দুঃখ পরিহার পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করা অভিপ্রেত। জগতে সকলেই এই অভিপ্রায় সিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বদা ব্যাতিব্যাস্ত রহিয়াছে; কিন্তু প্রকৃত সুখ ও আনন্দ কি এবং কোন্ পথ অবলম্বনে তাহা পাওয়া যায়, তাহা অনেকেই বুঝেন না। কেহ কেহ বুঝিয়াও করেন না। তাই, তোমার উপর কৃপালু হইয়া সেই

---

* লীন হওয়া—ভবসংসারের যাতায়াত পথ রুদ্ধ করিয়া আনন্দধামে সেই আনন্দময় পিতৃদেব ও আনন্দময়ী মাতৃদেবীর চরণে আত্ম সমর্পণ পূর্ব্বক চিরদিনের জন্ম বাস। মৎপ্রচারিত যোগপন্থা বা আদি কৃষ্ণলীলা পাঠ করুন।

মহাপুরুষ তোমার পন্থা নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সেই এলোমেলো কথা কয়টীর একটীও অসার নহে।

কলিকালে অধিকাংশ মনুষ্যই মনে করেন যে ধনসম্পত্তি স্ত্রীপুত্রগণের সহিত সচ্ছলতায় বাস, দানধ্যান যাগযজ্ঞ করিলে অথবা বিদ্যাবুদ্ধি, বিষয়প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠাপন্ন হইয়া কীর্ত্তিরক্ষা করিতে পারিলেই সুখী হইব। কিন্তু এ সকল সুখের পরিণামে বিয়োগদুঃখ অবশ্যম্ভাবী, তাহা একবারও ভাবেন না। একবারও মনে করেন না যে, ভাড়াটিয়া বাটীতে বসিয়া বসিয়া এত সুখের স্বপ্ন দেখিতেছি। বাড়ীওয়ালা "নেকালো" বলিলে আর এক মুহূর্ত্ত থাকিবার উপায় নাই। অতএব বাড়ীটীর বিষয়ে সর্ব্বাগ্রে "কায়েমী বন্দোবস্ত" করা উচিত। ইহাই প্রকৃত চতুরের কার্য্য। ঐই বৈষ্ণব গ্রন্থকার সাদা কথায় বলিয়াছেন, "যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর। যাঁহারা ভুলিয়াও শেষের সে দিনের কথা মনে করেন না, ভাবিয়া দেখ দেখি ভাই, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত কি না।

কর্ম্মফলে এই দেহ ধারণ। ইহাতে নিরবচ্ছিন্ন সুখের আশা করাই অন্যায়। "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে"—আমরা ত ক্ষুদ্রজীব।

সংসারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ক্ষণিক। দান, পরোপকার, দয়া, আতুর-সেবা প্রভৃতি সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহ ঘোর অন্ধকারে আশার ক্ষীণ আলোকস্বরূপ। ইহাতেও এ ভবসংসারের বন্ধনমোচন হয় না। প্রকৃত যোগ-সাধক, পৃথিবীর সুখ দুঃখ যত মধুর বা কষ্টকরই হউক, তাহাতে মনোযোগ না করিয়া পরম পবিত্র অক্ষয়-সুখশান্তিময় যোগপথাবলম্বন পূর্ব্বক পরমানন্দজ্ঞানস্বরূপ এবং নিত্যসত্যস্বরূপ পরমব্রহ্মে লীন হন!

কোন কোন দুর্ব্বল ব্যক্তির ধারণা যে, সকলেই যদি যোগপথ অবলম্বন করিবে, তবে শুকদেব, ব্যাস, বশিষ্ট প্রভৃতি জীব-কল্যাণ-কারী মহাত্মগণ জন্মিতেন কোথা হইতে? তাঁহাদের কথার উত্তরে এই বলা যায়, যেমন কোন কুম্ভকার পোনশালায় সহস্র হাঁড়ি পোড়াইতে দেয়, তাহার ইচ্ছা থাকে যেন একটী হাঁড়িও না ভাঙ্গে; কিন্তু শেষে দেখে, অনেক ফাটিয়া ফুটিয়াও গিয়াছে। ফল কথা, সকল ঝিনুকে মুক্তা জন্মে না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু, কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥"

সহস্র লোকের মধ্যে একজন ইচ্ছুক, সহস্র ইচ্ছুকের মধ্যে একজন উদ্যোগী, সহস্র উদ্যোগীর মধ্যে একজন কর্ম্মারম্ভী, সহস্র কর্ম্মারম্ভীর মধ্যে একজন কর্ম্মী, সহস্র কর্ম্মীর মধ্যে একজন সিদ্ধ-যোগী হন। সিদ্ধাবস্থা অতি অল্প সাধকেরই হইয়া থকে!

এরূপ ব্যক্তি পথে ঘাটে আফিসে জুয়েলারি-দোকানে বা বীরভোগ কার্য্যালয়ে পাওয়া যায় না। তাই বলি অগ্রসর হও; কিছু মিলিলেও মিলিতে পারে, হতাশ হইও না।

ভাই, এখন আমি আমার কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হই। তুমিও তোমার উদ্দেশ্যপথে গমন কর।

আমি। ভাই, তুমি এখন কোথায় যাইবে?

যুবক। আমার কিছুই ঠিক নাই।

আমি। তবে আমাকে সঙ্গী কর না কেন? আমার বড় সাধ—তোমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরি, আর তোমার মধুর উপদেশ ও সুমধুর গান শুনি।

যুবক হাস্য করিয়া বলিল “নিষেধ আছে।”

আমি। কাহার নিষেধ?

যুবক। তাহা বলিব না।

আমি অগত্যা হতাশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম “সে মহাপুরুষ এখন কোথায় আছেন?”

যুবক। জানি না।

আমি। ভাই, আর কি কখনও সাক্ষাৎ হইবে না?

যুবক। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই হইবে।

আমি তখন উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে যুবকের এই নৈরাশ্যসূচক কথা শ্রবণে একান্ত বিচলিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, “ভাই, সে মহাপুরুষ কোথায় থাকেন? তোমার সহিত বিশেষ আলাপ আছে দেখিতে পাইলাম। আমাকে ওরূপ দর্শন দিয়াই মুহূর্ত্ত মধ্যে সেরূপ অদৃশ্য হইলেন কিরূপে? স্বদেশী বিদেশী অনেক যাদুকরের ক্রীড়া দেখিয়াছি; কিন্তু এরূপ অদ্ভুত অদৃশ্য হওয়া ত কখনও দৃষ্টিগোচর করি নাই।

যুবক। সে সকল বিভীষিকা যাদুবিদ্যাবলেই হয়। অনেক সাধকও ঐরূপ বুজরুকী শিখিয়াই ভ্রষ্ট হন।

আমি। তবে এ অদ্ভুত অদৃশ্য হওয়া কিরূপ?

যুবক। মহাপুরুষগণ যোগবলে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া অশরীরীর ন্যায় যথেচ্ছ গমনাগমন করিতে পারেন। এই জন্যই তাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলে।

আমি অবাক্ হইয়া যুবকের শরীরের জ্যোতিঃ দেখিতেছিলাম এবং তাঁহার কথা শুনিতেছিলাম। পরে জিজ্ঞাসা করিলাম “তিনি এখন কোথায় গমন করিয়াছেন, তুমি জান?”

যুবক। তার কিছুই জান না, এইরূপ মধ্যে মধ্যে দর্শন দিয়া কিছু কিছু উপদেশ প্রদান করিয়া চরিতার্থ করেন; তাই শুনিয়া বিভোর হইয়া থাকি। এ ছাড়া আর কোন কিছু জানি না। সঙ্গে যাইতে চাহিলে নিষেধ করেন। তাই এ ভবসংসারে কেঁদে কেঁদে ঘুরি।

হঠাৎ আমার মনটা কেমন হইল। তবে কি এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কাহারও সুখ নাই! যে যে-পথে গমন করিতেছে, সে সেই গণ্ডীর মধ্যেই আছে! চোর হউক, সাধু হউক, গৃহী হউক, ভিখারী হউক, কাহারও প্রাণের সম্পূর্ণ পিপাসা কি মিটে না? সকলেই কাঁদে। হেন চক্ষু নাই, যাহা জলে সিক্ত হয় নাই। হেন হৃদয় নাই, যাহা কোন না কোন আগুনে দগ্ধ হয় নাই। তবে ত সাধু যুবকের কথাই সত্য। আবার তাই বা বলি কি ক'রে, তবে যুবকই বা কাঁদে কেন!

আমার মাথা গুলিয়ে গেল। আর ভাবিব না, পথের খবর চাই না, এখন পৌছাবার খবরটাই খুঁজিতে অগ্রসর হই। যুবা ব'লেছেন "আগাড়ী আউর কুচ হ্যায়।"

তখন নিজ মন ঠিক করিলাম। সাধু যুবার সঙ্গ ছাড়িতে হইবে বলিয়া কিছু কষ্ট বোধ হইল। তাই পুনঃ বলিলাম "ভাই, তোমার উপদেশ বড় মধুর, তোমাকে ছাড়িতে ইচ্ছা হইতেছে না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তোমাকে বড় ভালবেসে ফেলেছি। যাহা হউক কালের স্রোতে কাহারও একভাবে একস্থানে থাকিবার শক্তি নাই। বিচ্ছেদ মিলন—অহরহ উদয়-অস্তের ন্যায় একজনের আদেশেই হইতেছে। তখন আর আমাদের চিন্তার বিষয় কি আছে। এখন শেষ প্রার্থনা তোমার মধুর কণ্ঠে আমাকে আর একটী গান শুনাইয়া যাও।

যুবক অতি আনন্দে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল, এবং আমার চক্ষের উপর স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া বলিল "ভাই, এইবার ঠিক বুঝিয়াছ। অগ্রসর হও—অগ্রসর হও" এই বলিয়াই গান ধরিল—

মন রে ভালবাস তাঁরে।
যে জন ভবসিন্ধুপারে তারে॥
এই কর ধার্য্য, কি বা কার্য্য, আমার পশারে;
ধনে জনে আশা বৃথা,
তুমি ছিলে কোথা এলে কোথা,
যাবে কোথাকারে।
সংসার কেবল কাঁচ, কুহকে নাচায় নাচ,
মায়ারিনী-কোলে আছ প'ড়ে কারাগারে॥

আহা! যুবকের কি অপূর্ব্ব সুললিত স্বরমাধুরী! শুনিয়া মোহিত হইলাম। এক মনে চক্ষু বুজিয়া গানটী শুনিতেছিলাম, আর যুবকের বিষয় চিন্তা করিতেছিলাম। গান সমাপ্ত হইলে চক্ষু মেলিলাম। যুবককে আর দেখিতে পাইলাম না। সন্দেহ হইল, চক্ষু রগড়াইয়া ফের চাহিলাম, যুবক নাই। বড়ই সন্দেহ ও কৌতূহল হইল। ভাবিলাম, 'যেমন ফকির তেমনি চেলা, আমার শুধুই গেল বেলা।' তখন ঘাটের এধারে ওধারে যে মন্দির কয়েকটী আছে, তন্মধ্যে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিলাম। কোথাও দেখা পাইলাম না। অগত্যা ঘাট হইতে উঠিয়া আসিলাম। বিশ্বনাথের মন্দির-অভিমুখে আসিতে আসিতে বড় রাস্তা হইতে বাম পার্শ্বে যে ছোট একটী গলি অল্পদূর গিয়াই কেদারঘাট অভিমুখে যাইবার সরু গলিতে সংলগ্ন হইয়াছে, সেই ক্ষুদ্র গলিটীর বাম পার্শ্বে একটী

ভয়ঙ্করী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা আছেন। পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই হয় ত সে স্থানটি দেখিয়াছেন। আমি চিন্তাকুল হৃদয়ে সেই স্থানে গিয়া দাঁড়াইলাম।

দাঁড়াইয়াই দেখিতে পাইলাম, কেদারঘাটে যাইবার গলির মধ্যে ঐ কালীমন্দিরের পার্শ্বে যে পিত্তলের ফুলের সাজি, কমণ্ডলু, পঞ্চপাত্র ইত্যাদির কয়েকখানি দোকান আছে, সেই স্থানে কয়েকটী স্ত্রীপুরুষ দাঁড়াইয়া কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে, আর জিনিষ কিনিতেছে। ঐ স্থানে নিরুদ্দেশ যুবকের ন্যায় একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। ঐ ব্যক্তি পিছন ফিরিয়া থাকায় ভাল করিয়া চিনিতে পারিলাম না। ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া গিয়া দেখি, ঐ যুবা তাহার সঙ্গিনী একটি যুবতীর অঞ্চল হইতে একটি পয়সা খুলিয়া লইয়া একটী ভিখারীকে দিল। যুবতী চমকিয়া উঠিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল, "ইস্ পরের ধনে পোদ্দারি !"

কথাটী আমার কেমন লাগিল। ভাবিলাম সর্ব্বত্রই এইরূপ। এ সে যুবক নয় দেখিয়া আর তথায় দাঁড়াইলাম না। কিন্তু ঐখানে গিয়াও একটী ভিক্ষা পাইলাম। গৃহে অগ্নি লাগিলে বায়ু তাহার অনুকূলে বহে। তদ্রূপ সকল স্থানেই যেন বিবেকবাণী শুনিতে পাইতেছি।

মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিলাম, পরের ধনে আর পোদ্দারি করিব না। পরের মুখে আর উপদেশ শুনিয়া বেড়াইব না। আজ হইতে কর্ম্মী হইব। তথা হইতে সটান বিশ্বনাথের মন্দিরে গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম বাবার আরতি হইয়া গিয়াছে। পাণ্ডারা ঘড়া ঘড়া দুগ্ধ তাঁহার মস্তকোপরি ঢালিতেছে। আহা ! সে দৃশ্য বড় মধুর ও চমৎকার। যে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে দেখিয়াছে,

সেই বুঝিয়াছে। মন্দির মধ্যে গম্ভীর আওয়াজে বেদমন্ত্রপাঠ, তৎসহ কলকলধ্বনি বড়ই শ্রুতিমধুর।

তাই আমি ভক্তিগদ্গদ বচনে যোড় হাতে বিশ্বনাথকে প্রাণের ব্যথা জানাইলাম। তৎপরে প্রণাম করিয়া চরণামৃত লইয়া মন্দির প্রদক্ষিণ করিলাম। এমত সময় দরজা বন্ধ হইয়া গেল। আমি হতাশ হৃদয়ে সাধু যুবার চিন্তা করিতে করিতে বাসায় ফিরিলাম।

রাত্রি অধিক হইয়াছে দেখিয়া কাহাকেও সাড়াশব্দ না দিয়া দুর্গেশ্বর-শিবমন্দিরেই শয়ন করিয়া রহিলাম। নিদ্রা হইল না, এপাশ ওপাশ করিয়া রাত্রি কাটাইয়া প্রভাতেই অমরনাথতীর্থাভি-মুখে যাত্রা করিলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—o*o—

অমরনাথে।

ভগবান্ দয়া করিয়া পথে দুই তিনটী সঙ্গী জুটাইয়া দিলেন। তাহাদের সহিত কথাবার্ত্তায় ক্রমে দিনের পর দিন কাটাইয়া চলিতে লাগিলাম। পথে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া, বহু পাহাড় পর্ব্বত উপত্যকা অতিক্রম করিয়া, ভগবানের সাজান বাগান দেখিয়া নয়ন মন তৃপ্তি করিতে করিতে আজ অমরনাথে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

আমার সঙ্গী দুই তিন জন ইতঃপূর্ব্বেই আপন আপন গন্তব্য স্থানে চলিয়া গিয়াছেন; অমরনাথ পাহাড়ে আমি একাকী উঠিলাম। সঙ্গে কিছু ফল ও জল ছিল, তাহাই খাইয়া ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিলাম। কথঞ্চিৎ সুস্থ হওয়ার পরে মনে চিন্তার উদয় হইল—স্বপ্নে যাহা দেখিয়াছিলাম, তাহা সত্য কি মিথ্যা। যাহা হউক এখানে একবার সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। বহু পর্ব্বত, উপত্যকা, গুহা ইত্যাদি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, হঠাৎ একটী স্ত্রীকণ্ঠ শুনিতে পাইলাম। স্ত্রীলোকটী যেন রোষভরে বিনয়ের সহিত কাহাকে কিছু বলিতেছে! আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। কারণ ৪।৫ দিন হইতে এই পর্ব্বতোপরি কোন মনুষ্যমূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর করি নাই, বা মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনি শ্রবণবিবরে প্রবিষ্ট হয় নাই। হঠাৎ এই তুষারময় পর্ব্বতোপরি কোথা হইতে স্ত্রীলোক আসিল? দয়াময়

তোমার খেলা তুমিই খেলাও, ক্ষুদ্র নর আমি তার কি বুঝিব! মনে এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া চলিতে লাগিলাম। অল্পদূর অগ্রসর হইয়াই দেখি, একটি গুহাদ্বারে সেই পূর্ব্বপরিচিত মহাপুরুষ এবং তৎপার্শ্বে সেই যুবক শিষ্য। কি আশ্চর্য্য। আর সম্মুখে সেই যুবতী ভৈরবী। আহা কি মধুর দৃশ্য! তাহার চক্ষে জল, মুখ রক্তবর্ণ, শরীরে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। বিনয়নম্র অথচ পুরুষবচনে সাধুপুরুষকে কি এক ভৎর্সনাসূচক বাক্য বলিতেছে। আমি অনতিদূরে একটা বৃক্ষমূলে অলক্ষ্যে বসিয়া তাঁহাদের কথোপকথন শ্রবণ করিতে লাগিলাম।

নবীনা ভৈরবী রোষকষায়িত লোচনে বলিতেছে "গুরুদেব! ভবদীয় চরণে আমি অপরাধিনী কিসে? কিসে আমি আপনার বিরাগভাজন হইলাম? আমি ত আপনার শিষ্যের ধর্ম্মহানি করিতে আসি নাই। আমি ত আপনার শিষ্যের সদনুষ্ঠানের পথে, কর্ত্তব্যের পথে, কণ্টক হইতে আসি নাই। আমি ত আপনার শিষ্যের মতি-গতির বিরুদ্ধাচরণ করিতে আসি নাই। তাহার সাধনপথের অন্তরায় হইতে আসি নাই। পাপ প্রলোভনের প্রসার করিতে আসি নাই। তবে বলিতে পারেন কি গুরুদেব! আমি আসিয়াছি কেন? এক দিন ঐ প্রেমময় হৃদয়ের উপর আমার স্বত্ব ছিল, ঐ করুণাময়ের করুণাকণার উপর আমার অধিকার ছিল, একদিন ঐ শান্তিময়ের শান্তরসাস্পদ হৃদয়োপবনের এক কোণে আমি অধিষ্ঠাত্রী ছিলাম। কিন্তু সে একদিন গিয়াছে। দিন যায় বই থাকে না, আর গিয়াছে ত সে ভালই গিয়াছে। আজ আমি সে স্বত্ব ফলাইতে আসি নাই, সে অধিকার দেখাইতে আসি নাই। তবে বলিতে পারেন কি গুরুদেব! আমি আসিয়াছি কেন?
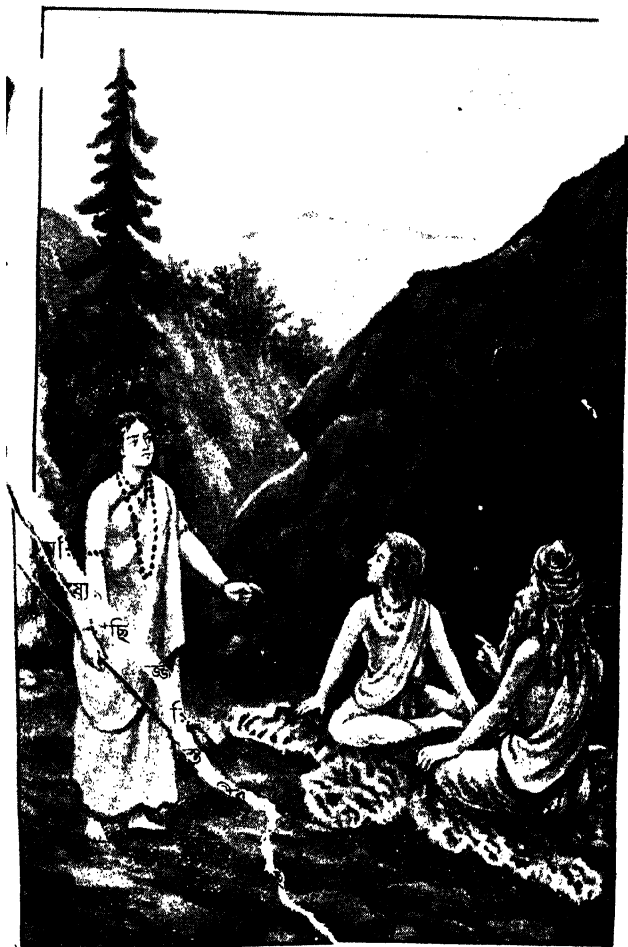
অমরনাথে সাধুর আশ্রম। সাধু পার্শ্বে নবীনা ভৈরবীর পতি দর্শন ও খেদ।

কমলা প্রেশ,—বাগবাজার, কলিকাতা।

কোথায় সুদূর কলিকাতা আর কোথায় এই হিমরাশি পরিবেষ্টিত হিমাচলে। গহ্বরস্থ অমরগঙ্গার কলকলধ্বনি-মুখরিত অমর নাথের পথে ঐ দারুণ প্রদেশ! বলিতে পারেন কি গুরুদেব! এত দূরদেশে, এত বিপদ আপদ অতিক্রম করিয়া, এখানে এ দারুণ আশ্রমে আসিয়াছি কেন? বলিতে পারেন কি গুরুদেব! এমন অজানা অচেনা দেশে দীনহীন-বেশে, কুলবধূ হইয়া অভাগিনী এমন নিরাশ্রয় অবস্থায় আসিয়াছে কেন? বলিতে পারেন কি গুরুদেব! ঐ যে সন্মুখভাগে, ঐ যে পশ্চাদ্ভাগে, ঐ ঐ যে চতুর্দ্দিকে অসীম রজতধবল তুষারমালা পরিলক্ষিত হইতেছে, উহার মধ্যেই কত কত দিন নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। ঐ যে উচ্চ কথা কহিবামাত্র, করতালি শব্দ মাত্র তুষারপর্ব্বত হইতে অপ্রতিহত গতিতে অজস্র স্রোতোধারা বহিয়া পড়ে, উহারই প্রবাহে কত দিন ভাসিয়া গিয়াছি। কত দিন মরিতে পড়িয়াছি, মরিয়াছি বলিয়াও বোধ হইয়াছে, তবুও আপনার শিষ্যের পদানুসরণ করিয়া অবিরত গতিতে ছুটিয়া ছুটিয়া এখানে আসিয়াছি কেন বলিতে পারেন? কত কত দিন পথে দারুণ জঠরানলে জর্জ্জরিত হইয়াছি; কত কত দিন দুঃসহ শীতে, অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করিয়াছি, কতদিন প্রবল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র পাপাবতার কামুক দস্যুর হস্তে অশেষ নির্য্যাতন সহ্য করিয়া অসংখ্য কৌশল যোজনা করিয়া নারীর ধর্ম্ম—একমাত্র সম্পত্তি—পবিত্র সতীত্বরত্ন যত্নে রক্ষা করিয়াছি। বলিতে পারেন কি গুরুদেব! তবুও প্রতিহত না হইয়া, শিথিলপ্রযত্ন না হইয়া, মনের বল না হারাইয়া, দুঃখের পাথারে ভাসিয়া ভাসিয়া এত কষ্টেও এখানে আসিয়াছি কেন?

আমি ধনীর কন্যা, মানীর পুত্রবধূ, রাজ্যেশ্বরের হৃদয়রাজ্যের অধীশ্বরী; তবুও উদরে অন্ন নাই, পরিধানে বস্ত্র নাই, মস্তকে

তৈল নাই, হাঁটিতে হাঁটিতে আমার অলক্তরাগরঞ্জিত কোমল পদ দ্বয় আজ কণ্টকে কণ্টকে ক্ষতবিক্ষত; তবুও গুরুদেব বলিতে পারেন কি? এমন দুরবস্থায় দুর্ব্বিপাকে পড়িয়া, এমন দুঃসহ যাতনানলে দগ্ধীভূত হইয়া, এমন মনের বলে, এমন হৃদয়ের গর্ব্বে, এই অজ্ঞাত অলক্ষিত অসংখ্য শৈলমালা-পরিবেষ্টিত প্রদেশে আসিয়াছি কেন? আমি অপহৃতধন কৃপণের মত ধনান্বেষণে আসি নাই, আমি অভিমানিনী রমণীর মত স্বত্বানুসন্ধানে আসি নাই, প্রোষিত ভর্ত্তার ত্রুটির জন্য প্রতিশোধ লইবার প্রত্যাশায় আসি নাই। তবে বলিতে পারেন কি গুরুদেব! বারংবার জিজ্ঞাসায় বিরক্ত হইয়াও একবার বলিতে পারেন কি, আমি আসিয়াছি কেন? আপনি সন্ন্যাসী, সংসারীর এ মর্ম্মকাহিনী আপনি কি জানেন? এ প্রেমের রহস্য, প্রাণের আকর্ষণ, হৃদয়ের বেদনা আপনি কি বুঝিবেন? আপনার ত এই সকল আবেগ ও আবর্ত্তের আশঙ্কায়, সংসারের এইপ্রকার বিঘ্ন বিপত্তি, পাপ তাপ, জরা মরার ভয়ে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। সংসারের গ্রন্থি কাটিয়া, ভালবাসার বন্ধন ছিঁড়িয়া, ভালবাসার বস্তুর প্রতিমাখানি পর্য্যন্ত হৃদয়ফলক হইতে একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া, জনমানবের সংস্পর্শ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিয়া আজ সাধু হইয়াছেন, যোগী হইয়াছেন, সন্ন্যাসী বলিয়া নাম ফলাইতেছেন। কিন্তু বলুন দেখি, যাহারা যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে, তাহারাই ভাল; না যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া জয়শ্রীতে বিভূষিত হইয়া শেষে বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া দেয়, তাহারাই ভাল! আপনারা তো পলায়নপর কাপুরুষ ভীরু মাত্র। এ সংসার একটী ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্র, যাহারা এ সমরাঙ্গনে বিপদাপদে ব্যাহত না হইয়া অমিত পরাক্রমে সমস্ত বিঘ্নবিপত্তির

মস্তকে পদাঘাত করিয়া সংসারি-বেশে সাহসী যোদ্ধার ন্যায় এই সংসার সমরে জয়লাভ করে, তাহারা কি আপনাদের অপেক্ষাও শক্তিশালী নহে? এবং প্রশংসার্হ নহে? আর শুধু জয়ীদিগের কথাই বা বলি কেন? অদম্য প্রকৃতির সঙ্গে এ রণরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়াও যাঁহারা অবশেষে দৈববশে পরাজিত হন, তাঁহারাও কি আপনাদের মত নিজের প্রাণের দায়ে পলায়নপর সংসারত্যাগী অপেক্ষাও উচ্চপদস্থ নহেন? আপনারা ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি সমূলে বিনষ্ট করিয়া, কলে কৌশলে ইন্দ্রিয়ের হাত একেবারে এড়াইয়া ইন্দ্রিয়োত্তেজক প্রলোভন হইতে দূরে পলায়ন করিয়া আজ ইন্দ্রিয়-জয়ী হইয়াছেন। কিন্তু পরমেশ্বর ইন্দ্রিয় দিয়াছেন কি কেবল বিলাসের জন্য? সকলেই যদি আপনাদের ন্যায় সন্ন্যাসী হইত, তাহা হইলে এ সংসার ক'দিন চলিত? বিশ্বনিয়ন্তার নিগূঢ়াভি-সন্ধিই বা কয়দিন সংসাধিত হইত? ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনের বশবর্ত্তী-হইয়া কর্ত্তব্য পালনের সময়ে ইন্দ্রিয় পরিচালন অপ্রতিহত রাখিয়া যাঁহারা ইন্দ্রিয় সংযত করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহারা কি আমাদের অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীস্থ নহেন? সংসার-কোলাহলের ভয়ে আপনারা জনপ্রাণিশূন্য নিভৃত নীরব পর্ব্বতকন্দরে আসিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতে বসেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি গুরুদেব। ঈশ্বর কি কেবল এই পর্ব্বতগুহারই অধিষ্ঠাতা? তিনিও কি আপনাদের ন্যায় কণ্টকিত সংসারবৃক্ষের ছায়ামণ্ডল পরিবর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন! আর ঐ যাহারা সংসারের বিষম কোলা-হলের মধ্যে থাকিয়া, শতকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া, সহস্রপ্রকার কঠোর কর্ত্তব্য সাধিয়াও দিনান্তে একবারমাত্র ভক্তিভরে ভগ-বানের প্রেমানন্দময় পবিত্র নামে বিভোর হইতে পারে, তাহারও

কি আপনাদের অপেক্ষা ভক্তের তালিকায় উচ্চপদস্থ নহে? পথ এড়ান বই, সাহস ভরে পথ অতিক্রম করা আপনাদের কার্য্য নহে। আপনাদের আবার গৌরব কি? আপনারা নাকি একতান মনে সর্ব্বদা কায়মনোবাক্যে জপ তপ এবং কঠোর সাধনা করেন! কিন্তু ঐ যে ভীষণ দারিদ্র্যগ্রস্ত সংসারী ব্যক্তির চারিধার ঘেরিয়া সোণার পুত্তলীর মত, আধ প্রস্ফুটিত গোলাপের মত, শুক্লাষ্টমীর শরচ্চন্দ্রের মত নাবালক শিশু সন্তানগণ ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছট্‌ফট করিতেছে, ঘোর আর্ত্তনাদে কর্ণকুহর ফাটাইতেছে, আর ঐ যে পর্ণকুটীরের আড়াল হইতে এক মলিনবেশা শতগ্রন্থি-ছিন্নবাস পরিহিতা, সৌন্দর্য্যললামভূতা অপূর্ব্ব রমণী সেই দৃশ্য দেখিয়া নিঃশব্দে অবিরল নয়নজলে ভাসিতেছে, আর ঐ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া ঘোর অঙ্গ-ভঙ্গিতে প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি মহাজনগণ দেনার জন্য বারংবার কর্কশ কণ্ঠে তাগাদা করিতেছেন, এই অপ্রকাশ্য বিষম সমস্যাপূর্ণ ভীষণ দৃশ্যের কেন্দ্রীভূত হইয়া যে ব্যক্তি অবিচলিত চিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্যের ব্যবস্থা করিতেছে,—সংযত হৃদয়ে বিপদ্‌মুক্তির উপায় উদ্ভাবন করিতেছে;—আর মধ্যে মধ্যে শরণাগত দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণা বলিয়া গাঢ়ভক্তিভরে দুর্গতিনাশিনী দুর্গার চরণে স্বীয় হৃদয়ের ব্যথা জানাইতেছে, সে ব্যক্তি কি আপনাদের অপেক্ষা কঠোর সাধনা করিতেছে না? আর ঐ যে একজন নয়নসমক্ষে স্বীয় প্রাণাধিক পুত্রকে মৃত্যুমুখে পতিত দেখিয়া কাতর হইতেছে না; আর ঐ যে একজন রমণী স্বদেশের জন্য—পরের পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য—উলঙ্গ-করবালধারী উদ্ধত দস্যুর নিহনন-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য—নিদ্রাভিভূত নবনীতবদন আপন পুত্ররত্নকে দেখাইয়া দিতেছে; ঐ যে আর এক বীরদম্পতি ধর্ম্মের জন্য—কর্ত্তব্যের জন্য প্রতিশ্রুত

রক্ষার জন্য উভয়ে মিলিয়া শাণিত তরবারি দ্বারা আপন পুত্ররত্নের মস্তক ছেদন করিয়া তাহারই মাংসে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতেছে; আর ঐ যে এক ব্যক্তি কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞা পালন জন্য সসাগরা পৃথিবীর একাধিপত্য ছাড়িয়া দিয়াছে— স্ত্রী পুত্র এমন কি নিজেকেও পর্য্যন্ত চণ্ডালের নিকট বিক্রয় করিয়া সেই অর্থে প্রতিশ্রুত ঋণ পরিশোধ করিতেছে; আর কত বলিব, কত দৃষ্টান্ত দিব; ইহারাও কি আপনাদের অপেক্ষা কঠোরতর তপঃ সাধনা করে নাই? তাই বলিতেছি, রাগ করিবেন না গুরুদেব! আপনী সন্ন্যাসী (অবলার ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন) আপনি এ রহস্য বুঝিবেন কেন? নারী হইয়া আমি যে কোন্ রত্নের প্রত্যাশায়, কোন্ বলে বলবতী হইয়া, কোন্ সাহসে সাহসিনী হইয়া এত দূরদেশে আপনাদের চরণসমীপে সমাগতা হইতে পারিয়াছি, আপনি তাহা বুঝিবেন কেন? যিনি আজ অবধূতরূপে আপনার সহযাত্রী, উহঁাকেই একদিন এই যৌবনের অর্দ্ধোন্মেষ সময়ে আমার সংসারপথের চির-সহযাত্রীরূপে পাইয়াছিলাম। যিনি দাসরূপে আজ আপনার তল্‌পি বহন করিতেছেন, গুরুদেব! দাসীত্ব করিবার জন্য সাদরে ইহঁারই চরণে শরণাগত হইয়াছিলাম। আপনার স্বামীত্বের উপলব্ধিতে যিনি আজ ভক্তিবিগলিত চিত্তে আত্মহারা হইয়াছেন, উহঁাকেই একদিন আমার দেহের, হৃদয়ের, মনের অরা যথাসর্ব্বস্বের স্বামীরূপে পাইয়া আমিও আত্মাহারা হইয়াছিলাম। আর এক দিনই বা বলি কেন? যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, যতদিন জন্মজন্মান্তর থাকিবে, যতদিন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত লীলাপ্রবহমাণ থাকিবে, ততদিন উঁনি আমার স্বামী, আমি উহঁার দাসী। এ সম্বন্ধ কখনও বিচ্যুত হইবে না। কা'ল উনি সংসারী ছিলেন তাই

উহাঁর দাসী ছিলাম, আর আজ উনি সন্ন্যাসী হইয়াছেন বলিয়া কি উহাঁর দাসী নহি? তাহা বিবেচনা করিবেন না। আপনাদের ধর্ম্মে কি বলে জানি না। সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম আজ এক রকম, কা'ল অন্য রকম হইতে পারে; আমাদের সনাতন ধর্ম্ম চিরকাল সমভাবে থাকিবে। কল্য আমি যাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলাম, আজও আমি তাঁহারই, এবং চিরকালও তাঁহারই থাকিব। এখন বুঝিলেন কি গুরুদেব! আমি আসিয়াছি কেন? আমি যাঁহার দাসী, আজ তাঁহারই দাসীত্ব করিতে আসিয়াছি। আমার ভবসংসারের প্রভু, জীবনতরণীর কর্ণধার, দেহরথের সারথি, হৃদয়মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা; তিনি বিঘোর অরণ্যানীর মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রি শিখরে পরিভ্রমণ করিয়া করিয়া, অযত্নে অনাহারে অনিদ্রায় অহর্নিশি যাপন করিবেন, কেহ তাঁহার সেবা করিবে না, কেহ তাঁহার মুখের পানে ফিরিয়া চাহিবে না, আমি দাসী হইয়া—সেবিকা হইয়া তাহা সহ্য করিব কিরূপে? আপনাদের দেহ লৌহবৎ, হৃদয় পাষাণবৎ, চিত্ত কঠোর; আপনারা আমার মনের ভাব বুঝিবেন কিরূপে? যাঁহার গাত্রে বিন্দুমাত্র ঘর্ম্ম দেখিলে তৎক্ষণাৎ অঞ্চল দ্বারা মুছাইয়া ব্যজন করিতাম, যাঁহার কোমল চরণে কুশাঙ্কুর বিদ্ধ হইলে, আমার হৃদয়ে বজ্রাঘাত হইত, যাঁহার আহার করিতে একদণ্ড বিলম্ব হইলে দারুণ যন্ত্রণা পাইতাম, যাঁহাকে অনিদ্রিত দেখিলে নিজের চক্ষে নিদ্রা আসিত না; যাঁহার প্রতিভাদীপ্ত মুখমণ্ডলে একটু মাত্র বিষাদের ছায়া পরিলক্ষিত হইলে নিজের হৃদয়তন্ত্রী বেসুরা হইয়া যাইত, আজ তাঁহারই বিষম দুরবস্থার কথা ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে বসিয়া সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিব, ও কোমল শয্যায় শয়ন করিয়া সুখে নিদ্রা যাইব কিরূপে, গুরুদেব?

সীতা, সাবিত্রী ও চিতোরবাসিনী রমণীগণ যে দেশের আদর্শ, সেই দেশের পতিব্রতা সতী নারীর কি ইহাই কর্ত্তব্য গুরুদেব!

একদিন যিনি সহধর্ম্মিনীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, আজ তাঁহারই সদনে এই অনন্ত কালের সাক্ষী মহামহিমময় হিমাদ্রির সন্মুখে সেই সহধর্ম্মিনী নামের গৌরব রক্ষা করিতে আসিয়াছি। আপনারা পথান্ধ সন্ন্যাসী। আপনারা যাহার যাহা ধর্ম্ম সে একাই সেই ধর্ম্ম সম্পাদন করেন। আমরা স্ত্রী পুরুষ একত্রিত হইয়া প্রাণে, প্রাণে, হৃদয়ে হৃদয়ে, মর্ম্মে মর্ম্মে, হাড়ে হাড়ে জড়িত হইয়া একই ধর্ম্ম, একই কর্ম্ম, একই উত্তমযত্নের সাহায্যে, একই ভাবে সুসম্পন্ন করিতে অগ্রসর হই। আমি রমণী, পতির ধর্ম্মই আমার ধর্ম্ম। পতি আজ সন্ন্যাসী, আমি কেমন করিয়া গৃহস্থালী করিব? তাই আজ আমি সন্ন্যাসী পতির পার্শ্বে সন্ন্যাসিনীরূপে দাঁড়াইতে আসিয়াছি। যাহাতে পতির ধর্ম্মোন্নতি হয়, পতির যাহাতে কর্ম্মযোগ সুলভ ও সহজ হয়, তিনি যে পথাবলম্বী হইয়াছেন, যাহাতে সেই পথে অগ্রবর্ত্তী হইতে পারেন, তাহাই আমার উদ্দেশ্য, তাহাই আমার সাধনা।

আমি পতির ধর্ম্মপথের কণ্টক হইতে আসি নাই। আমি পতির সদনুষ্ঠানের পথে প্রতিবন্ধক হইতে আসি নাই। যদি তাহাই বুঝিয়া থাকেন, গুরুদেব! তাহা হইলে আপনি পরম জ্ঞানী হইয়াও ভ্রান্ত মানবের মত অসঙ্গত ধারণায় উপনীত হইয়াছেন। আমি যদি সতী হই, পতির উপর যদি আমার ভক্তি থাকে, তাহা হইলে আমার সাহায্যে তাঁহার ধর্ম্মের পথ সুপরিস্কৃত বই কণ্টকিত হইবে না। নারীহৃদয় কোমল বটে, কিন্তু প্রয়োজন হইলে যথেষ্ট কঠিন হইতে পারে। নারী বিধবা হইলে সে যেরূপভাবে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করে, সমাবস্থায় পড়িয়া কয়জন পুরুষ তাহা রক্ষা

করিয়া থাকে, গুরুদেব! নারীহৃদয়ের অদম্য প্রকৃতির দৃষ্টান্ত কি কখনও নয়নগোচর করিয়াছেন?

আমার আসিবার আরও কারণ আছে। একদিন যাঁহার প্রেমাধিকারিণী ছিলাম, আজ তাঁহারই প্রেমভিখারিণী হইতে আসিয়াছি। একদিন যাঁহার হৃদয়ে হৃদয় ঢালিয়া দিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িতাম, যাঁহার প্রেম-সর্ব্বস্বের পূর্ণাধিকারিণী মনে করিয়া অহঙ্কারে ডগ্‌মগ হইতাম, আজ আমার সেই প্রেমের ধনকে এক নবীন প্রেমে উচ্ছ্বসিত দেখিয়া, সেই আমার আনন্দনিকেতনকে আজ সচ্চিদানন্দের পূর্ণানন্দরসে পরিপ্লুত দেখিয়া সমস্ত গর্ব্ব, সমস্ত অভিমান ভুলিয়া গিয়া, সেই প্রেমময়ের পদপ্রান্তে প্রেমভিক্ষা করিতে আসিয়াছি। আজ তাঁহার সেই প্রবহমাণ প্রেমতরঙ্গ প্রবল সাগরে পরিণত হইতে চলিয়াছে দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র সোৎসাহ সংসর্পিত হৃদয়-নির্ঝরিণীকে সেই সাগরে মিশাইতে আসিয়াছি। এই সূত্রবৎ ক্ষুদ্র স্রোতস্বতীর প্রবাহ বিপরীতগতিবিশিষ্ট বা বিরুদ্ধগামী হইলই বা, তাহাতে সাগরের কি? তাই বলিতেছিলাম গুরুদেব! আমার দ্বারা আপনার শিষ্যের ধর্ম্মহানি হইবে না।

আপনি আপনার শিষ্যের শিক্ষাগুরু, দীক্ষাগুরু, ধর্ম্মগুরু; আপনি তাঁহার সৎপথের প্রবর্ত্তক, সৎপ্রকৃতির উত্তেজক, এবং সৎগতির নিয়ামক; তাই শিষ্যের উপর আপনার স্বত্ব অনেক, প্রভুত্ব অনেক, অধিকার অনেক। আপনার ঐ শিষ্যের উপর আমারও একদিন স্বত্ব ছিল, আর ছিলই বা বলি কেন? এখনও আছে এবং চিরকাল থাকিবে। আপনার স্বত্ব এ জনমের জন্য, আর আমার স্বত্ব চিরদিনের জন্য ও জন্মজন্মান্তরের জন্য। আপনি আজ

স্বত্বাধিকারী হইয়াছেন বলিয়া আমার স্বত্বের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিবেন না। যদিও মনে করেন, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই, আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইলেই হইল। আপনার স্বত্বাধিকারে আমার মনোভিলাষ পূরণ বিষয়ে যদি কোন বাধা না পড়ে, তাহা হইলে আমার স্বত্বের উচ্ছেদ হইলেই বা কি!

একজন ধনী ব্যক্তি একটী বহুজনাকীর্ণ নগরীর মধ্যস্থলে জমি কিনিয়া পুষ্করিণী খনন করিয়াছেন, পুষ্করিণীর উপর সম্পূর্ণভাবে স্বত্ব তাঁহারই থাকে। জল কিন্তু শত সহস্র লোকে খায়। সে ব্যক্তি ঐ পুষ্করিণীর স্বত্বাধিকারী বলিয়া কি উহা হইতে কোন অবলা রমণীর জল আনয়নপক্ষে প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয়? অথবা কেহ জল খাইতে গেলে কি উক্তব্যক্তি তাঁহার স্বত্ব ফলাইতে আইসেন? কথনই নহে। সেইরূপ আজ অভাগিনী বিষম বিরহানলে জ্বলিয়া পুড়িয়া, মরম যাতনায় ধ্বসিয়া ধ্বসিয়া বড়ই শোষিত কণ্ঠে, বড়ই পিপাসিত হৃদয়ে আপনার ঐ শিষ্যরূপী প্রেমসরোবরে এক গণ্ডূষ জল পান করিতে আসিয়াছে। সরোবরের উপর স্বত্ব আপনারই থাকুক, সে স্বত্ব লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডায় আমার কোন কাজ নাই গুরুদেব! আপনার সন্মুখে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তিগদ্গদ ভাবে দণ্ডায়মানা দাসী ঐ সরোবর হইতে অঞ্জলি পুরিয়া জলপানে প্রয়াসিনী। অভাগিনীর এ কাতর প্রার্থনা কি পূর্ণ হইবে না?

আরও দেখুন গুরুদেব! কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি কোন অকূল প্রান্তর মধ্যে বহুযত্নে, বহুকষ্টে, পথিপার্শ্বে একটী অশ্বত্থবৃক্ষ রোপন করেন। সেই বৃক্ষ বড় হইয়া সূর্য্যোত্তাপে আপন দেহকে দগ্ধ করিয়াও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডতাপে তাপিত পথিককে সুশীতল ছায়া দান করে। সেই শান্তিময় ছায়াতলে উপবেশন করিয়া পথিকের ক্লান্তি

দূর হয়। কিন্তু তাই বলিয়া কি বৃক্ষরোপক পথিককে সুশীতল ছায়া উপভোগ করিতে বঞ্চিত করেন? পথিকও স্বত্ব লইয়া বিচার করিতে চাহে না; সে চাহে আশ্রয় ও ছায়া। সেইরূপ গুরুদেব! আপনি ঐ শিষ্যের হৃদয়ে উপদেশরূপ জল সেচন করিয়া যে ধর্ম্মবীজ রোপণ করিয়াছেন, তাহা হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মবৃক্ষ আজ যে শান্তির সুশীতল ছায়া প্রসারিত করিয়াছে, এ অবলা সংসার-দাবদাহে দগ্ধীভূত হইয়া সেই প্রেমপ্রবাহ-শীকর-সিক্ত শান্তিময় ছায়ার আশায় এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। বৃক্ষের স্বত্ব আপনারই থাকুক, অভাগিনীকে ছায়া লাভে বঞ্চিত করিবেন না।

গুরুদেব! এতক্ষণে বুঝিলেন কি? স্বত্ব আপনার থাকিলেও আমার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে কিরূপে? তবে উহাঁতে আমার স্বত্ব আছে কিনা, তাহার বিচার ইহলোকে করিব না। জীবনের এ কয়টা দিন সে বিচারে অনর্থক গোলমালে কাটাইব না। এদেশে তাহার সুবিচার হইবে না। রাজরাজেশ্বরের দরবারে যদি কোন দিন প্রবেশ লাভ করিতে পারি, তবে সেই খানেই ইহার সুবিচার হইবে। তবে একটী মাত্র কথা এই, আপনার ঐ যেমন একটী শিষ্য, এরূপ আরও অনেক শিষ্য আছেন; আপনি যেমন আপনার ঐ শিষ্যের গুরু, আপনার ঐ শিষ্যটীও তেমনি আমার গুরু। কিন্তু আপনাদের অন্য দেবতা আছেন, আমার ঐ ছাড়া আর কোন দেবতা নাই। আমার দেব দেবী, আমার ধন রত্ন, আমার অতীতের স্মৃতি, বর্ত্তমানের সুখ, ভবিষ্যতের আশা, সকলই উনি। আমার সংসারধর্ম্ম, জ্ঞানধর্ম্ম, আশা ভরসা, পথের সম্বল, পারের কড়ি, কণ্ঠের হার, সিঁতার সিন্দুর, সকলই উনি। আমি এতদিন ঐ সর্ব্বস্বধন হারা হইয়া পাগলিনী হইয়াছিলাম। অনেকদিনের পরে

আনন্দধাম। ঊর্দ্ধলোক হইতে সতীরাণীর তেজ বর্ষণ। নবীনা
ভৈরবীর অভিনব আশীর্ব্বাদক জ্ঞান ও ঊর্দ্ধলোকে গমন।

অনেক কষ্টে যাহা পাইয়াছি, আজ তাহা ফাঁকি দিয়া কাড়িয়া লইবেন না।

এইরূপ বলিতে বলিতে রমণী মুর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

সাধু পুরুষ ত্রস্তভাবে উঠিয়া ভৈরবীর নিকটে আসিলেন। শিষ্যকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমাদের যুবক সন্ন্যাসীর মনের ভাব যেন কিরূপ হইয়া গেল। তাহা পাঠক পাঠিকা বুঝিতে পারিতেছেন কি! এতকাল মহাপুরুষের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিয়া যাহা কিছু কঠোরতা শিক্ষা করিয়াছিলেন, ভৈরবীর বর্ত্তমান অবস্থা দর্শনে তৎসমস্তই নষ্ট হইয়া গেল। তখন তিনি মহাবিচলিত চিত্তে গুরুদেবের নিকটবর্ত্তী হইলেন। গুরুদেব বলিলেন "তোমার পত্নীর মস্তক আপন উরুদেশে স্থাপন করিয়া রাখ।" যুবক তাহাই করিল।

আমি দূর হইতে দেখিতে লাগিলাম, মুর্চ্ছিতা যুবতীর মুখে যেন মহানিদ্রার ছায়া ঘিরিয়া বসিল। দেখিতে দেখিতে বৈদ্যুতিক তেজ যেমন মানুষের জীবনীশক্তি টানিয়া লয়, তেম্নি যুবকেরও শরীর হইতে জীবনীশক্তি বাহির হইয়া গেল। বৈদ্যুতিক তেজে প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইয়া গেলে মানুষের দেহ যেরূপ ভাবে থাকে, যুবকের দেহও সেইরূপ ভাবেই বসিয়া রহিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সন্ন্যাসীও তখন পদ্মাসনে উপবিষ্ট,—তাঁহারও বাহ্যজ্ঞান মাত্র ছিল না,—হয় তিনি সমাধিস্থ, নয় মৃত। সমস্ত আশ্রম বৈদ্যুতিক জ্যোতিতে আলোকিত হইয়া উঠিল।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সেই স্থানে বসিয়া রহিলাম। কতক্ষণ অতিবাহিত হইল, তাহাও স্থির করিতে পারিলাম না। বোধ হইল, প্রহরেক পরে সন্ন্যাসীর জ্ঞান হইল, তিনি গিয়া যুবক ও

যুবতীর দেহ দুইটী নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া যখন নিশ্চয়ই মৃত বলিয়া ধারণা করিলেন, তখন পার্শ্বস্থিত কমণ্ডলুটি কুড়াইয়া লইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। আমার কেমন হইল, আমি তখন উঠিতে পারিলাম না, তাঁহার সহিত কোন কথাও বলা হইল না।

বৃক্ষান্তরালে বসিয়া বসিয়া আর একটী আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখিলাম। কি অলৌকিক ঘটনা! সেই বৈদ্যুতকি আলোর মধ্য হইতে একটী অপূর্ব্বসুন্দরী রমণী মূর্ত্তি ছায়ার ন্যায় বাহির হইয়া আসিয়া পতিতা যুবতী ও যুবক সান্ন্যাসীর দেহ পার্শ্বে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনটী ছায়া মূর্ত্তি এক সঙ্গে দণ্ডায়মান দেখিলাম। পরক্ষণে চক্ষের পলক ফেলিতে না ফেলিতে ঐ তিন মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্দ্ধত হইয়া গেল। আমি অমানুষিক ব্যাপার কিছুই বুঝিতে না পারিয়া আশ্চর্য্য হৃদয়ে ধীরে ধীরে সে স্থান হইতে উঠিয়া গমন করিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

—০ঃ০ঃ০—

মায়া-কন্যা।

তোমারা নিশ্চয়ই আমার কথা শুনিয়া হাসতেছ। কিন্তু হাসিবার কথা নহে। নিশ্চয়ই আমার মনের উপর কোন প্রকার শক্তি চালনা করিয়া সেই শক্তিশালী মহাপুরুষ প্রস্থান করিয়াছেন। মন যদি ইন্দ্রিয়ের সহিত সংযুক্ত না থাকে, বা যথোপযুক্ত ভাবে ক্রিয়া না করে, তবে বহিরিন্দ্রিয় কি করিতে পারে?

আমি উঠিয়া সর্ব্বত্র অনুসন্ধান করিলাম,—কোথাও তাহার সন্ধান মিলিল না। তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া পড়িলাম। এক এক বার ভাবিতে লাগিলাম, এত কষ্ট করিয়া অমরনাথে আসিলাম, এত কষ্টে তাঁহার সন্ধান পাইলাম, কিন্তু কোন কথা হইল না। তবে এ জীবনে কাজ কি? আর তাঁহার অনুসন্ধান করিব না—আর কোথাও যাইব না—এই অমর নাথেই জীবন বিসর্জ্জন করিব।

সহসা যেন প্রাণের মধ্যে আশার আলো জ্বলিয়া উঠিল। সে আলোকে যেন দেখিতে পাইলাম,—আমার ভবিষ্যৎ ভাল। কে যেন কাণে কাণে বলিয়া দিল—"এখনও সময় হয় নি।"

সময় যদি না হইয়া থাকে, তবে আমার এ আকুল ছুটাছুটি কেন? কোথায় যাই, কি করি,—অনেকক্ষণ বসিয়া বসিয়া ভাবিলাম। ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না, সেখান হইতে স্থানান্তরে গমনের উদ্যোগ করিলাম।

সেই নির্জ্জন পার্ব্বত্য পথ বাহিয়া চলিয়া যাইতেছি, এমন সময় এক সুন্দরী যুবতীর সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল,—তেমন লাবণ্য—তেমন সৌন্দর্য্য বুঝি আমার নয়ন-পথে আর কখনও পতিত হয় নাই। সে আমাকে মধুর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"পথিক, কে আপনি?"

আমি বলিলাম—"বাঙ্গালা দেশে আমার বাড়ী, এখানকার প্রবাসী। যদি বাধা না থাকে, আপনি কে, পরিচয় দিন।"

যুবতী হাসিল। সে হাসি বড় সুন্দর, বড় মধুর। হাসিতে হাসিতে বলিল,—"আমি কেউ না। আপনি এখন কোথায় যাইবেন? পাহাড়ে হিংস্র জন্তু ও হিংস্র মানুষ আছে।"

আমি। আমি তাহাতে ভয় করি না।

যুবতী। কেন?

আমি। আমার জীবনে সুখ নাই।

যুবতী। তোমার কি কোন রমণীর সহিত ভালবাসা হয় নাই?

আমি। সে কথা কেন?

যুবতী। যুবতী রমণীর সহিত প্রণয় না হইলে যুবকগণ জীবনে ঐরূপ নীরস ভাব ও কঠোরতাই ধারণা করিয়া থাকে।

আমি। আপনি কে?

যুবতী। আমি এক মেয়ে।

আমি। আপনার বাড়ী কোথায়?

যুবতী। তুমি আমায় ভাল বাসিবে?

আমি। কেন?

যুবতী। আমায় ভাল বাসিলে তোমাকে অসীম সুখী করিব।

আমি। ভাল বাসিতে পারিব না।

যুবতী। না পারিবার কারণ?

আমি। জীবনের পথ খুঁজিতেছি।

যুবতী হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। সে হাসি ভীষণ ভৈরব। সমস্ত পাহাড়-গাত্রে তাহার প্রতিধ্বনি উঠিল।

আমি বিস্ময়-চকিত নেত্রে রমণীর দিকে চাহিয়া দেখিলাম,—রমণী আমার দিকে তীব্র দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। আমার বোধ হইল, সে নিশ্চয়ই মায়া-কন্যা। এমন কুসুমে কুলিশভাব মায়া-কন্যা ব্যতীত কোথায় সম্ভবে?

রমণী। কিঞ্চিৎ প্রশান্তস্বরে বলিল,—"কি ভাবিতেছ?"

আমি। কিছুই না।

রমণী। আমার বাড়ী চল।

আমি। সে কোথায়?

রমণী। এই পাহাড়েরই এক স্থানে। আদি বাড়ী যেখানে, তা তুমি এখন চিনিতে পারিবে না।

আমি। বাড়ীতে তোমার আর কে আছে?

রমণী। যিনি আছেন, তিনি নিষ্ক্রিয়—কোন কাজ করেন না—সকল বিষয়েই উদাসীন।

আমি। সেখানে লইয়া গিয়া কি করিবে?

রমণী। ভাল বাসিব। এই কোমল বাহুর মধুর বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিব। তুমি যে সুখ-হারা, সেই সুখ দান করিব।

আমি। পত্নী-ভাবে?

রমণী। হ্যাঁ।

আমি। আমি যৌবনের সীমাকাল পর্য্যন্ত সে ভাবে ডুবিয়াছিলাম,—সুখী হই নাই।

রমণী। সে হয়ত ভালবাসিতে জানে না।

আমি। তাহার প্রাণভরা ভালবাসার ক্ষীর-ধারা সর্ব্বদা আমাকে বাঁধিয়া রাখিত।

রমণী। তবে উপেক্ষা করিলে কেন? এ জগতে রমণীর প্রেমের চেয়ে সুখের জিনিষ পুরুষের আর কিছুই নাই।

আমি। তাহাতে প্রাণের অন্তিম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় না।

রমণী। সে আকাঙ্ক্ষা কি?

আমি। দুঃখনিবৃত্তি।

রমণী। সারা প্রাণখানি যদি প্রেমপূর্ণ থাকে, তবে আবার দুঃখ আসিবে কোথা হইতে?

আমি। যেমন ভস্ম দ্বারা আগুন আচ্ছাদিত থাকে, কিন্তু ভিতরে দাহিকা শক্তি, ইহাতেও তেমনই হয়। একটু বাতাস বহিলেই ছাই উড়িয়া যায়,—আগুনের প্রত্যক্ষ জ্বলন্তজ্বালা বাহির হইয়া পড়ে।

রমণী। অত কথা শুনিতে চাহি না,—আমার রূপ দেখ,—এমন রূপ দেখিয়াছ কি?

আমি। রূপ জড়—জড়ে আর আবদ্ধ হইব না।

রমণী। তবে?

আমি। যে শক্তি দ্বারা এ জড়রাজ্য পরিচালিত,—সেই মহাশক্তির পদতলে জীবন আহুতি দিব।

রমণী। সে শক্তি কোথায়?

আমি। আপনাতে।

রমণী। তবে আমার চরণ-তলে আত্মাহুতি দাও।

আমি। মাতৃ-পদতলে জীবন ঢালিতে ভয় কি? আপনি চিরহিতৈষিণী মা,—মা! আমার গতি কর।

মায়া। তবে শুন বৎস—

এই দেখ মায়িক সংসার।
এ কেবল মনেরি বিকার॥
মায়ায় মণ্ডিত ভব, মায়ায় মোহিত সব,
যত কিছু মায়ার ব্যাপার॥১
অমায়িক পরমাত্মা যিনি।
মায়ার প্রেরক হন তিনি॥
প্রবীণা প্রকৃতি মায়া, হোয়ে ঈশ্বরের জায়া,
প্রতিদিন পতি-বিরহিণী॥২
গোপনেতে দুজনের বাস।
কারো কাছে না হন প্রকাশ॥
এক ঘরে একা একা, পরস্পর নাহি দেখা,
কেহ কারে না করে সম্ভাষ॥৩
বেদান্তের মতে এই কয়।
মায়াপতি নন মায়াময়॥
যার নামে উপবাস, তার সহ সহবাস,
কখনো কি সম্ভাবনা হয়॥৪
জনক-সংহিতা মতে সার।
প্রকৃতির উক্তি এ প্রকার॥
নির্গুণ আমার পতি, আমি সতী গুণবতী,
পতি সহ নাহি ব্যবহার॥৫
হায় হায় কারে বলি আর।

কে জানিবে প্রভাব আমার ॥
অরসিক সেই ভর্ত্তা, কেবল নামেতে কর্ত্তা,
ক্রিয়া কর্ম্ম কিছু নাহি তার ॥৬
নির্গুণের কোন কিছু নয়।
নিজগুণে করি সমুদয় ॥
না লয় আমার নাম, লোকে বলে গুণধাম,
পোড়া লোকে তাঁর কর্ম্ম কয় ॥৭
আমাতে পতির নাহি গতি।
সম্ভোগ না করে কভু রতি ॥
পতিসঙ্গ পরিহরি, এ সব প্রসব করি,
কার সাধ্য কে বলে অসতী ॥"

এই বলিতে বলিতে একখানা ছায়ার মত সে মূর্ত্তি সরিয়া গেল। আমি দেখিলাম, দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়াছে। আমার প্রাণের মায়ার বাঁধন যেন খসিয়া পড়িয়াছে। সর্ব্বত্রই যেন অচঞ্চল আনন্দ খেলিয়া বেড়াইতেছে। আমার মনে হইল,—হয়ত এ সকল সেই মহাপুরুষেরই মহৎ লীলা।

সে দিন সেই স্থানেই অতিবাহিত করিলাম। তাহার পর আরও কয়েক দিন অমরনাথে থাকিয়া সন্ন্যাসীর অনুসন্ধান করিলাম,—কিন্তু কোথাও সন্ধান মিলিল না। তখন নিতান্ত হতাশ হইয়া অমরনাথ পরিত্যাগ করিলাম।

একবার ভাবিলাম, কলিকাতায় যাই। আবার ভাবিলাম, কি জন্য? কাহার জন্য?

মনে হইল, অনেক দিন বাড়ীর খবর পাই নাই আবার

মনে হইল, কেন? তাহাদের খবর লইয়া কি হইবে? সকলেই কর্ম্মসূত্র লইয়া কর্ম্ম করিতে আসিয়াছে—কর্ম্মানুযায়ী ফল লাভ করিয়া চলিয়া যাইবে। আমার সংবাদ লওয়াতে তাহাদের কি হইবে?

আমি সন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে সমস্ত তীর্থ পরিভ্রমণ করিব বলিয়া স্থির করিলাম, এবং সেই দিন অমরনাথ পাহাড় পরিত্যাগ করিলাম।

নবম পরিচ্ছেদ।

-০*০-

হরিদ্বার।

আমি ৩ মাস কাল নিয়ত পরিশ্রমে ভারতের বহু তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিলাম। কিন্তু সে মহাপুরুষের সাক্ষাৎ কোথাও পাইলাম না। ক্রমে মনে নিদারুণ ক্ষোভ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম তিনি হয়ত আর আমায় দেখা দিবেন না অধমাধমের ভাগ্যে বুঝি তাঁহার দর্শন আর মিলিবে না। তখন স্থির করিলাম, আর বৃথা পর্য্যটনে ফল কি! কোন এক নির্জ্জন পর্ব্বতে গিয়া এ শরীর পাত করি। কিন্তু আমি তখন ঘুরিতে ঘুরিতে হরিদ্বারের সন্নিকটে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম। একবার হরিদ্বারটীতে ঘুরিয়া যাইতে বাসনা হইল। সেইদিনই হরিদ্বার অভিমুখে যাত্রা করিলাম।

এই ভূমণ্ডলে প্রভূত তীর্থের কথা শুনা যায়। তন্মধ্যে এই ভারতবর্ষে যত তীর্থ দেখা যায়, তত তীর্থ আর কোথাও দেখা যায় না। ভারতের তীর্থ সকল পুরাণাদিতে বিভাগক্রমে বর্ণিত হইয়া থাকে। এই সকল তীর্থের কতকগুলি ধাম ও পুরী এবং কতকগুলি পীঠ বলিয়া বর্ণিত হয়। তন্মধ্যে অনেকগুলি শৈল, সরিৎ, সরোবর এবং কাননাদিও তীর্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে। তীর্থ সকলকে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। কতকগুলি তীর্থ উত্তরখণ্ডের অন্তর্গত, কতকগুলি তীর্থ মধ্যখণ্ডের অন্তর্গত, এবং কতকগুলি তীর্থ দক্ষিণাপথের অন্তর্গত। হিমালয় এবং তৎ-

সমীপবর্ত্তী তীর্থ সকলই উত্তর খণ্ডের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। হিমাচল ও বিন্ধ্যাচলের মধ্যবর্ত্তী তীর্থগুলি মধ্য খণ্ডের মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে, আর বিন্ধ্যাচলের দক্ষিণস্থ অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের তীর্থ সকল দক্ষিণাপথের মধ্যে গণ্য হয়।

উত্তরখণ্ড প্রাচীন আর্য্য ঋষিদিগের তপোবন বলিয়া অদ্যাপি কীর্ত্তিত হইতেছে। বেদব্যাসাদি মহর্ষিগণ, নারদাদি দেবর্ষিগণ, এবং ভগীরথাদি রাজর্ষিগণ যে স্থানে সুখাসীন হইয়া এক সময়ে কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলেন, ইহাই সেই পরম পবিত্র তপোভূমি। যেখানে গঙ্গা যমুনা প্রভৃতি সুরতরঙ্গিণী হিমালয়ের তুষারধবলিত অত্যুচ্চ শিখরসমূহ হইতে উৎপন্ন হইয়া উল্লম্ফনপূর্ব্বক ধরাবক্ষে পতিত হইতেছেন, ইহা সেই মন-প্রাণ-মুগ্ধকারী লোমহর্ষণকর বিবিধ শোভার লীলাস্থল।

পুরাণাদিতে যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণের যে স্বর্গারোহণের কথা শুনা যায়, সেই তুষারমণ্ডিত হিমাদ্রিশিখর অর্থাৎ মহাপ্রস্থান-স্থান এই প্রদেশেই বিদ্যমান।

সকলেই অবগত আছেন, হিমালয় পর্ব্বত ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় অবস্থিত, এবং সেই হিমালয়ের উপত্যকা প্রদেশে হিন্দুর মহাতীর্থ হরিদ্বার। উহার বামে ও দক্ষিণে উভয় দিকেই হিমাচলের শাখাশৈল। গঙ্গা উক্ত উভয় পার্শ্বের শাখাশৈলের মধ্য দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ দিকে গমন করিতেছেন। শৈলের পূর্ব্বদিকে হরিদ্বার সহর। সহরের পূর্ব্বদিকে গঙ্গা। গঙ্গার পূর্ব্বপারে আবার শৈল।

তখন সন্ধ্যা হইতে অধিক বিলম্ব ছিল না। আমি গঙ্গার তীরে তীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। এতকাল যে, গঙ্গাকে "সদ্যঃপাতক-সংহন্ত্রী" বলিয়া শুনিয়া আসিয়াছি, আজ তাহা চাক্ষুষ দর্শন করিতে

সক্ষম হইলাম। গঙ্গা দর্শন করিয়া আমার যেন সমস্ত পাপরাশি বিদূরিত হইয়া গেল। প্রাণে যে কোন আকাঙ্ক্ষা আছে—আমার যে জগতে কিছু প্রয়োজন আছে, আমি সে সকল একবারেই বিস্মৃত হইয়া গেলাম। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! কি কলিকলুষ-নাশী মহান্ ভাব!

গঙ্গাই এই মহাতীর্থের মহাপ্রাণস্বরূপ। গঙ্গা নিজের নিভৃত উৎপত্তিস্থান হইতে ভগীরথের সম্বন্ধ বশতঃ ভাগীরথী নামে অভিহিত হইয়াছেন! গঙ্গার উৎপত্তিস্থান গাড়োয়াল রাজ্যের একটি হিমানীমণ্ডিত গুহা। উহা গঙ্গোত্তরী (গঙ্গোত্রী) হইতে আট মাইল। গঙ্গা ঐ দূরবর্ত্তী পর্ব্বতগুহা হইতে উৎপন্ন হইয়া গঙ্গোত্তরী নামক হিমালয়শিখরে পতিত হইয়াছেন। গঙ্গা নিজের উচ্চতর উৎপত্তিস্থান হইতে গঙ্গোত্তরী নামক হিমাচলশিখরের যে স্থানে পতিত হইয়াছেন, ঐ স্থানটির উচ্চতা সমুদ্রতল হইতে ১০৩১৯ ফিট, এবং তিনি যে স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, উহার উচ্চতা সমুদ্র-তল হইতে ১৩৮০০ ফিট। গঙ্গোত্তরী হইতে নামিয়া গঙ্গা প্রথমতঃ উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে সমাগতা জাহ্নবীকে, পরে উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে সমাগতা অলকনন্দাকে নিজ প্রবাহ মধ্যে গ্রহণ পূর্ব্বক হিমালয়ের দুর্গম কুটিল পথ সকল ভেদ করিতে করিতে হরিদ্বারের কিঞ্চিৎ উত্তরে আসিয়া কয়েকটি শাখায় বিভক্ত হইয়া শেষে হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। হরিদ্বারের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে আসিয়া তিনি আবার পূর্ব্বোক্ত স্বীয় শাখা স্রোতস্বিনী সকলকে আত্মসাৎ করিয়াছেন। পরিশেষে প্রয়াগে গিয়া যমুনার সহিত সম্মিলিত হইয়া সাগরাভিমুখে গমন করিয়াছেন।

গঙ্গার শোভা হরিদ্বারে যেমন, এমন বুঝি আর কোথাও নাই। সেই প্রায়াগত সন্ধ্যাকালে সেই মুরারিচরণচ্যুতাপর্ব্বত বাহিনী

গঙ্গার কি সৌন্দর্য্যই দেখিলাম! আমার সাধ্য নাই যে, আমি তোমাদিগকে বলিয়া বা বর্ণনা করিয়া বুঝাইব!

এখনে গঙ্গার আর পার্ব্বত্য পথ অতিক্রমের ক্লেশ নাই—সে পার্ব্বত্য বাধা বিঘ্ন নাই—সে তীব্র শৈলাঘাত প্রযুক্ত ফেনোদগম বা উল্লম্ফন নাই গঙ্গাদেবী এখানে পুনঃ পুনঃ কঠিন পাষাণ-ভেদের ক্লেশ হইতে বিমুক্ত হইয়া মৃণ্ময়-তট বিধৌত করিতে করিতে কলকল শব্দে সাগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তলদেশে মাটি প্রায় নাই—কেবল পাথর। জল অতি নিৰ্ম্মল-অতি স্বচ্ছ। স্বচ্ছ সলিলে দলে দলে মৎস্য বিচরণ করিতেছে—এত স্বচ্ছ নির্ম্মল জল যে, তাহাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে।

উদাস আমি—কৰ্ম্মহীন আমি—উদ্দেশ্যহীন আমি—গঙ্গাতট বাহিয়া ফিরিতে লাগিলাম। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সন্ধ্যার ধূসর আঁধারে প্রকৃতি সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

আমি তখন ব্রহ্মকুণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিলাম। ব্রহ্মকুণ্ড হরিদ্বারের প্রধান স্থল,—ইহা গঙ্গারই একটি অংশ;—জলরাশি কিনারার দিকে একটু বক্রভাবে প্রবেশ করাতে একটি ছোটখাট হ্রদের আকার ধারণ করিয়াছে। ইহার তল পর্য্যন্ত পাথর দিয়া বাঁধান এবং কিনারা পাথরের সিঁড়ি দ্বারা শোভিত। ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটটি এক শত ফুট প্রশস্ত এবং যাইটটি সোপানে সজ্জিত। ব্রহ্মকুণ্ডের উপরেই কয়েকটি দেবমন্দির। মন্দির মধ্যে দেবমূর্ত্তি। মূর্ত্তি মধ্যে গঙ্গামূর্ত্তি, শিবলিঙ্গ ও হরিচরণই প্রধান। রামলক্ষ্মণের মূর্ত্তিও আছেন।

মন্দিরে মন্দিরে সন্ধ্যারতি হইতেছিল। যাত্রিগণ সোৎসাহে আরতি দর্শন করিতেছিলেন,—কেহ মন্দির-লম্বিত ঘণ্টানাদ করিয়া প্রণামী দিতেছিলেন। তটভূমিতে যাত্রিগণ দীপাবলী প্রদান

করিয়াছেন; সে দৃশ্য অতি মনোহর। অসংখ্য দীপশিখা বাতাসে কাঁপিতেছিল - তাহাদের উজ্জ্বল কিরণ স্বচ্ছ গঙ্গাজলে পড়িয়া বড় মধুর শোভা বিকীর্ণ করিতেছিল। আমি ঘুরিয়া ঘুরিয়া সেই সকল দেখিয়া বেড়াইতে লাগিলাম!

ক্রমে রাত্রি অধিক হইল। যাত্রিগণ তখন আহারের আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কেহ স্বহস্তে পাক চাপাইয়া দিতেছেন, কেহ বা লুচি কচুরি কিনিয়া আনিয়া ক্ষুন্নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। যাহারা আমার মত, তাহারা অতিথি হইয়া কার্য্য সাধন করিতেছেন। দোকাণেও ভাত রুটি ডাল তরকারী কিনিতে পাওয়া যায়। তদ্‌ব্যতীত অন্নসত্র আছে, আমি সেই স্থানেই গমন করিয়া ছিলাম।

রাত্রি আরও অধিক হইল, হরিদ্বার ও প্রায় জনশূন্য হইল। এ দৃশ্য ভারতের অপর কোন তীর্থে দেখিতে পাই নাই। রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত হরিদ্বার জনকোলাহলে মুখরিত থাকে, তারপর— জনশূন্য, নিস্তব্ধ। তাহার কারণ, এখানে বাসিন্দা লোক আদৌ নাই। হরিদ্বারে যাত্রীরাই অধিবাসী, আর দোকানদার, পাণ্ডা ও সন্ন্যাসী। পাণ্ডারা রাত্রিতে এখানে বাস করেন না, তাঁহাদের বাড়ীও এখানে নহে। সন্ধ্যা হইলেই তাঁহারা নিজ নিজ বাসস্থানে চলিয়া যান। পাণ্ডাদিগের অধিকাংশেরই বাস জ্বালাপুরে ও কন্‌খলে। জ্বালাপুরে একটী রেল ষ্টেসন আছে, পাণ্ডাগণ সকালের গাড়ীতে চড়িয়া হরিদ্বারে আসেন, এবং হরিদ্বার হইতে সন্ধ্যার গাড়ীতে বাড়ী ফিরিয়া যান। প্রবাদ আছে, এখানে রেতঃপাত হইলে অনন্ত নরকবাস হয়, তাই কেহ এখানে পরিবার সহ বাস করেন না। আমি এক ধর্ম্মশালায় গিয়া সে নিশা যাপন করিলাম।

পর দিবস অতি প্রত্যুষে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন পূর্ব্বক গঙ্গাস্নান করিতে গমন করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, ব্রহ্মকুণ্ডে বুঝি রাত্রিরই মত লোক বিরল আছে। কিন্তু উপস্থিত হইয়া আমার সে ভ্রম দূরীভূত হইল। তত প্রত্যুষেও সহস্র সহস্র নরনারী সেখানে স্নান করিতেছে। সন্তরণপ্রিয় ব্যক্তিগণ সেই নির্ম্মল জলে সাঁতার কাটিতেছে, নির্ভীক মৎস্যগণ সন্তরণকারী মনুষ্যগণের সঙ্গে সঙ্গে আনন্দে সাঁতার দিতেছে, সেখানে মৎস্য মারিবার কাহারও সাধ্য নাই। 'তুঙ্গস্তনাস্ফালিত' শোভাও বিরল নহে। ভিড় ঠেলিয়া কোন প্রকারে স্নান সমাপ্ত করিয়া তীরে বসিলাম।

ব্রহ্মকুণ্ডে যেমন ভিড় অন্যত্র তেমন নহে। ব্রহ্মকুণ্ডই প্রধান তীর্থ, আরও চারিটি আছে। আমি শাস্ত্রবাক্য স্মরণ করিলাম

হরিদ্বারে কুশাবর্ত্তে বিল্বকে নীলপর্ব্বতে।
তথা কনখলে স্নাত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

পুনর্জ্জন্ম নিবারণের এমন সহজ প্রলোভন পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না।

ব্রহ্মকুণ্ড হরিদ্বারের বাজারের উত্তরসীমায়, উহারই দক্ষিণ, সীমায় কুশাবর্ত্ত। কুশাবর্ত্ত গঙ্গার একটী ঘাট। যাত্রীরা এই ঘাটে আসিয়া মুণ্ডন ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন। আমি সে সকলও বাদ দিলাম না। তার পরে সেখান হইতে নীলপর্ব্বতে চলিলাম। নীল-পর্ব্বতকে চণ্ডীরপাহাড়ও বলে। "নীলাচলনিবাসিনী" বৃন্দাবন যেন শ্রীকৃষ্ণের নিত্য নিবাস ধাম, চণ্ডীরও সেইরূপ নীলাচল নিত্য নিবাসস্থান।

ব্রহ্মকুণ্ড হইতে বাজারের মধ্য দিয়া যে রাস্তা আছে, তাহারই সমান্তরালভাবে গঙ্গার ধারে ধারে আর একটী রাস্তা আছে। ইহাকে রাস্তা না বলিয়া চত্বর বা প্লটফরম বলা যায়। এই প্লাট-

ফরমের উপরেই কুম্ভমেলা বসিয়া থাকে। তখন সে সময় নয়, কাজেই সে দৃশ্য দেখা ভাগ্যে ঘটে নাই। ইহার পূর্ব্বদিকে গঙ্গা এবং গঙ্গার অপর পারে নীলপর্ব্বত। নীলপর্ব্বতে গিয়া সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া বৈকালে হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিলাম। সে দিন আর কোথাও যাইতে পারিলাম না। পর দিবস প্রভাতে উঠিয়া বিল্ব-কেশ্বর যাত্রা করিলাম। হরিদ্বারের বাজার ও ষ্টেশনের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী পুল আছে, সেই পুলের অপর পার হইতে একটী কাঁচা রাস্তা, সেই কাঁচা রাস্তা বাহিয়া বিল্বকেশ্বর যাইতে হয়।

আমি পুলের নীচে নামিয়া ছিলাম। সেখানে তখন একটুও জল ছিল না, কেবল সুদৃশ্য উপলখণ্ড যেন সাজান রহিয়াছে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ, মধ্যাকৃতি কত রকম উপলখণ্ড দুগ্ধনিভ শ্বেত খণ্ডে হয়ত সবুজের ডোরা ' হরিদ্রারঙ্গে হয়ত নীলের রং ফলান, নীলে হয়ত সবুজের রেখা টানা। কত অতীত দীর্ঘকাল হইতে দেশ বিদেশের যাত্রিগণ এখান হইতে এই সকল সুদৃশ্য প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন, কিন্তু প্রকৃতির অফুরন্ত ভাণ্ডার হ্রাস নাই। অনেকক্ষণ তাহা দেখিয়া দেখিয়া তার পরে চলিতে লাগি-লাম, পথে কয়েক জন সঙ্গীও প্রাপ্ত হইলাম, তাঁহাদের সঙ্গে নানা বিধ কথোপকথন করিতে করিতে আমরা পশ্চিম মুখে গমন করিতে লাগিলাম। অনেকখানি গিয়া সম্মুখস্থ রেলের সাঁকোর মধ্য দিয়া লাইনের পর পারে উপস্থিত হইলাম। তখন সমস্তই জঙ্গল সেই জঙ্গলে মানুষের গতিবিধির জন্য একটা পথ হইয়া গিয়াছে, অন্য কোন ভাল রাস্তা নাই। এরূপ দৃশ্য দেখিয়া অনেকে ভীত হন,—কিন্তু আমার কোন ভয় নাই। মরণভয় সকল ভয় উপস্থিত করে,—সে ভয় যাহার নাই, বুঝি কোন ভয়ই তাহার নাই।

আরও খানিক গিয়া যুগ্মপথের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গিগণের মধ্যে একজন বিল্বকেশ্বর আরও কয়েকবার গিয়েছেন, —তিনি পথ চিনিতেন, কাজেই পথের জন্য কোন চিন্তা করিতে হইল না বামদিকের পথে না গিয়া আমরা দক্ষিণ দিকের পথে চলিলাম। সে জঙ্গলে পার্ব্বতীয় গাছের সঙ্গে আমাদের দেশের বাকস ও নিসিন্দা গাছ প্রচুর রহিয়াছে। সে জঙ্গল বৃক্ষ-লতায় একেবারে সমাচ্ছন্ন—স্থানে স্থানে সূর্য্যকিরণও প্রবেশ করিতে অক্ষম। কতিপয় বৃক্ষের উপরিস্থিত লতাবিশেষের কুসুম গন্ধে দিক্ সমুদয় আমোদিত করিতেছিল।

আরও কিয়দ্দূর গিয়া বিল্বকেশ্বরের মন্দির দেখিতে পাইলাম।

চতুর্দ্দিকে অরণ্য—উত্তরে ও পশ্চিমে সমুন্নত পাহাড়শ্রেণী, মানুষের সাড়াটি পর্য্যন্ত নাই,—বন্য পশুরও কোলাহল নাই, নীরব নিস্তব্ধ। কচিৎ আরণ্য ময়ূরের কেকাশব্দে এক একবার সেই নীরব বনভূমিকে মুখরিত করিতেছিল।

ইতস্ততঃ বিল্ববৃক্ষ-পরিবেষ্টিত এক প্রাচীন মন্দির মধ্যে যোগীশ্বর বিল্বকেশ্বর বিরাজ করিতেছেন। দর্শনে হৃদয় ভয় বিস্ময় ও ভক্তিতে বিপ্লাবিত হইল, প্রণাম করিয়া সংসার-পাশ-মোচন প্রার্থনা করিলাম। তার পর তথা হইতে বাহির হইয়া গৌরীকুণ্ড দেখিতে গেলাম।

বিল্বকেশ্বরের মন্দিরের অনতিদূরে একটি ঝরণাকে গৌরীকুণ্ড বলে। এই স্থানে পার্ব্বতী-শিব-স্বামী প্রাপ্তি কামনায় তপস্যা করিয়াছিলেন। এমন ব্যক্তি নাই, এখানে আসিলে যাহার হৃদয় ভক্তি ও প্রেম বিভোর না হয়। কিন্তু রাত্রে এখানে কাহারও আসিবার উপায় নাই, কারণ এ স্থান জনশূন্য এবং হিংস্র-পশু-

পূর্ণ। আমি বিল্বকেশ্বর দেখিয়া ফিরিয়া আসিতে আসিতে, যাইবার সময় যে পুলটীর নীচে নামিয়াছিলাম এবং রঙ বিরঙের উপলখণ্ড দেখিয়াছিলাম, সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। ঐ স্থানটী গঙ্গারই একটী খাল বিশেষ,—জলশূন্য, শুষ্ক বালুকারাশি ও উপলখণ্ডে পরিপূর্ণ। খালের মধ্য দিয়া আসিতে আসিতে গঙ্গার ধারে আসিয়া বাহির হইলাম। ঐ স্থানটীকে লালতরবাগ বলে। ঐ স্থান হইতে একটী রাস্তা গঙ্গার ধারে ধারে ব্রহ্মকুণ্ডের দিকে গিয়াছে। ঐ রাস্তার বাম পার্শ্বে একটী বাগান দেখিতে পাইলাম। ঐ বাগানটি একটি সাধুর আশ্রম। আশ্রমটি দেখিয়া বড়ই শান্তি প্রদ ও মনোরম্য বলিয়া ধারণা হইল,—বহু বৃক্ষাদিতে পরিশোভিত, ৩।৪ খানি কুশার গৃহ ও ছোট একটী একতালা পাকা ইমারতও আছে। জিজ্ঞাসায় জানিলাম, এটী স্বামী ভোলানন্দ গিরির সন্ন্যাসী-আশ্রম। এখানে দৈনিক ২০।২৫টী সাধু সন্ন্যাসী ও সমাগত অতিথির সেবা হইয়া থাকে।

বেলা অতিরিক্ত দেখিয়া আমি ঐ আশ্রমেই সে বেলা আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। যথাসময়ে গীতা নামক একটী পঞ্জাবীব্রাহ্মণ ডাল, রুটী, সাগী (তরকারীকে বলে) এবং অল্প দুটী ভাতও আনিয়া দিল, তাহাই প্রসাদ পাইলাম। আহারান্তে বৃক্ষমূলে ছায়ায় স্বামীজির নিকট বসিলাম। স্বামীজি এই ছায়াশীতল বৃক্ষতলাতেই একখানি খাটলী পাতিয়া দিনরাত বসিয়া থাকেন এবং সমাগত ব্যক্তিগণকে সাধু উপদেশ প্রদান করেন। তাঁহার আশ্রমে কয়েকটী বেদপাঠক ছাত্রও দেখিতে পাইলাম। এ ছাড়া শিষ্য সেবকও অনেকগুলি আছেন। আশ্রমস্থ কুশাগৃহ কয়েক খানিতেই ছাত্র ও শিষ্যগণ থাকেন। গৃহগুলির সন্মুখেই প্রাঙ্গণ (উঠান), প্রাঙ্গণের

চারিদিকে শ্রেণীবদ্ধরূপে সুশৃঙ্খলে রোপিত আম, জাম, পেয়ারা ও বাতাবী লেবুর গাছ। এ ছাড়া স্থানে স্থানে ফুল গাছ ও আঙ্গুরগাছ ইত্যাদিও আছে। এ সকল বৃক্ষে যখন ফুল ফুটে, তখন সমস্ত আশ্রমটী গন্ধে আমোদিত করিয়া তুলে। প্রাঙ্গণের পার্শ্বেই কিঞ্চিৎ নিম্ন ভূমিতে রাস্তা। ঐ রাস্তা হইতে আশ্রমস্থ সেবাকার্য্য দর্শন কথঞ্চিৎ নিবারণার্থেই যেন আশ্রমস্বামী রাস্তার ধারে ধারে প্রাচীরের ন্যায় কতকগুলি কণ্টকিত নাটা গাছ নিপুণতার সহিত রোপণ করাইয়াছেন। ফলতঃ তাহাতে আশ্রমটীর আরও শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। রাস্তার পরেই খরতরবাহিণী গঙ্গা কুলুকুলু ধ্বনি করিতে করিতে তীব্র বেগে কনখলাভিমুখে ছুটিয়া চলিয়াছেন। পর পারে সু-উচ্চ চণ্ডীর পাহাড়। আশ্রম সংলগ্ন রাস্তার ধারেই গঙ্গার তীরে একটী ঘাট বান্ধান আছে। এটীও এই আশ্রমস্বামী নিজ ব্যয়ে করাইয়াছেন। এই ঘাটটি আশ্রমের অতি নিকটে থাকায় সুবিধার জন্য আশ্রমবাসী সাধুসন্ন্যাসীদের স্নান-দানের কোনই অসুবিধা নাই। এ ছাড়া আশ্রম অভ্যন্তরে একটী প্রকাণ্ড ইন্দারাও আছে। তাহার জল অতি মধুর এবং হজমকারী।

আশ্রমে একটী কুঠারী বা ভাণ্ডারী সাধু ছিলেন, তাঁহার নাম ব্রহ্মানন্দ। ছাত্রেরা ও শিষ্যেরা তাঁহাকে মাতাজী বলিয়া সম্বোধন করিত। কারণ ভোলা বাবার দেশ বিদেশে বহু শিষ্য-সেবক ও ভক্ত আছে। যে কোন স্থান হইতে উত্তম উত্তম দ্রব্যাদি আসিলে যত্ন করিয়া রক্ষা করা এবং সকলকে সমভাগে যথাসময়ে দেওয়া এবং অসুখ বিসুখে যত্ন ও তত্ত্বাবধান লওয়া ইত্যাদি কারণে সকলে তাঁহাকে মাতৃস্থানীয় বলিয়া ভয় ও ভক্তি করিত। শুনিলাম কিছুদিন হইল তিনি দেহরক্ষা করিয়াছেন। তৎস্থানে গঙ্গাগিরি

স্থলাভিষিক্ত হইয়াছেন। কিন্তু দেখিলাম ইনি মার বাবা হইয়া বসিয়াছেন। এই স্বামীজীর কলিকাতাতেও বহু শিষ্য আছেন,—উকিল মোক্তার, এটর্ণী, ব্যারিষ্টার, ডাক্তার, কবিরাজ, জমীদার ব্যবসাদার, রাজা, প্রজা। এই সকল শিষ্যদিগের মধ্য হইতে যে সকল টাকা এই সন্ন্যাসী-আশ্রমের সেবার জন্য মাসিক চাঁদা আদায় হইয়া আসিয়া থাকে, তদ্দ্বারা আশ্রমের কার্য্য স্বামীজীর কার্য্যনিপুণতার কৌশলে সুন্দররূপে চলিতেছে। কিন্তু ক্রমে জানিলাম, স্বামীজী হরিদ্বারে যেরূপ ব্যাপার আরম্ভ করিয়া তুলিয়াছেন, তাহাতে চাঁদা আরও বৃদ্ধি হওয়া আবশ্যক।

আমি আহারান্তে স্বামীজীর নিকটে বসিয়াছিলাম। নাম প্রসঙ্গে নানা কথা উত্থাপন হইল, বিচার হইল, মীমাংসা হইল। সময়টি বড়ই আনন্দে কাটিয়া গেল। কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজীর মুখ হইতেও "বড় আনন্দ, বড় আনন্দ" এই শব্দ ২।৩ বার বাহির হইয়াছিল, তাহাতেই বোধ হইল, তাঁহারও কিঞ্চিৎ আনন্দ বৃদ্ধি হইয়াছিল। আমি উঠিব উঠিব করিতেছি, স্বামীজী নিষেধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে আশ্রমে বৈকুণ্ঠবাবু নামক একটী বাঙ্গালী শিষ্য দেখিতে পাইলাম। তাঁহার সহিত পরিচয়ও হইয়া গেল।

তৎপরে স্বামীজীর ধরমশালার কথা উঠিল। নূতন ধরমশালা প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা ব্যয় করিয়া প্রস্তুত হইয়াছে। স্বামীজী বলিলেন "বেটা, একবার দেখিয়া যা।" তৎক্ষণাৎ আদেশ পালনের জন্য বৈকুণ্ঠবাবু চাবী লইয়া চলিলেন। আমরা গিয়া ধরমশালায় প্রবেশ করিলাম। আশ্রম হইতে বাহির হইয়া বাজার অভিমুখে কিছু দূর গেলেই দক্ষিণপার্শ্বে গঙ্গাগর্ভ হইতে গাঁথিয়া উঠান হইয়াছে—একটী লাল রঙ্গের তেতালা ইমারত। রাস্তা হইতে বাটীর মধ্যে

প্রবেশ করিবার সদর ফটক। ফটক পার হইলেই নিম্নদিকে কয়েকটী সিঁড়ি, তৎপরে একটী সমতল বারাণ্ডা, বারাণ্ডা হইতে আবার কয়েকটী সিঁড়ি একবারে গঙ্গামধ্যে নামিয়াছে। এই সিঁড়ির দক্ষিণ ও বাম দুই ধারে দুইটী কুঠুরী। একটীতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, অপরটীতে পূজারি ব্রাহ্মণ থাকিবার স্থান পাইয়াছে। এভিন্ন এই নীচে-তালায় অনেকগুলি ঘর আছে, দোতালা-তেতালায় বাড়ীর উপযুক্ত বড় বড় ঘর ও বারাণ্ডা শোভা পাইতেছে। তেতালার ছাতে রান্নাঘর, পাই খানা ইত্যাদিও যথাক্রমে সন্নিবেশিত আছে দেখিলাম। সর্ব্বাপেক্ষা দোতালায় গঙ্গার দিকের বারাণ্ডার উপরিভাগে যে ছাতটী কারিগরী নিপুণতার সহিত প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা দেখিয়া বড়ই চমৎকৃত হইলাম এবং সেই স্থানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, বসিয়া বসিয়া গঙ্গার প্রখর স্রোত দর্শনে বড়ই আনন্দ বোধ করিলাম।

তৎপরে আমরা আশ্রমে ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। স্বামীজী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন দেখ্‌লি?" আমি সাধ্যানুসারে বর্ণনা করিলাম। পরক্ষণে, কয়েকটি যুবতী স্ত্রীমূর্ত্তি সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাচ্ছাদিত, গাত্রে গৈরিক আল্‌খেল্লা, বাম হস্তে প্রকাণ্ড কড়া-সংলগ্ন চিম্‌টা, অপর হস্তে দরিয়া নারিকেলের অর্দ্ধভাগ অর্থাৎ আধখানা করঙ্গরূপে ব্যবহার করিয়া ৪।৫ জনে এক সঙ্গে দল বাঁধিয়া বেড়াইতেছে। ইহারা ঐ চিমটা ঝাঁকিয়া ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করিয়া ও মুখে বোম্‌ বোম্‌ বলিয়া ও মধ্যে মধ্যে আলেক্‌ শব্দ করিয়া রাস্তা ঘাটে ও আশ্রমে আশ্রমে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়। ইহারা কাহারও নিকট কিছু চাহে না, কিন্তু ইহাদিগকে দেখিলেই কিছু দিতে হয়। ইহারা দাঁড়ায় না, চলিতে চলিতেই ভিক্ষা লয়।

ইহাদিগকে আলেক্ সম্প্রদায় বলে। এ দৃশ্য দেখিতে চমৎকার, যাঁহারা কখনও স্বচক্ষে দেখেন নাই, তাঁহাদিগকে বুঝান বড় দুষ্কর, তাই ক্ষান্ত থাকিলাম।

তাহারা ভিক্ষা লইয়া চলিয়া গেল। এদিকে সন্ধ্যাও হইয়া আসিল। আশ্রমে আলো জ্বালা হইল, স্বামীজী ও আমি ইতঃপূর্ব্বেই ব্রহ্মকুণ্ডেও স্নান করিতে গিয়াছিলাম। ফিরিয়া আসিয়াই দেখি, কয়েকটী আশ্রমবাসী সাধু ও শিষ্য একত্রে সমবেত হইয়া বসিয়া আছেন। স্বামীজী আসিবামাত্র তাঁহারা ভোলাবাবাকে ঘিরিয়া বসিয়া আরতি আরম্ভ করিলেন। আমিও সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের দৈনিক কৃত স্তব সুর করিয়া পাঠ করিতে আরম্ভ করিলাম। স্তবটী বড়ই শ্রুতিমধুর। স্তবটী শ্রবণে পাঠকগণের মানসিক মলিন দূরী-ভূত হইয়া পবিত্রভাব আসিবে মানসে এই স্থানে সন্নিবেশিত করিয়া দিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ।

—০:•:০—

আশ্রমস্তোত্র।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরিঃ ওঁ।

একং পূর্ণং নিত্যং সর্ব্বাধিষ্ঠানং—হর সর্ব্বাধিষ্ঠানম্
নিষ্কলনির্ম্মলদেবং—নিষ্কলনির্ম্মলদেবং—
বন্দে সর্ব্বেশম্।

সত্যং শান্তং সর্ব্বানন্দং চৈতন্যাভরণং—হর চৈতন্যাভরণং
কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং—কর্ম্মাধ্যক্ষং কেবলং—
সর্ব্বান্তরভূতম্।

ওঁ হর হর হর মহাদেব॥ ১

চণ্ডাংশুশ্চেন্দ্রোপেন্দ্রঃ শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ—হর শীতাংশুর্ব্বায়ুঃ।
অগ্নির্মৃত্যুর্দেবা ভীতাস্তব শম্ভো।
তং তং স্বং স্বং সর্ব্বং ব্যাপারং কর্ত্তুম্—হর ব্যাপারং কর্ত্তুম্
অনিদ্রান্তে নিত্যং—অনিদ্রান্তে নিত্যং—বর্ত্তন্তে নীতৌ॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥ ২

ব্রহ্মা বিষ্ণুঃ সাহঙ্কারৌ ঊর্দ্ধমধো যাতৌ—হর ঊর্দ্ধমধো যাতৌ।
ঐশ্বর্য্যং তদ্‌গন্তুং—ঐশ্বর্য্যং তদ্‌গন্তুং—শীঘ্রন্তে শম্ভো।
দিব্যং বর্ষসহস্রং পারং নায়াতৌ—হর পারং নায়াতৌ।
ভ্রান্ত্যা নিরহঙ্কারৌ—ভ্রান্ত্যা নিরহঙ্কারৌ—
শরণং তে যাতৌ ॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥ ৩

পূজানিষ্ঠো বিষ্ণুর্নেত্রং তে পাদে ধৃত্বা—হর তে পাদে ধৃত্বা।
ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং—ত্রৈলোক্যস্যাবৃত্তং সাম্রাজ্যং ভজতে।
অত্যন্তং তে ভক্তিং কৃত্বা পৌলস্ত্যো মানী—হর পৌলস্ত্যো মানী
গীর্ব্বাণানাং ব্রাতং—গীর্ব্বাণানাং ব্রাতং—
স্বাধীনং কুরুতে ॥

ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥ ৪

দেবা দৈত্যা গন্ধর্ব্বাস্ত্বা লোকে চানস্তাঃ—হর লোকে চানস্তাঃ।
ঐশ্বর্য্যং তৎ প্রাপ্য—ঐশ্বর্য্যং তৎ প্রাপ্য—সানন্দীভূতাঃ।
শুদ্ধো বুদ্ধো মুক্তো নিত্যস্ত্বং দেব—হর নিত্যস্ত্বং দেব।
অর্ব্বাচীনং যত্তদ্—আর্ব্বাচীনং যত্তদ্—
সর্ব্বং ত্বং ভাসি।

ওঁ হর হর হর মহাদেব ॥ ৫

ভূতেশস্তবমেতং সায়ং যোঽধীতে—হর সায়ং যোঽধীতে।
ধর্ম্মার্থং শুভকামং—ধর্ম্মার্থং শুভকামং—কৈবল্যং ভজতে।
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা নিষ্ঠা বাহ্যান্তরভূতং—হর বাহ্যান্তরভূতং।
দেবাদানামিষ্টং—দেবাদীনামিষ্টং—
সম্বিদ্‌গিরিগীতং ॥ ৬
ওঁ হর হর মহাদেব ॥ ৬

কর্পূরগৌরং করুণাবতারং সংসারসারং ভুজগেন্দ্রহারম্।
সদা বসন্তং হৃদয়ারবিন্দে ভবং ভবানীসহিতং নমামি ॥
অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি ॥
সৌরাষ্ট্রে সোমনাথঞ্চ শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালং ওঁকারং মামুলেশ্বরং ॥
গরল্যাং বৈদ্যনাথঞ্চ ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাং তু বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গৌতমীতটে ॥
সেতুবন্ধে তু রামেশং নাগেশং দ্বারকাবনে।
হিমালয়ে তু কেদারং ঘীষ্ণেশঞ্চ শিবালয়ে।
এতানি জ্যোতির্লিঙ্গানি সায়ং প্রাতঃ পঠেন্নরঃ।
সপ্তজন্মকৃতংপাপং স্মরণেন বিনশ্যতি ॥

বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎকারণম্,
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিম্।
বন্দে সূর্য্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং,
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শঙ্করম্॥

মহাদেব শিব শঙ্কর শম্ভো উমাকান্ত হর ত্রিপুরারে।
মৃত্যুঞ্জয় বৃষভধ্বজ শূলিন্ গঙ্গাধর মৃড় মদনারে॥
শিব হর শঙ্কর গৌরীশং বন্দে গঙ্গাধরমীশম্।
রুদ্রং পশুপতিমীশানং কলিহর কাশীপুরীনাথম্॥

শান্তাকারং ভুজগশয়নং পদ্মনাভং সুরেশং,
বিশ্বাধারং গগনসদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্।
লক্ষ্মীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং,
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্ব্বলোকৈকনাথম্॥

আকাশাৎ পতিতং তোয়ং যথা গচ্ছতি সাগরম্।
সর্ব্বদেবনমস্কারঃ কেশবং প্রতি গচ্ছতি॥
কেশবঃ ক্লেশনাশায় দুঃখনাশায় মাধবঃ।
হরিশ্চ পাপনাশায় গোবিন্দো মুক্তিদায়কঃ॥

গোবিন্দ, গোবিন্দ, গোবিন্দ।

তৎপরে শিষ্য ও ভক্তগণ, গুরুপ্রণাম আরম্ভ করিলেন। তখন আমার মনে হইতে লাগিল, ভগবান্ পাথরে আছেন, জীবে দেখিতে পায় না—জড়তার জন্য। চৈতন্যরূপে সর্ব্বজীবেই সমভাবে খেলা করিয়া বেড়াইতেছেন। তাই মনে হইল,—

মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ, মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা, তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অন্ধজীব তাহা দেখিয়াও দেখে না, বুঝিয়াও বুঝে না—এই বড় আশ্চর্য্য। বিল্বকেশ্বর দেখিয়া আসিলাম, স্থান দেখিলাম—শান্তিপূর্ণ বহু পুরাতন মন্দির দেখিলাম, তন্মধ্যে প্রাচীন প্রস্তর খণ্ড শিবলিঙ্গও দেখিলাম। কিন্তু এরূপ শান্তিপ্রদ স্তবাবলী ত কোথাও শুনিলাম না। তাই মনে হইতে লাগিল, এই সাধুরূপেই বুঝি বিল্বকেশ্বর এই স্থানে বসিয়া জীবকুলকে শিক্ষা দিতেছেন।

সারা হরিদ্বারটী ঘুরিয়াও আমি এরূপ আর একটী সাধু বা আশ্রম দেখিতে পাই নাই। তখন একান্ত ভক্তিগদ্গদ প্রাণে পুনঃ স্তব শুনিতে লাগিলাম।

মন্ত্রঃ সত্যং পূজা সত্যং সত্যং দেবো নিরঞ্জনঃ॥
গুরোর্বাক্যং সদা সত্যং সত্যমেব পরং পদং॥
অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
পিতৃমাতৃসুহৃদ্‌বন্ধুবিদ্যাতীর্থানি দেবতাঃ।
ন তুল্যং গুরুণা সার্দ্ধং স্পর্শয়েৎ পরমং পদম্॥
গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুগুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরম্ ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

ধ্যানমূলং গুরোর্ম্মূর্ত্তিঃ পূজামূলং গুরোঃ পদং।
মন্ত্রমূলং গুরোর্ব্বাক্যং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা॥

ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদিলক্ষ্যং।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বগং সাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥
ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব,
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব,
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেবদেব॥
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এই আশ্রমস্তোত্র সমাপ্ত হওয়ার পর সকলে স্বামীজীকে প্রণাম এবং প্রদক্ষিণ করিয়া চরণামৃত পান করিয়া বসিলেন। আমিও তাহাই করিলাম। কিন্তু প্রাণের মধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল। সে রাত্রে আর কোথাও গেলাম না। ঐ আশ্রমেই থাকিলাম। প্রভাতে উঠিয়া স্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মকুণ্ড হইতে স্নান করিয়া সেই সন্ন্যাসী-আশ্রমেই আসিলাম। কিঞ্চিৎ জলযোগের পর মহাপুরুষের নিকট বসিয়া বসিয়া কত জ্ঞানপূর্ণ উপদেশ শুনিলাম। কত লোক এল, উপদেশ শুনিল, প্রণামী দিল, চলিয়া গেল—বসিয়া বসিয়া দেখিলাম। যথাসময়ে মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাধান্তে সেই কুশাগৃহে গিয়া একটু বিশ্রাম করিলাম।

একটু পরেই স্বামীজী আমাকে ডাকিলেন। আমি সেই বৃক্ষ-চ্ছায়ায় তাঁহার খাটিয়ার নিকট আসিয়া বসিলাম। বসিয়া বসিয়া কত কথা হইল। প্রার্থনা জানাইলাম, আমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষার কথা বলিলাম। তিনি বলিলেন "তোর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবে।" আমি বলিলাম "আপনার আশীর্ব্বাদ (দেখুন) সাধুবাক্য বিফল হয় না। তাঁহার চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া তৎপর স্থির হইয়া বসিলাম। তাঁহার সংসার ত্যাগ, সন্ন্যাস গ্রহণ, আশ্রম স্থাপন এবং সাধু সন্ন্যাসীর সেবার উপায় সংগ্রহ বিষয় একে একে সংক্ষেপে অনেক কথা শুনিলাম। তৎপর তাঁহার কলিকাতার শিষ্যদিগের কথা উঠিল। তখন বলিলেন "আমার প্রায় সহস্রাধিক শিষ্য ও ভক্ত আছে। তন্মধ্যে কয়েকটী বাঙ্গালী শিষ্য বড়ই ভাগ্যবান ও ভক্ত। কলিকাতা শোভাবাজার রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের একটী বাটীতে প্রতি শনিবারে যাহারা উপস্থিত হইয়া গুরুমূর্ত্তি পূজা, আরতি এবং এই আশ্রম-স্তোত্র পাঠ করিয়া থাকে, তাহাদের সুকৃতির কথা কি বলিব? আমি উপলক্ষ। তাহাদিগের যত্ন চেষ্টার দ্বারাই, এখানে এই যে ধর্ম্মশালার বাটী দেখিয়া আসিলে, উহা প্রস্তুত এবং তাহার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে ও হইবে। তাহাদের উপর আমার যে অমোঘ আশীর্ব্বাদ আছে, তাহা ধ্বংস হইবার নহে।

বৎস! সংসারে আসিয়া, কি করিলে জীবে দয়া ও নামে রুচি এই প্রাচীন বাক্যটী যদি নূতনরূপে নব অনুরাগে নব কলেবর পূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিতে না শিখিলে, তবে আর এ নরদেহ ধারণে ফল কি? আসক্তিশূন্য হইয়া সংসার-আশ্রম করিয়া যে ব্যক্তি সাধু কার্য্যে জীবন-পাত করিতে পারে, তাহার সৌভাগ্য সংসারত্যাগী সাধু অপেক্ষাও উচ্চ। এই আদর্শ যে লইতে পারে, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হইয়া থাকে।"

আমি এই মহাপুরুষের মধুর উপদেশবাক্য শুনিয়া এবং তাঁহার স্নেহাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া সেখান হইতে বাহির হইলাম। বেলা তখন ৩টা বাজিয়াছে। যেখানে যাই, যত দেখি, যত শুনি, কিছুতেই আমাকে গমনে বাধা দিতে পারে না। অদৃশ্য কোন কর্ম্মসূত্রে যেন আমাকে অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিয়া ঘুরাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে। আমার সর্ব্বদাই চিন্তা—প্রয়াগধামের সেই সন্ন্যাসী, আর কাশীক্ষেত্রের পরম সুহৃদ্ সাধু যুবা। এই দুই মূর্ত্তি আমার চিত্তকে এরূপভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছেন যে, এত তীর্থ পরিভ্রমণ করিলাম, এত সাধু সন্ন্যাসী উদাসীন দেখিলাম, কাহারও নিকট পৌঁছান খবর পাইবই, এমন আশা হইল না।

তখন ভাবিতে ভাবিতে ব্রহ্মকুণ্ডের পারে গিয়া দাঁড়াইলাম। দেখিলাম, কোন এক যুবতী চুল খুলিয়া, পা মেলিয়া বসিয়া বসিয়া ময়দার গুটী ব্রহ্মকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেছেন আর শত শত মাছ ওলট পালট খাইয়া গ্রাস করিয়া চলিয়া যাইতেছে। কেহ বা দুটী মুড়ি ছড়াইয়া মৎস্যক্রীড়া দেখিতেছে।

আর এক স্থানে কবি যিনি, তিনি ভাগীরথীর তীরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত কি যে কল্পনা করিতেছেন তাহার ইয়ত্তা নাই। জলের স্বচ্ছতা দেখিয়া কোন্ বস্তুর সহিত তাহার উপমা দিবেন, তাহা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন! স্ফটিক বা কাকচক্ষু এই দুটির কোনটীই তাঁহার মনের মত হইতেছে না। যেন আর কিছু খুঁজিতেছেন। তরঙ্গের সৌন্দর্য্য দেখিয়া ভাবিতেছেন যে ভুজঙ্গের কুটিল গতিই ইহার উপমার যোগ্য। পুনর্ব্বার সন্দিহান হইয়া অন্য কিছু অনুসন্ধান করিবার জন্য যেমন চিন্তামগ্ন হইতেছেন, সেই অবসরে তাঁহার সম্মুখস্থ তরঙ্গমালা তাঁহার চিত্ত অপহরণ

করিয়া দূরে পলায়ন করিতেছে, এবং অপর এক তরঙ্গমালা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করিতেছে। তখন হয় ত তিনি উহাদের চিত্তহরণ পূর্ব্বক পলায়নপরতার জন্য সুকেশিনীর বঙ্কিম কেশ-দামকেই উহাদিগের যোগ্য উপমাস্থল নির্দ্দেশ করিতেছেন। আবার ভূতত্ত্ববিৎ যিনি, তিনি গঙ্গাগর্ভস্থ প্রস্তরখণ্ড সকল নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার কতকগুলি কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

এইরূপ সকলই আপনাপন মনোবৃত্তি অনুসারে এক একটী দ্রব্য ঐ একই স্থান হইতে গ্রহণ করিতেছেন এবং আনন্দ অনুভব করিতেছেন। কিন্তু সুখ হইতেছে-না কেবল এক মৎস্য-লোভী বাঙ্গালীর। হাতের কাছে এমন সুন্দর সুন্দর মাছগুলি দলে দলে সাঁতার দিয়া বেড়াইতেছে, অথচ ধরিতে পারিতেছেন না, ইহা অপেক্ষা আর তাঁহার মনস্তাপের বিষয় কি আছে?

আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ঐ সকল মানবান্তঃকরণের উর্ম্মিমালা নিরীক্ষণ করিতেছি, আর আমার নিজের ভাবনাই ভাবিতেছি, এমন সময় হরিদ্বার ষ্টেশন দিক্ হইতে ব্রহ্মকুণ্ডাভিমুখে ত্রিরাস্তার উপর কয়েকখানি ঘোড়ার গাড়ি আসিয়া থামিল। গাড়িপূর্ণ অনেকগুলি বঙ্গদেশী যাত্রী, একটী বৃদ্ধ ও কয়েকটি বাবুকেই প্রথমে দেখিয়াছিলাম। তাঁহারা ঐ স্থানেই নামিয়া পড়িলেন। গাড়োয়ানগণ নবাগত যাত্রী দেখিয়া, তাহাদের মালামাল নামাইয়া দিয়া, ভাড়ার তাগাদা করিতে লাগিল। বাবু কয়েকটী ও বৃদ্ধ কর্ত্তাটী নতান্ত ভাল মানুষ। ছোট লোকের সহিত বাক্‌বিতণ্ডা নিষ্প্রয়োজন বোধে তাড়াতাড়ি ভাড়া চুকাইয়া দিলেন। স্বদেশী বাঙ্গালী যাত্রী দেখিয়া আমার বড় আনন্দ হইল, তাই নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম।

যাত্রিগণ-মধ্যে কর্ত্তাটী অশীতিবর্ষবয়স্ক, ফুট্‌ফুটে গৌরবর্ণ, শক্তিশালী শিষ্ট শান্ত বৃদ্ধ। তৎসঙ্গে অনেকগুলি স্ত্রী পুরুষ। পুরুষগণমধ্যে কয়েকটী যুবা ও কয়েকজন যৌবনাতিক্রমী ব্রাহ্মণ। একটী বৈদ্যসন্তানও ছিলেন। কর্ত্তাটী নিজেও জাতিতে বৈদ্য। সঙ্গিনী স্ত্রীগণ-মধ্যে ২।১ জন বৃদ্ধা ও অন্যান্য সকলেই প্রৌঢ়ভাবাপন্না। ইহাঁদের মধ্যে ২।৪টী ব্রাহ্মণকন্যাও ছিলেন; বক্রী সকলেই বৈদ্যকুলোদ্ভবা। কেবলমাত্র একটী অল্পবয়স্কা সুলক্ষণা যুবতী ছিলেন। মা যেন প্রথন বয়সেই দুইটী সুসন্তান প্রসব করিয়া জননী নামে অভিহিতা হইতেছেন, নচেৎ বালিকা বলিয়াই অভিহিত করা যাইত। সে সকলের মধ্যে কয়েকটী সধবা ও অনেকগুলি বিধবা ছিলেন। যদিচ ইহাঁরা ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের উপরিভাগেই নামিয়াছেন, তথাপি সবিশেষ জানা না থাকায় এবং বাসার বন্দবস্ত অভাব-জনিত কষ্টে সকলেই বড় চিন্তাযুক্ত ছিলেন,—কোথায় যাইবেন, কি করিবেন ভাবিতেছেন। তৎকালে বৃদ্ধের অবস্থা দেখিয়া আমার মনে বড় কষ্ট হইল। আমি অগ্রগামী হইয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম "আপনারা সকলেই ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আসিয়াছেন, বেলা অবসানপ্রায়, শিশু দুটী এবং সঙ্গিনী স্ত্রীলোক-দিগকে বড়ই কাতর দেখা যাইতেছে, আপনারা বোধ হয় বহুদূর হইতে আসিতেছেন। এই বৈশাখী রৌদ্রে সকলেই পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ—বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন। নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড,—সকলেই আসিয়া কুণ্ডে নামিয়া অবগাহন-স্নান করুন, শীতল হইবেন। প্রবাদ আছে, ধূলাপায় এখানে স্নান করিলে বিশেষ ফল হয়।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "কুণ্ড কত দূরে?"

আমি। বেশী দূর নয়, অতি নিকট—ঐ দেখা যাইতেছে।

বৃদ্ধ! মালামাল এখানে ফেলিয়া কি করিয়া সকলে যাইব?

আমি। কোন চিন্তা নাই; সঙ্গী বাবুদিগের মধ্যে ২।১ জন এখানে থাকুন, ২।১ জন স্ত্রীলোকদিগকে লইয়া ব্রহ্মকুণ্ডে নামাইয়া স্নান করাইয়া লইয়া আসুন। আপনি অত সিঁড়ি নামিয়া স্নান পান করিতে পারিবেন না। অতএব আমার সঙ্গে আসুন, একটু অগ্রসর হইলেই কুণ্ড দর্শন হইবে এবং একজন ঘটী কি গ্লাস করিয়া জল তুলিয়া আনিয়া আপনাকে পান করাইবে এবং চোখে মুখে জল দিয়া বিশেষ সুস্থ বোধ করিবেন। এমন পবিত্র ও শীতল জল আর কোথাও দেখেন নাই।

এমত সময় পার্শ্বে দৃষ্টি করিয়া দেখি, আমার পূর্ব্বপরিচিত সন্ন্যাসী-আশ্রমের সেই গুরুভাই বৈকুণ্ঠবাবু। আমি তাঁকে বলিলাম "ভাই, তুমি এই বাবুদিগকে এবং চাকর বামুণ, ঝি প্রভৃতিকে লইয়া একটি বাসা ঠিক করিয়া তথায় পৌঁছাইয়া রাখিবে ও নিজেও থাকিবে।" বৈকুণ্ঠবাবু আহ্লাদের সহিত কার্য্যভার লইলেন এবং তৎক্ষণাৎ বাসার জন্য তাঁহার পরিচিত একটী পাণ্ডা পাঠাইয়া দিলেন।

বালক দুটীও বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়াছে। একটির বয়স ৪।৫ বৎসর, অপরটী হবে দুই বৎসরের। বৃদ্ধ বড় সুকৃতিশালী ভাগ্যবান্ সুধার্ম্মিক, কিন্তু অদৃষ্টহীন। পরিচয়ে জানিলাম, বহু-গুণপূর্ণ উপযুক্ত উন্নতিশীল একমাত্র পুত্র অকালে একটী নিরপরাধিনী তীক্ষ্ণবুদ্ধিমতী সরলা অবলাকে আজীবন জন্য জ্বালাকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করিয়া নিজের ইহলোকের জ্বালাপূর্ণ হৃদয় শীতল করিয়াছে।

এ জরা-মরা সংসারের নিয়মই এই, যে যায় সেই ভাল যায়, যে থাকে তাহারই যাতনা। তাই ভাবিলাম, এ সংসার এতই মোহময়! এক জনের জন্য আর এক জন মরে! যার জন্য মরে সে হয়ত পুনঃ সংসারে আসিয়া আর এক জনের জন্য মরিতেছে। এই প্রাকৃতিক নিয়ম কেহ বুঝে, কেহ বুঝে না। কিন্তু তা বলিয়া এই শ্রদ্ধাবান্ নৈষ্ঠিক হিন্দুবৃদ্ধের মানসিক শক্তির হীনতা বোধ হইল না। বৃদ্ধ জানিতে পারিয়াছেন, সংসারে সকলই অলীক— ফাঁকি। যে যার কর্ম্মসাধনা করিতে আইসে, যথাকালে শেষ করিয়া চলিয়া যায়। তখন আর সহস্র চেষ্টায়ও আমার পুত্র, আমার স্বামী, আমার ভ্রাতা বলিয়া কেহ কাহাকেও রাখিতে পারে না। বৃদ্ধের তাহা বিশেষ ধারণা হইয়াছে। কিন্তু তথাপি বৃদ্ধ একটি আসক্তিতে বদ্ধ আছেন।

এই বালক দুটীই ভগবানের আশীর্ব্বাদ-নির্ম্মাল্যরূপে বৃদ্ধের গৃহ শোভা করিতেছে ও দগ্ধ হৃদয় সকল শীতল করিয়া শান্তি দিতেছে। বালক দুটীও বড়ই সুলক্ষণাক্রান্ত সুকৃতিমান্। নচেৎ শত বর্ষ বয়স উত্তীর্ণ হইয়া যায়, তবু এমন শান্তিময় মহাতীর্থ দর্শন অনেকের ভাগ্যে ঘটে না, আর শিশু বালকেও অক্লেশে দর্শন করিতে পারে,—একি কম কথা!

যা হৌক বৃদ্ধকে দেখিয়া আমার মনে বড় আনন্দ অনুভব হইল। কেন হইল জানি না, বৃদ্ধও আমায় দর্শন করিয়াই-দূর দেশের বাঙ্গালী বলিয়াই হউক—কিম্বা ব্রাহ্মণসন্তান বলিয়াই হউক একটু আনন্দ বোধ করিয়াছিলেন। উভয়তঃ সেটী প্রাণে প্রাণে জাগিয়াছিল। বালক দুটী বৃদ্ধের প্রপৌত্র।

তখন আমি তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া ও আগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া

একটু চঞ্চল ও বিচলিত হইলাম। বৃদ্ধ ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন, আমিও আশীর্ব্বাদ করিলাম। কথায় কথায় বৃদ্ধের সহিত আমার বিশেষরূপে আলাপ পরিচয় হইয়া গেল।

তখনও তাঁহাদের বাসার ঠিক হয় নাই। বৃদ্ধের সঙ্গে ঐ সকল স্ত্রী পুরুষ থাকা ব্যতীত আরও ঝি চাকর বামুণ ইত্যাদি সকলেই আছে। ইহাঁদের পরিচয় পাইয়া সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত বড়-লোক বলিয়াই ধারণা হইল। বৃদ্ধের যে এখানে কোন বাসার অভাব ছিল, তাহাও নহে। ইতিপূর্ব্বেই কনখলে থাকিবার স্থান ঠিক ছিল। তথাচ জগৎচালক ভগবান্ বিশ্বকর্ত্তা ইহাঁদের সঞ্চিত কর্ম্ম ক্ষয় করিয়া লইবার জন্যই যেন এরূপ নিরাশ্রয় অবস্থায় আনিয়া উপ-স্থিত করাইয়াছেন। তাই পথিক যুটিল। অবশ্যই সাধ্য মত সাহায্যও হইল। কোথা হইতে কে যোটায় কে জানে? "তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি; সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি।"

এদিকে আমি কয়েকটী স্ত্রীলোক, শিশু দুটী এবং বৃদ্ধকে লইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের ঘাটের উপরিভাগে দণ্ডায়মান হইলাম। সকলেই সেই স্থানের অবস্থা ও পবিত্রসলিলা ভাগীরথী দর্শনে পুলকিত হইলেন, বিশেষতঃ ব্রহ্মকুণ্ডের শীতল জলের শীতল বাতাসে তৎক্ষণাৎ কথঞ্চিৎ তৃপ্তি লাভ করিলেন। তখন সকলেই প্রফুল্লিত হইয়া আপন-আপন ইচ্ছানুসারে সোপান অবতরণ করিতে লাগিলেন। বৃদ্ধ উপরিভাগে চাতালে দাঁড়াইয়া তৎকালীন শোভা দর্শন করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্ব্বে ইহাঁদিগের আগমনবৃত্তান্ত শুনিয়া এবং দৈবকারণে পথমধ্যে মালামাল এবং কয়েকটী সঙ্গী লোক লাকসার ষ্টেশনে পড়িয়া থাকা সংবাদে এবং পূর্ব্ব দিন দিনরাত্রি প্রায় অনাহারে

থাকিয়া সমস্ত পথ রেলে এই বৈশাখী রৌদ্রে আসিয়া এই অপরাহ্নকালে সকলেরই যে কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহা দয়াবান্ পাঠক সহজেই অনুভব করিতে পারিবেন। আমার কিন্তু ইহঁাদিগের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া বড়ই কষ্ট হইয়াছিল।

এই সকল যাত্রিগণ-মধ্যে আবার অধিকাংশই বিধবা। তায় আজ একাদশী—সোণায় সোহাগা হইয়াছে। একাদশী আমাদের দেশের ভাগ্যহীনা হিন্দু বিধবার চিরস্মরণীয় সম্পত্তি,—তাহা বোধ হয় হিন্দু মাত্রেই জ্ঞাত আছেন। তাঁহাদিগের মুখের দিকে চাহিয়া প্রকৃতই সেদিন আমার আন্তরিক কষ্ট হইয়াছিল, তাই ভাবিয়াছিলাম, নিরপরাধিনীদিগের কি দোষে এরূপ সাজা হয়! পুত্র বল, ভ্রাতা বল, বন্ধু বল, সখা বল—তাহাদিগের সে যাতনা কেউ বুঝে না। তাই প্রাণের মধ্যে যেন কে শিখাইয়া দিল। সোপানাবলী অবতরণ সময়ে তাহাদিগেকে বলিয়াছিলাম, "ডুব দিয়ে জল খেলে একাদশীর বাবাও টের পায় না।" আরও বলিয়া দিলাম "এ মহাতীর্থ, এখানে একাদশীতে জল পান করিলে কোন পাপ নাই। এই স্থানে ধূলা পায় আসিয়া স্নান ও পান করিলে যে ফল, তাহার বিনিময়ে সারা জীবন স্নান পান করিলেও সে ফল হইতে পারে না। এই ব্রহ্মকুণ্ডের জলে এরূপ স্নানপানে জীবের অন্তমল নাশ হয়—শাস্ত্রবাক্য। আরও তোমরা বড় লোক, এরূপ হইবার সম্ভাবনা আদৌ ছিল না। যদি বিধিচক্রে প্রকারান্তরে ঘটনা হইয়াছে, সমস্ত ত্যাগী হইয়া একবস্ত্রা হইয়া পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইলে, তবে আর লাভটী ছাড়িও না।

যদি কোন চতুরা ব্রহ্মবাক্য রক্ষা করিয়া থাকেন তিনি সে অবস্থায় সকলের অপেক্ষা জিতিয়াছেন, ইহলোকেই সেই ক্লান্ত

অবস্থায় তৎক্ষণাৎ শীতলতা অন্তরে অন্তরেই বুঝিয়াছেন, পরকালে সদানন্দধামে স্থান পাইবেন। আর যদি কোন অবোধিনী তাহা না করিয়া থাকেন, সমাজের কুহক-বন্ধনেরই হউক কিম্বা কুসংস্কারের বশবর্ত্তিনী হইয়াই হউক, গণ্ডীর সীমা পার না হইয়া থাকিলে তাঁহার তৎকালীন কষ্ট তিনিই পাইয়াছেন, আরও পাইবেন।

আমি ব্রহ্মকুণ্ড হইতে এক ঘটী জল লইয়া উপরে আসিলাম। বৃদ্ধের হস্তে একটী গেলাস ছিল, তাহাতে ঢালিয়া দিতে দিতে গেলাসটী শীতল হইয়া উঠিল দেখিয়া বৃদ্ধ হাসিলেন, কিঞ্চিৎ পান করিয়া চোখে মুখে ছিটাইয়া দিয়া বৃদ্ধের যেন "সদ্যঃপাতকসংহন্ত্রী" কথাটার সার্থকতা বোধ হইল। বৃদ্ধ প্রথম ব্রহ্মকুণ্ডের জল স্পর্শ করিয়াই চমৎকৃত ও বিস্মিত হইলেন এবং আম্মার দিকে চাহিয়াই হাসিয়া বলিলেন, তাই বটে, এরূপ বুঝি আর কোথাও নাই। তখন গামছাখানি ভিজাইয়া দিলাম। প্রাচীন মস্তকোপরি দিয়া, আনন্দে দন্তবিহীন সুন্দর মুখভরা হাসি হাসিয়া বলিলেন "বা! কি শীতলতাময় পবিত্র জল।"

তখন বৃদ্ধকে ঠাণ্ডা করিয়া, রাখিয়া, নিজেও ঘুরিয়া ঘুরিয়া বড় ক্লান্ত হইয়াছি—একটু শীতল হইব মানসে ব্রহ্মকুণ্ডে নামিয়া হস্ত মুখ ধৌত করিয়া জলপানে শীতল হইলাম।

সঙ্গিনী স্ত্রীলোকগণ ইতিপূর্ব্বেই স্নান সমাপন করিয়া মৎস্য সহ খেলা আরম্ভ করিয়াছেন। আমি তাঁহাদিরের সেই নব আনন্দ দেখিয়া জিজ্ঞাসা না করিয়া আর থাকিতে পারিলাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম "কেমন! এতে শ্রান্তি ক্লান্তি দূর হইয়া শীতল হইয়াছেন ত?" কে কার কথার উত্তর দেয়, সকলে আপন ভাবেই বিভোর। সকলের মুখেই হাসি- হৃদয় প্রফুল্ল। এরূপ জলের

স্বাভাবিক শীতলতা উহাঁদের মধ্যে বোধ করি আর কেহই কখন দেখেন নাই বা অনুভব করেন নাই। পরন্তু স্বচ্ছ জলে নির্ভীক মৎস্য-গণ কোমলাঙ্গীগণের কোমলাঙ্গ ঠেলিয়া ঘেষিয়া আনন্দে চলিয়া যাইতেছে, একবারও তাঁহাদের কড়া চাপান ও বাটনা-করা করকমল দেখিয়া দেশের মৎস্যের মত ভীত বা চঞ্চল হইতেছে না। কিন্তু মাছ দেখিয়া রমণীগণের মুখে আর হাসি ধরে না।

উপর হইতে দেখিয়া দেখিয়া বৃদ্ধও ধীরে ধীরে সিঁড়ি নামিয়া আসিলেন। জলের নিকটে বসিয়া মাছ ও জল দেখিয়া বৃদ্ধের মুখে যেন প্রভাতী জ্যোৎস্নার মত হাসি খেলা করিতে লাগিল। এদিকে সকলের চেয়ে আনন্দ হইতেছে বালক দুটীর। তাহাদের উভয়ের ভাব উভয় রকম! বড়টী সেই প্রকাণ্ড মৎস্যের লেজ ধরে, সে মালসাট মারিয়া জল ছিটাইয়া দিয়া চলিয়া যায়, সেই জল চক্ষে লাগিয়া কখন কাঁদে, কখন হাসে। আর ছোটটী তাহার অভিভাবিকাদিগের কোলে থাকিয়া মাছের খেলা ও মৃদু গমন দেখিয়া আনন্দে কোলের উপরেই লম্ফঝম্প মারে। সে বুঝুক না বুঝুক কোলে এক চোট বুঝিয়া লয়।

"তোমরা খেলা কর, আনন্দ কর, আমি তোমাদের বাসার সংবাদ লইয়া আসি।" এই বলিয়া উপরে উঠিলাম। সদরঘাটের পরে দক্ষিণ দিকে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট হইতে যে রাস্তা বাম ধারে বেলে-পাহাড় এবং রেলওয়ে সুড়ঙ্গ ফেলিয়া বরাবর ভীমগড় অভিমুখে গিয়াছে, ঐ রাস্তায় কিছু দূর গেলে ডান ধারে একটী ঘাট দেখা যায় —রাস্তার উপর হইতে অনেকগুলি সিঁড়ি পর পর শ্রেণীবদ্ধ হইয়া ব্রহ্মকুণ্ডের শেষ ভাগে গঙ্গাগর্ভে খাড়াভাবে নামিয়াছে। ঐ ঘাটের মঝের সিঁড়ির উপর হইতে দক্ষিণ ধারে একটী ফটক ও দর-

ওয়াজা। ঐ দরওজা উত্তীর্ণ হইলেই প্রকাণ্ড একটী ঘরের মধ্যে আর একটী বড় দরওজা। ঐ দরওজা পার হইলেই প্রকাণ্ড একটী উঠান বা চত্বর। তাহার চারিধারে সারিসারি যাত্রী-বাসোপযোগী অনেকগুলি ঘর, এক ধারে রান্নাঘর, বৈঠকখানা, স্বতন্ত্র স্থানে পায়খানারও অতি সুবন্দোবস্ত আছে। বাসাটী বড় মনোরম; গঠন-পরিপাট্য এমন চমৎকার যে, বাহিরে ব্রহ্মকুণ্ডের মধ্যে বা অপর পার হইতে দৃষ্টি করিলে তেতালা বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু ভিতরে একতালা। ছাত হইতে ব্রহ্মকুণ্ডের জন-কোলাহল শুনা ও দেখা যায়। বাটীটী নির্জ্জন ও শান্তিপ্রদ বটে। বিশেষ একটী সুবিধা, চত্বর বা উঠানের পূর্ব্বদক্ষিণ কোণ হইতে একটী ঘরের মধ্য দিয়া ছাতে উঠিবার সিঁড়ি আছে। তৎপার্শ্বেই খাড়াভাবে ১০।১২টী সিঁড়ি একটী ছোট ঘাটরূপে গঙ্গার উপর ব্রহ্মকুণ্ড মধ্যে নামিয়াছে। এটী বড়ই চমৎকার সুবিধাজনক। বাটীটী বৃদ্ধের অদৃষ্টগুণেই সুন্দর ও শান্তিপ্রদ হইয়াছে।

তখন সকলকে ঘাট হইতে আনিবার জন্য লোক পাঠাইলাম। কর্ত্তা ও অপরাপর স্ত্রীলোক কয়েকটী শিশুদ্বয় সহ বাসায় আসিলেন। বিধবাগণ সকলেই তখন ঘাটে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, আর ইতস্ততঃ নূতন ধরণ, নূতন স্থান, নূতনরূপ মৎস্যের খেলা দেখিতেছেন।

বৈকুণ্ঠ বাবু ইতিপূর্ব্বেই যাত্রীদিগের অন্যান্য লোকজন, বিছানা জিনিষাদি যাহা সঙ্গে ছিল সমস্ত বাসাবাটীতে লইয়া উঠাইয়াছেন। অন্য কোন অসুবিধাই হয় নাই। সন্ধ্যা প্রায়াগতা দেখিয়া বৈকুণ্ঠ বাবুকে আমি আশ্রমে যাইতে বলিলাম। আমি ঘাটে আসিলাম।

তখন সকলের পূজাদি হয় নাই। একটী মাত্র রমণী সকলকে কুণ্ড মধ্যে রাখিয়া সটান সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

তখন আমি ব্রহ্মকুণ্ড মধ্যেই দাঁড়াইয়াছিলাম। দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি উপরে উঠিয়া আসিলাম। তিনি এখনই বাসায় যাইবেন আকাঙ্ক্ষা জানাইলেন। যদিও বাসা বেশী দূর নয়, তথাচ নূতন স্থান নূতন পথ বলিয়া পুনরায় তাঁহার সহিত বাসা দেখাইয়া দিতে আসিতে হইল। আসিতে আসিতে তাঁহার অবস্থা ও তৎকালীন মলিন মুখাকৃতি দেখিয়া বড় কষ্ট হইতে লাগিল। পূর্ব্বে মনে করিয়াছিলাম, তাঁহাকে কিছু বলিব; কিন্তু রমণীর অবস্থা দেখিয়া আর তাহা হইল না। হাঁটিতেও যেন তাঁহার কষ্ট হইতেছে। আজ দুদিন প্রায় উদরে অন্ন জল নাই। তায় আজ আবার একাদশী হায়! বাসায় যাইয়াও একটু জল পানের আশা নাই। ভগবান্ ইহাদিগকেই কি মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতারূপিণী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

হিন্দু বিধবা মরিতে স্বীকার, তবুও রেল গাড়ীতে বা অপবিত্র ভাবে একবিন্দু জল পান করিতে ও রাজী নহেন।

কিন্তু তাহা না বুঝিয়া রূপ রূপ করিয়াই সকলে মরে। এই রূপই স্ত্রীলোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সকলেই ভাবে রূপই কামিনীকুলের মহামূল্য ধন, রূপই কামিনীকুলের সর্ব্বস্ব; সুতরাং মহিলাগণ যাহা কিছু কাম্য বস্তু প্রার্থনা করেন, লোকে কেবল রূপের বিনিময়েই দিতে যায়। ইহাতেই মনুষ্যসমাজের কলঙ্ক বারাঙ্গনাবর্গের সৃষ্টি। ইহাতেই পরিবার মধ্যে স্ত্রীলোকের দাসীত্ব।

অস্থায়ী সৌন্দর্য্যই যোষিদ্‌গণের একমাত্র সম্বল, সংসারসাগর পার হইবার একমাত্র কাণ্ডারী, একথা আর আমি শুনিতে চাই না। অনেক দিন শুনিয়াছি। শুনিয়া কাণ ঝালাপালা হইয়া গিয়াছে। শুনিতে আর পারি না। আমি শুনিতে চাই যে নারী জাতির রূপাপেক্ষা, শত গুণে, সহস্র গুণে, লক্ষ গুণে, কোটী

গুণে মহত্ত্ব গুণ আছে। আমি শুনিতে চাই যে, তাঁহারা মূর্ত্তিমতী সহিষ্ণুতা, ভক্তি ও প্রীতি।

যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কষ্ট সহ্য করিয়া জননী সন্তানের লালন পালন করেন, যাঁহারা দেখিয়াছেন যে, কত যত্নে মহিলাগণ পীড়িত স্বামী এবং আত্মীয়বের্গর সেবা শুশ্রূষা করেন তাঁহারা কামিনীকুলের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাইয়াছেন। যাঁহারা কখন কোন সুন্দরীকে পতিপুত্রের জন্য জীবন বিসর্জ্জন ধর্ম্ম ও বাহ্য সুখ বিসর্জ্জন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কিয়দ্দূর বুঝিয়াছেন যে, কিরূপ প্রীতি ও ভক্তি স্ত্রীহৃদয়ে বসতি করে।

যখন আমি উৎকৃষ্ট যোষিদ্‌বর্গের বিষয়ে চিন্তা করিতে যাই, তখনই আমার মানসপটে সহমরণবৃত্তা সতীর মূর্ত্তি জাগিয়া উঠে। আমি দেখিতে পাই যে, চিতা জ্বলিতেছে; পতির পদ সাদরে বক্ষে ধারণ করিয়া প্রজ্বলিত হুতাশনমধ্যে সাধ্বী বসিয়া আছেন। আস্তে আস্তে বহ্নি বিস্তৃত হইতেছে, এক অঙ্গ দগ্ধ করিয়া অপর অঙ্গ স্পর্শ করিতেছে। অগ্নিদগ্ধা স্বামি-চরণ ধ্যান করিতেছেন, মধ্যে মধ্যে হরিবোল বলিতে বলিতেছেন বা সঙ্কেত করিতেছেন। দৈহিক ক্লেশ-পরিচায়ক লক্ষ নাই,—আননপ্রফুল্ল। ক্রমে অগ্নিশিখা বাড়িল, জীবন মায়িক দেহ ছাড়িল, কায়া ভস্মীভূত হইল। ধন্য সহিষ্ণুতা! ধন্য প্রীতি! ধন্য ভক্তি! ধন্য ধন্য হিন্দুবিধবা!

যখন আমি ভাবি যে, কিছুদিন হইল আমাদিগের দেশীয়া অবলা কোমলাঙ্গী গৃহিণীগণ কোমলাঙ্গী হইয়াও এইরূপে মরিতে পারিত, তখন মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়, তখন আমার বিশ্বাস হয় যে, মহত্ত্বের বীজ আমাদিগের অন্তরেও নিহিত আছে। কালেও

কি আমরা মহত্ত্ব দেখাইতে পারিব না? হে বঙ্গ পৌরাঙ্গনাগণ! তোমরাই এই বঙ্গদেশের সার রত্ন।

তখন তাঁহাকে বাসায় পৌঁছাইয়া দিয়া বৃদ্ধের নিকট বিদায় হইলাম। মনে করিলাম, এইবার কনখল হইতে ঘুরিয়া আসিতে পারিলেই পুনর্জ্জন্ম রোধ করিতে সক্ষম হইব। আশা করিয়া পর দিবস প্রভাতেই যাত্রা করিলাম।

কনখল্ যাইতে হইলে মায়াপুর হইয়া যাইতে হয়। মায়াপুর ও কনখলের মধ্যস্থলে, ইংরাজ রাজার অপূর্ব্ব কীর্ত্তি গঙ্গার কেনেল বা খাল দেখিতে পাইলাম। ধন্য ইংরাজের বুদ্ধি, অধ্যবসায় ও কৌশল। নদীর প্রবাহ ফিরাইয়া অন্য দিকে চালিত করা মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত, তাহা পূর্ব্বে অনুভব হয় নাই। তাই ভগবানের স্তব করিবার সময় নদী সকল যাঁহার ইচ্ছায় আপন আপন মার্গে প্রবাহিত হইতেছেন এইরূপ বিশেষণ দ্বারা ভগবান্‌কে বিশেষিত করিয়া থাকি। কিন্তু সেই নদীপ্রবাহকেও ইংরাজেরা এরূপে যথা তথা পরিচালিত করিতেছেন। পৌরাণিক প্রসঙ্গে সকলেরই জানা আছে, রাবণ রাজার অধীনে ইন্দ্রাদি দেবগণকে যেমন তাহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া চলিতে হইয়াছিল, এই স্থানে ইংরাজ বাহাদুরের নিকট এই প্রবল প্রবাহিনী গঙ্গাদেবী—যিনি একদিন ঐরাবতকেও বিপ্লাবিত করিয়াছিলেন—আজ বিনা আপত্তিতে তাঁহাকেও বশ্যতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ধন্য কলি, তব মহিমা! তখন "ক্বচিচ্ছিন্না ক্বচিদ্ভিন্না যদা সুরতরঙ্গিণী" এই ঋষিবাক্যটী মনে উদয় হইতে লাগিল।

হরিদ্বারের কিছু দক্ষিণে গঙ্গা যেখানে পূর্ব্ববাহিনী হইয়াছেন, সেই স্থানটির নাম মায়াপুর। নীলধারা গঙ্গার একটী শাখা। নীল-

ধারার তীরে সর্ব্বনাথের মন্দির, ইহার অদূরে বেণ রাজার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের মতে এই বেণ রাজাই সঙ্কর জাতির সৃষ্টি করিয়াছিলেন। নিকটে নিকটে আরও তিনটি মন্দির আছে। একটিতে নারায়ণ, আর একটিতে ভৈরব, ও তৃতীয়টীতে মায়াদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি সংস্থাপিত। মায়ার মূর্ত্তি ত্রিশীর্ষ, বুঝি গুণত্রয়ের দ্বারা তিন-শির হইয়াছেন। চারিটি হাত, হয় ত চারি বেদের পরিকল্পনা। যাহা হউক, সে সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি কনখলে গমন করিলাম। কনখলে সতীকুণ্ড, সতীঘাট ও দক্ষেশ্বর শিবই প্রধান দর্শনীয়। তথা হইতে অপরাহ্নেই হরিদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

দেবদূত।

উদাসময়ে উদাস প্রাণে কিছুই ভাল লাগিতে লাগিল না, তাই সে দিন বিকাল বেলা বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রহ্মকুণ্ডের উত্তর দিকের রাস্তায় রেলওয়ে সুড়ঙ্গের নিকট দিয়া অনেক দূর গমন করার পর বামদিকের পর্ব্বতের গায়ে সংলগ্ন কয়েকটী মন্দির ও সম্মুখে একটী কুণ্ড দেখিতে পাওয়া গেল। অবগত হইলাম উহারই নাম ভীমকুণ্ড বা ভীমগড়। ঐ কুণ্ডের মধ্যে প্রকাণ্ড একটী মহাদেব দেখা গেল। উহাঁর নাম ভীমেশ্বর মহাদেব। পঞ্চপাণ্ডব যখন মহাপ্রস্থান করিয়াছিলেন, তখন এই স্থানে শিবপূজা করেন এবং ধনুর্ব্বাণ অস্ত্রাদি এই খানেই ত্যাগ করিয়া যান। মধ্যম পাণ্ডব ভীম স্বীয় হস্তস্থিত গদা এই স্থানেই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানটি ভীমগড় বা ভীমকুণ্ড বলিয়া প্রসিদ্ধ। এ প্রদেশে এইরূপ প্রবাদ আছে বলিয়াই যাত্রিকগণ এই স্থানে আসিয়া ঐ কুণ্ডে স্নান, মহাদেব দর্শন ও পূজাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, দ্রৌপদী তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জল চাহিলে ভীম ঐ স্থানে পদাঘাত করায় ঐ কুণ্ডের উৎপত্তি হইয়াছে। নানা মুনির নানা মত। পাহাড়ের নিম্ন দেশে গাত্রে সংলগ্ন যে কয়েকটী মন্দির আছে, তাহার একটীতে উঠিয়া দেখিলাম, প্রাচীরগাত্রে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্ত্তি ও অস্ত্রাদি অঙ্কিত রহিয়াছে। অপর দু একটী মন্দিরে দেবদেবী মূর্ত্তিও আছে।

বোধ হয় ইহা পাণ্ডবদিগের যাত্রী ভুলাইবার পন্থা। আমি ঘুরিয়া ফিরিয়া এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ভীমগড়ের চারিধারে গোলাকৃতি রূপে যে সোপানাবলি শোভা পাইতেছিল, তাহারই উপর বসিয়া প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শন করিতেছিলাম। স্থানটি বড়ই মনোরম, পার্শ্বে প্রকাণ্ড সু-উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী প্রাচীরবৎ চলিয়া গিয়াছে। সম্মুখে ভীমগড় বা ভীমকুণ্ড। কুণ্ডটী জলে পরিপূর্ণ, তৎপরেই সদর রাস্তা। ভীমকুণ্ড হইতে এই রাস্তার বাহির হইতে হইলে আউধ-রোহিলখণ্ড রেলওয়ের রাস্তার পোলের নিম্ন দিয়া যাইতে হয়। দক্ষিণ দিকে ট্যানেল বা রেলওয়ে সুড়ঙ্গ দেখা যায়। রাস্তার পরেই সমতলভুমি, তৎপরেই পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গা কল্‌ কল্‌ নিনাদে ব্রহ্মকুণ্ডাভিমুখে চলিয়াছেন। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল, স্থানটীও একপ্রকার নির্জ্জন, আমার দগ্ধ প্রাণ হিমালয়ের শীতল বাতাসেও শীতল হইতেছে না। আমি স্থির হইয়া বসিয়া কোথায় যাই, কি করি, কেন আসিলাম, কে আনিল—এইরূপ চিন্তা করিতেছি, সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে, এমন সময় পার্শ্বস্থিত পর্ব্বতোপরি একটী সুললিত কণ্ঠধ্বনি শুনিতে পাইলাম। আমি আশ্চর্য্যন্বিত হইয়া সেই পর্ব্বতের উর্দ্ধদিকে চাহিলাম; কিন্তু সেই স্থানের পাহাড় অতি উচ্চ বলিয়া কিছুই দেখিতে পাইলাম না। মনে হইল এরূপ দুরারোহ জনশূন্য পর্ব্বতোপরি এ পূর্ণ সন্ধ্যাকালে কে এমন মধুর কণ্ঠে গান করে! কিন্তু গানটির তান ও প্রেমপূর্ণ পদাবলি আমার কর্ণকুহরে সুধা বর্ষণ করিতেছিল। আমি গানের দুটি চরণ শুনিয়াই মোহিত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এ স্বর আমার পরিচিত, পূর্ব্বে যেন এ স্বর কোথায় শুনিয়াছি। মুহূর্ত্তেক চিন্তার পরেই স্মরণ হইল, আমার সেই কাশীধামের

উপদেষ্টা সাধু যুবক। গান শুনিয়াই প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিল। ঊর্দ্ধদৃষ্টে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া রহিলাম, সে স্থানে পাহাড় গাত্রে উঠিবার এমন কোন সুবিধা নাই যে, আমি উঠিয়া গিয়া দেখা করি এবং এখানে আসিয়াছি জানাইয়া আসি। সুতরাং নিরুপায় হইয়া গানটির সমস্ত চরণগুলি শুনিতে লাগিলাম।

(গীত)

আত্মহারা প্রাণে, প্রেম সুধা পানে,
ভোগতৃষ্ণা যার মিটেছে।
মর্ম্মস্পর্শী মহাপ্রেম, ফল্‌গু নদী সম,
অন্তরে তাহার রয়েছে॥
যে মধুপ মধু পানেতে মগন, ঘুরে সে মরে না করে না গুঞ্জন
চিদানন্দময় হয়েছে।
আত্মভাবে আত্মরূপে. ত্যজে মায়ার ভ্রান্ত কূপে,
আনন্দসাগরে ভেসেছে॥
মনবীণা বেঁধে প্রেমরূপ তারে, ঐক্যতান তানে প্রণব ঝঙ্কারে,
ব্রহ্মময়ী সুরে, মহাশূন্য ভেদ করি—
প্রতিধ্বনি ওঙ্কারে মাতোয়ারা হয়ে রহেছে॥

গান শেষ হইল, বুঝি আমার আশা ভরসাও শেষ হইয়া গেল তখন আমি যুবকের সেই প্রাণ মন-মুগ্ধকর রূপ চিন্তা করিতে করিতে ব্যাকুলিত হইয়া উঠিলাম। সেই মূর্ত্তির নিকট আমার অন্তরাত্মা যেন বলিল, "ভাই! এ মায়িক জগতে আসিয়া আমি বড়ই বদ্ধ হইয়াছি, আমার আর কেহ নাই; একবার তোমাকে পাইয়াছিলাম, ফাঁকি দিয়া পলাইয়াছ; ভাই! তুমিও কি

আর একবার শেষ দেখা দিবে না? এ জগতে তবে শতজন মধ্যে এক জনকে একজন দেখিয়াই কেন ভালবাসে?” এই বলিয়া নয়নজলে ভাসিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, সেই পাহাড়ের উপরিভাগে, সেই স্থানের বৃক্ষ সকল নড়িয়া উঠিল এবং কিছুক্ষণ পরেই ঐ উচ্চ পাহাড়ের গাত্রসংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৃক্ষ সকল নড়িতে লাগিল। বোধ হইল যেন একটী মনুষ্যমূর্ত্তি নামিয়া আসিতেছে, আমি অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এই স্থানের পাহাড় এত উচ্চ যে; আকাশ পানে দৃষ্টি না করিলে ঐ পর্ব্বতের উচ্চদেশ দৃষ্টিগোচর হয় না, এবং কোন ক্রমেই সেই দুর্গম বন্ধুর শৈলগাত্রে জীবকুল উঠিতে নামিতে পারে না; অতএব এরূপ পথে মনুষ্যমূর্ত্তি নামিয়া আসিতেছে কি প্রকারে?—আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। একদৃষ্টে সেই মূর্ত্তির দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া আছি, এমন সময়ে দেখিলাম, ঐ মূর্ত্তি সমতল ভূমির অল্প বাকী থাকিতে থাকিতে উল্লম্ফন পূর্ব্বক ভূমিতে অবতরণ করিয়া হাসিতে হাসিতে আমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং হস্ত ধারণ করিলেন।

তখন, রাহুগ্রস্ত পূর্ণচন্দ্রের পুনঃ প্রকাশ দর্শনে জীবময়ী ধরিত্রীর যেমন আহ্লাদ হয়,—স্বহস্তরোপিত মৃতকল্প রসালতরু পুনর্ব্বার নবপল্লববিশিষ্ট হইয়া সু-রসাল ফল প্রসব করিলে, রোপকের যেমন আহ্লাদ হয়,—প্রাবৃট্‌কালে আকাশমণ্ডল নবজলধরাবৃত দেখিলে কৃষকের যেমন আহ্লাদ হয়,—প্রভাতে উঠিয়া বহুকালের মরা নালঞ্চে ফুল ফুটিতে দেখিলে মালিনীর যেমন আহ্লাদ হয়,—রজনী প্রভাতা হইতে দেখিলে মধুলোলুপ মধুকরের যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও ঠিক সেইরূপ হইল।

বুঝিলাম সাধু অধ্যবসায় বিফল হয় না—যথাসময়ে অমৃত ফল

প্রসব করে। তখন আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই সৌম্যমূর্ত্তি যুবককে দেখিয়াই চিনিলাম এবং মনে মনে চিন্তা করিলাম—তবে এ যুবক কি মনুষ্য নয়? দেব পুরুষ!

এমত সময়, যুবক যেন অফুরন্ত স্বর্গীয় হাসি হাসিয়া আমাকে বলিল "ভাই! কি ভাবিতেছ? কোন্ দিকে কত অগ্রসর হইলে? খুঁজিয়া পৌঁছার খবর কারু কাছে কিছু মিলিল কি?" আমি অবাক্ অচল ধীর নিস্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া রহিলাম, কিছুই বলিবার ক্ষমতা হইল না। তখন আমার সেই কাশীর মহাপুরুষের কথা মনে পড়িল।

আমি। ভাই, সারা জীবন ঘুরিলাম, কোথাও ত সে সংবাদ মিলিল না। এ ভবসংসারের কোলাহল আর ভাল লাগিতেছে না। জীবনের অধিকাংশ সময় বৃথায় কাটিল। সে সাধুরূপী মহাপুরুষের দর্শন ত পাইলাম না। তাই ভাবিতেছি, এখন যাই কোথায়,—করি কি?

যুবক হাসিয়া বলিল ভাই, উতলা হইওনা। তোমার মায়ার বন্ধন মোচন হইয়াছে, তাই আমি দেখা দিয়া আত্মপরিচয় দিতে আসিয়াছি। রজনী প্রভাতেই তোমার আকাঙ্ক্ষিত সাধুদর্শন লাভ হইবে। তাঁহাকে রাখিবার জন্যই আমি এই মর্ত্তধামে আসিয়াছি। এতদিন তিনিও এ ধামে ছিলেন না। তাই সাক্ষাৎ পাও নাই।"

আমি অবাক্ হইয়া এতক্ষণ সেই দেবোপম যুবকের অলৌকিক কথা শুনিতেছিলাম এবং তাহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল,—যুবক কখনই এ ধামের মনুষ্য নহে। তখন আনন্দে যুবকের গলদেশ জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ খুলিয়া কাঁদিলাম এবং বলিলাম "ভাই, এবার, তোমার পরিচয় না দিলে আমি ছাড়িতেছি না আর আমাকে ফাঁকি দিও না।"

যুবক। ভয় নাই। আমার সঙ্গে আইস। এই পাহাড়ের উপরিদেশে যাইয়া সমস্ত বলিব। এখনও সঙ্গী হইবার সময় হয় নাই। হইলেই তোমাকে লইয়া যাইব।

আমি। পাহাড়ে উঠিব কি উপায়ে?

যুবক। আমার সঙ্গে সঙ্গে আইস।

যুবক তখন অগ্রবর্ত্তী হইলেন, আমি তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চৎ মন্ত্রাকৃষ্টের ন্যায় ভীমগড় হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মকুণ্ড অভিমুখে চলিলাম। তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। জ্যোৎস্না রাত্রি, চাঁদ উঠিয়াছে, প্রকৃতি গম্ভীরভাব ধারণ করিয়াছেন। আমরা উভয়ে যাইতেছি। কিছুদূর গিয়া রেলওয়ে সুড়ঙ্গের নিকট উপস্থিত হইলাম, ঐ স্থান হইতে একটী ক্ষুদ্র পথ পাহাড়ের গাত্র দিয়া উর্দ্ধদেশে উপরে উঠিয়া গিয়াছে। সাধু যুবা অগ্রে অগ্রে সেই পথে উঠিতে লাগিলেন, আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলাম। বহুক্ষণ পরে ঘুরিয়া ফিরিয়া উভয়ে ঐ রেলে পাহাড়ের শীর্ষদেশে উঠিলাম এবং সেখানে একটী মন্দির দেখিতে পাইলাম। যুবক আমাকে বসিতে বলিলেন।

তিনিও বসিলেন। আমি তথায় যাইয়া চারিদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম বহু উচ্চে উঠিয়াছি। কত উচ্চে, অনুমান হইল না; তবে চাঁদের কিরণে নিম্নস্থ গঙ্গা দেখিয়া বোধ হইল যেন রজক-ধৌত একটী জরদা রঙের থান কাপড়ের ন্যায় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া আছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল।

তখন যুবক বলিতে লাগিল "ভাই, আমার পরিচয় জানিতে চাহিয়াছ, এখন তুমি জানিবার সম্পূর্ণ অধিকারী; তাই আজ উপযাচক হইয়া তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। তোমার

কর্ম্ম প্রায় শেষ হইয়াছে। এখন যে কয়েক দিন থাকিবে, তাহা দেবদূত দর্শনে ও স্পর্শনে জীবন্মুক্তের ন্যায় ভবসংসারে বিচরণ করিবে। অতএব আর ঘুরিয়া বেড়াইও না, ফিরিয়া গৃহে যাও। সেখানে গিয়া অবশিষ্ট কয়েক দিন সাধুকার্য্যে ও সতী-সেবায় কাটাইতে পারিলে যথাসময়ে নিয়মিত কাল আসিয়া তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তখন ধর্ম্মরাজ স্বয়ং গিয়া তোমাকে পরলোকে আনন্দধামে লইয়া যাইবেন। তথায় পুনরায় আমার সহিত দেখা ও বাস করিতে পারিবে।"

সদানন্দময় যুবকের মুখে সদাই হাসি, তখন হাসিতে হাসিতে বলিল "আমি বহুকাল হইতে তোমার ইহপরলোকের সংবাদ জানিবার বাসনা দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গে অদৃশ্য ভাবে ঘুরিতেছিলাম। যখন সেই ইচ্ছা ক্রমে ক্রমে তীব্রাকারে পরিণত হইতেছে দেখিতে পাইলাম এবং হৃদয়-আসন সরল পবিত্র ও পরিষ্কার হইয়াছে দেখিলাম, তখন সেই চন্দনা নদীতীরে, বটবৃক্ষমূলে "তরু বল্‌রে বল্" শব্দব্রহ্মরূপে অলক্ষ্যে তোমার হৃদয়-আসন অধিকার করিয়া বসিয়াছিলাম, তাই তুমি তখন এক দৃষ্টে কি দেখিতেছিলে বুঝিতে পার নাই। সেই দিন হইতে আমাদিগের আপনার জন হইয়াছ এবং এত দূরদেশে আসিতে সক্ষম হইয়া আজ প্রত্যক্ষ দর্শন পাইলে।"

ভাই! ঐ যে উচ্চ পাহাড়ের শিরোদেশে আর একটী বলবান্ সুপুরুষ দেখিতে পাইতেছ, (অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা দর্শন) উহার নাম সত্য, এবং আমার নাম বিবেক। আমরা দুটী ভাই আনন্দময় বিশ্বেশ্বরের সন্তান। পিতৃদেবের আদেশক্রমে সংসারকারাগারে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই। দেখ ভাই! অপরাধী সন্তানগণের উপরেও মঙ্গলময় পিতার কিরূপ মঙ্গল ইচ্ছা। তাই আমরা উপযুক্ত স্থান

দেখিলেই সেখানে অবস্থান করি। তবে দুঃখের বিষয়, সকলে আমাদিগকে আদর করে না। আমরা তাই অধিক সময় সদানন্দ ধামেই বাস করি।

আমি আরও উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, ঠিক আমার সম্মুখস্থ যুবকমূর্ত্তির মত আর একটী সুপুরুষ মূর্ত্তি সেই উচ্চ স্থানে স্থির হইয়া বসিয়া আছেন। আমি মনে মনে ভক্তিভাবে প্রণাম করিলাম। তখন সেই প্রিয়দর্শন যুবক হঠাৎ হাস্যমুখে ছায়ার ন্যায় অন্তর্হিত হইলেন। আমি সেই অলৌকিক ব্যাপারের কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

যুবা। আমি দেবদূত—বিবেক নামে পরিচিত। এই মর্ত্ত্যধামে সরল ও পরিষ্কার হৃদয়বিশিষ্ট জীব পাইলেই তাহার হৃদয়ে বৃত্তিরূপে বাস করি এবং তাহাকে এই সংসারকারাগার হইতে পলাইবার সহজ উপায় বলিয়া দেই। এই কলিকালের মনুষ্যগণ মধ্যে যাহারা সরল ও সাধুপ্রকৃতি, এবং ঐ যে আমার ভ্রাতাকে দর্শন করিলে—যে যে ব্যক্তি উহাকে চিন্তা বা আদর করে, তাহারাই তোমার ন্যায় আমাদিগের প্রত্যক্ষ দর্শন পায়। আর কলুষিতহৃদয় সত্যবিদ্বেষী ক্রূরমতি ব্যক্তিগণ আমাদিগের ছায়া পর্য্যন্ত দর্শন করিতে সক্ষম নহে।

আমি। ভাই, তুমি জীবের এত সহায়, তবে কাশীধামে আমাকে পরিচয় না দিয়া এতসময় বৃথা নষ্ট করাইলে কেন?

বিবেক। এরূপ দর্শন দিয়া পরিচয় দিলে তোমার সঞ্চিত কর্ম্মক্ষয়ের বিঘ্ন হইত, তুমি আত্মাহঙ্কারী হইলেও হইতে পারিতে। প্রত্যেক মোহগ্রস্ত মনুষ্যহৃদয়েরই ধারণা যে, আমি সরল, সাধু, ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান এবং সত্যসেবক।

আমি। জীবনের এ ভ্রম দূরীভূত হয় কখন?

বিবেক। আমিত্বের নাশ হইলে,—তোমার ন্যায় একান্ত চেষ্টায় মায়ার বন্ধন কাটাইতে পারিলে,—এ জগতে ঠকিলে পর-জগতে জিতিবে—এই বিশ্বাস দৃঢ় হইলে। এই যে মায়িক সংসার দেখিতেছ, এটী কেবল বিপ্লাবিত ও বিনিময়।

আমি। ভাই, কাশীধামে ব'লেছিলে, তুমিও নাকি সে মহা-পুরুষের জন্য কেঁদে কেঁদে ফের। তিনি কে?

বিবেক। (ঈষৎ হাসিয়া) স্বয়ং ধর্ম্মরাজ। সংসারকারাবাসী-জীব যাঁকে কৃতান্ত বা যমরাজ বলিয়া ভীত হয়।

আমি। তবে তাঁর দর্শন আর কবে পাই?

বিবেক। সেই পদ্মলোচন ঠাকুরের ধৃ ধাতুর শব্দার্থ জ্ঞানতঃ প্রত্যক্ষ বোধ হইলে, সুধু মুখস্থ চলিবে না।

আমি। তাঁকে ত ধ'রেই আছি।

বিবেক। তাই কাশীধামে দশাশ্বমেধের ঘাটে যে দিন প্রথম আমার দর্শন পাইয়াছ, সেই দিন তাঁহারও দর্শন পাইয়াছিলে, চিনিতে পার নাই, ছদ্মবেশে তোমাকে দর্শন ও উপদেশ দিয়া অন্ত-র্ধান হইয়াছিলেন। তিনি তোমার উপর প্রসন্ন আছেন, সময় হইলে তিনি স্বয়ং গিয়া তোমাকে আনন্দধামে লইয়া আসিবেন। কোন চিন্তা নাই।

আমি। ভাই, তবে তোমার কৃপাতে আমার শেষ আকাঙ্ক্ষা কি পূর্ণ হইবে? বার বার জরা মরার হস্ত হইতে কি অব্যাহতি পাইব? এ সংসারের ব্যাপার ত এতকাল বিশেষরূপে প্রত্যক্ষ করিলাম। নররূপী মানুষের চিত্তও ব্যবহার ত এতকাল ধরিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া রকমওয়ারী দর্শন করিলাম। একাকৃতিতে পশু দেখিলাম, মানুষ দেখিলাম, দেবতাও দেখিলাম। কিন্তু সন্দেহ

দূরীভূত হইল না। এরূপ হয় কেন? সকল মানুষ সমান দয়ালু ও নিষ্ঠুর হয় না কেন? এ ছাড়া কি আরও রাজ্য আছে, স্থান আছে, মানুষ আছে—ধারণা বা বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।

বিবেক। তোমাকে কাশীধামেই বলিয়াছি—এই বিশ্বনিয়ন্তার নিগূঢ়াভিসন্ধি ক'জনে ধারণা করিতে পারে? জগদীশ্বর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই যে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল সৃজন পালন ও লয় করিতেছেন, তাহার নিগূঢ়াভিসন্ধিই বা কয় জন বুঝিতে সক্ষম হয়? "এই বিশ্ব-সংসারে কোথায় যে কি দিয়া কি ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন এবং ইহার কোথায় কোন্ সময় কোন্ কারখানায় কি ভাবে ঢালিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া বিশ্বকর্ম্মার কার্য্যনৈপুণ্য দেখাচ্ছেন, তাই বা কয় জনে অনুভব করিতে পারে? যে যতটুকু সীমা মধ্যে আছে, কৌশল দেখ, সে সেইটুকু দেখিয়া শুনিয়াই আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

মায়াবদ্ধ জীব তাহাতেই কূপমণ্ডূকের ন্যায় আত্মাহঙ্কার অন্ধ হইয়া ফাটিয়া মরিতেছে।

যেমন কোন মনুষ্য পল্লীগ্রামের জলাশয়, পুষ্করিণী বা ডোবা এবং ছোট ছোট খাল দর্শন ভিন্ন জীবনের অন্য জলাশয় দর্শনগোচরই করে নাই, সে যেমন মনে করে, এর চেয়ে আর বেশী জলরাশি কোথাও নাই। তৎপর যখন পদ্মা কি গঙ্গার দর্শন পায়, তখন তাহার সে অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া, এত জলরাশিও সংসারে আছে এই ধারণায় সে আশ্চর্য্যান্বিত হয়। তৎপরে সেই ব্যক্তিকে যদি কোন দিন মহাসাগর দেখান যায়, তখন তাহার পূর্ব্বভাব যেমন দূরীভূত হইয়া, সে মনে করে—আমার সীমাবদ্ধ দৃষ্টি ও বুদ্ধি ক্ষুদ্র। এও তদ্রূপ। এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে পরমাত্মা পরমেশ্বর কোথায় কি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা কেবল তিনি এবং তাঁহার সৃষ্টি সাহায্য-

কারিণী মহাশক্তি অবগত আছেন। সীমাবদ্ধ ক্ষুদ্র নর, তাহার কি বুঝিবে? সেই পরব্রহ্ম পরমাত্মার ইচ্ছাক্রমে উদ্ভূত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাও যখন বালিকারূপিণী মহাশক্তির নিকট "তুই কোন্ ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মা" বলিয়া জিজ্ঞাসু হইয়াছেন, তখন আর অন্যে পরে কা কথা।

তোমার অভিলষিত গুরুরূপী সেই সাধুমুখে পরলোকের প্রত্যক্ষ ঘটনা যাহা শুনিতে পাইবে, তাহাই বিশ্বাস করিও। সময়ে নিজেও দর্শন করিতে পাইবে।

তোমার জন্যই আমি এখানে অপেক্ষা করিতেছিলাম। পূজনীয়া সতী রাণীর আদেশক্রমে আনন্দধামের অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করাইয়া তোমার গুরুরূপী সন্ন্যাসীকে এই স্থানে রাখিয়া গেলাম। তাঁর মুখেই সমস্ত শুনিতে পাইবে।

এখন তোমার প্রতি আমার শেষ কথা, তুমি সংসারে যাও; তাঁহার উপদেশ মত অবশিষ্ট কয়েকটী দিন সংসার কর। কোন কষ্ট হইবে না। আমার আশীর্ব্বাদে তুমি সদানন্দে জীবন্মুক্ত পুরুষের ন্যায় দিন কাটাইবে। সংসারে তোমাকে কেহ চিনিবে না। অথচ প্রীতি-পূর্ব্বক যে সংসারীর সংসারে গতিবিধি করিবে, আমার আশীর্ব্বাদে সে সংসার অপেক্ষাকৃত পূর্ণ থাকিবে। তাদের নিরানন্দের ছায়া দূরীভূত হইবে। কিন্তু অন্য চক্ষে তুমি ছদ্মবেশীর ন্যায় বেড়াইবে। বিশেষ প্রয়োজনে আমাকে ডাকিলে ঘরে বসিয়া অন্যের অলক্ষ্যে তুমি আমার দর্শন পাইবে।"

এই বলিতে বলিতে বিবেক মুহূর্ত্তমধ্যে পূর্ব্ববৎ অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

আমি বহুকষ্টে ধীরে ধীরে নামিয়া বাসায় আসিলাম। কিন্তু প্রাণ আমার বড়ই ব্যাকুলিত ও সন্দিগ্ধ। অন্তিম সুহৃদ্ বিবেক-বাক্যেও বিশ্বাস স্থাপন হইতেছে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

দর্শন।

সারারাত্রি ধর্ম্মশালায় পড়িয়া ভাবিতে লাগিলাম,—হরিদ্বার ত দেখা হইল, এখন যাই কোথায়? এমন করিয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া ঘুরিয়া কি করিতেছি! বড় সাধ ছিল, ইহপরলোকের বিশেষ সংবাদ সংগ্রহ করিব। বড় সাধ ছিল, আত্মিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করিব। তাহা হইল না। যাঁহার দর্শন কামনায় পৃথিবী পর্য্যটন করিলাম, কৈ তাঁহার ত সাক্ষাৎ পাইলাম না। বোধ হয়, আর দেখা হইবে না,—তবে যাই কোথায়? সকলেই এক বাক্যে গৃহে ফিরিতে বলিলেন!

গৃহে ফিরিব কি? কেন, কি প্রয়োজন আছে? গৃহে প্রয়োজন নাই, বনে প্রয়োজন নাই, তীর্থে প্রয়োজন নাই,—তবে যাই কোথায়? করিই বা কি?

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সারারাত্রি কাটিয়া গেল। সারারাত্রির মধ্যে একবারও নিদ্রা হইল না।

এক এক বার মনে হইতে লাগিল, অনেক সন্ন্যাসী মহান্ত দেখিলাম, অনেক সাধু বৈরাগী দেখিলাম, সকলেই ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেছেন, সংসার ত্যাগ করিয়াছেন;—কিন্তু তাঁহারা কেহই ইহপরলোক প্রত্যক্ষ করেন নাই, তবে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতেছে কেমন করিয়া? আমিও কেন তাঁহাদের মত করি না।

কিন্তু কি করিব ছাই? যাহাতে দৃঢ় প্রত্যয় নাই—তাহা করিলে কি ফল হইবে? তাঁহাদের প্রত্যয় আছে—বিশ্বাস আছে,—তাঁহারা স্থির হইতে পারিয়াছেন। আমি নিজের বলে কি করিব?

ঘুম হইল না,—উন্মুক্ত জানালাপথে চাহিয়া দেখিলাম, ভোর হইতে আর অধিক বিলম্ব নাই, পূর্ব্বাকাশে প্রভাতের তারা উঠিয়া পড়িয়াছে, এবং উষার বাতাসে সমস্ত গৃহখানা শীতল-মধুর ভাব ধারণ করিয়াছে। আমি ভাবিতেছি, এইবার শয্যাত্যাগ করিব,—শয্যা অর্থে এখানে একখানা দেশী কম্বল।

ঠিক এই সময়ে বাহির হইতে কে ডাকিল, "ঘরে কে আছ ওঠ।"

স্বর যেন আমার প্রাণের ত্বক্ ভেদ করিল, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া দরজা খুলিয়া বাহির হইলাম। কি সুপ্রভাত! সম্মুখে সেই প্রশান্তমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। যাঁহাকে ভারতের সমস্ত তীর্থস্থান খুঁজিয়া বেড়াইয়াছি, আজি তিনি স্বয়ং দর্শন দান করিলেন। সে সময় আমার মনের ভাব যে কি প্রকার হইয়াছিল, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করা যায় না। আমি ভূলুণ্ঠন করিয়া প্রণাম করিলাম।

সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানে?" আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে আমি উত্তর করিলাম,—"আমি আপনার অনুসন্ধানে পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্র ঘুরিয়াছি।"

কথা বলিতে বলিতে আমার চক্ষু পূরিয়া জল আসিল। সন্ন্যাসী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আমাকে খুঁজিতেছিলে কেন?"

আমি বলিলাম—"আসন পরিগ্রহ করুন, বিশ্রাম করুন, সমস্ত কথা বলিব।"

গৃহ হইতে, যে কম্বলখানায় আমি শুইয়াছিলাম সেইখানা আনিয়া বিছাইয়া দিলাম ; কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুর তাহাতে না বসিয়া নিজের পৃষ্ঠলম্বিত অজিনাসন বাহির করিলেন, এবং আস্তৃত করিয়া তদুপরি উপবেশন করিলেন।

আমি ধর্ম্মশালার ইন্দারা হইতে জল তুলিয়া আনিয়া তাঁহার পাদপ্রক্ষালন করিয়া দিলাম।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আমি আজই হরিদ্বার পরিত্যাগ করিব। তোমার কি জিজ্ঞাস্য আছে, বল।"

আমি বলিলাম,—আপনি আমাকে অমরনাথে যাইতে বলিয়াছিলেন, গিয়াছিলাম।"

সন্ন্যাসী। ফল পাইয়াছ, মায়া-মুক্ত হইয়াছ,—অমরনাথে মায়াদেবীর নিত্য নিবাসস্থান,—সেখানে গিয়া কেহ তাঁহাতে জড়াইয়া আসে, কেহ মুক্ত হইয়া আসে। তুমি মুক্ত হইয়াছ। কি জিজ্ঞাসা করিবে বল।

আমি। ঠাকুর, জিজ্ঞাসা করিবার কিছু নাই ; আমার গতি কি হবে, তাই বলুন।

সন্ন্যাসী। গতি অর্থে যাওয়া—কোন্ দিকে যাইবে, এই কথা জিজ্ঞাসা করিবে কি ?

আমি। যদি বলি, তাই।

সন্ন্যাসী। তাহার উত্তরে বলা যাইতে পারে, তোমার কর্ম্মফল যে দিকে লইয়া যাইবে, সেই দিকেই যাইবে।

আমি। তবে মানুষের কোন সাধনাই নাই ?

সন্ন্যাসী। আছে বৈ কি ! অভ্যাস যোগের দ্বারা মানুষ উন্নতির আলোক-পথে বা অবনতির অন্ধকারে যাইতে পারে।

আমি। সে অভ্যাস কে শিখায়?

সন্ন্যাসী। কেন, গুরু।

আমি। আপনি গুরু, আমি শিষ্য।

সন্ন্যাসী। যদি তাই বিবেচনা করিয়া থাক, আমার সঙ্গে চল, আমি অভ্যাস করাইব।

আমি। আপনি গুরু—আপনি শান্তিদাতা, আমার চিত্তে শান্তি দান করুন।

সন্ন্যাসী। অশান্তি কি—তা বল।

আমি। আমার প্রাণ উদাস—সংসার-অনাবদ্ধ, কিন্তু সন্দেহ-বিষে আমি সর্ব্বদা জর্জ্জরিত।

সন্ন্যাসী। কি সে?

আমি। আমার মনে হয়, হয়ত পরলোক নাই, স্বর্গনরক নাই, পুনর্জ্জন্ম নাই। হয়ত সংসারে কাজকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বৃথায় জীবনের কালটা এক অন্ধবিশ্বাসের পশ্চাৎ পশ্চাৎ জীবকুল ছুটিতেছে।

সন্ন্যাসী। এ সন্দেহবীজ কোথা হইতে উদ্ভূত হইল?

আমি। স্বর্গনরক, ইহপরলোক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি এক এক দেশের লোক বা সাধুগণ এক এক প্রকার ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। তাহাতেই সন্দেহ হয়, বুঝি ঠিক ওগুলা নাই,—যদি থাকিত, তবে সকলের বর্ণনাই একরূপ হইত। কলিকাতার বর্ণনা যেই করুক, এক প্রকারেই করিবে।

সন্ন্যাসী। তা' বটে—কিন্তু কলিকাতায় গিয়া যে চৌরঙ্গী রোডে থাকিত, কখনও বাগবাজারে যায় নাই, সে কলিকাতার বর্ণনায় চৌরঙ্গীর বর্ণনাই করিবে,—বাগবাজারের বর্ণনা করিবে না।

যে সভাবাজারে ছিল, সে সভাবাজারের বর্ণনাই করিবে, বড়বাজার না দেখিলে তাহার বর্ণনা করিবে কি প্রকারে? দেশভেদে কর্ম্ম-ভেদ, অতএব পাপপুণ্যেরও প্রকারভেদ আছে। স্বর্গ নরকা-দিরও স্তরভেদ আছে,—সেই জন্যই পৃথক্ দেশের সুধীগণের বর্ণিত স্বর্গনরকাদি পৃথক্ বলিয়া জ্ঞান হয়; অন্ধের হস্তী দর্শনের ন্যায় স্থির বিশ্বাস করিও না।

আমি। সে কথা হইতে পারে, কিন্তু মৃত্যুর পর তবে যথার্থই কি স্বর্গনরকাদি ভোগ করিতে হয়?

সন্ন্যাসী। নিশ্চয়ই। জৈবিক জীবনের মৃত্যু একটি নির্দ্ধারিত ঘটনা—তাহা সকলেই জানেন। জন্মিলেই মরিতে হইবে। ইহলোকে আমরা যে সকল চিন্তা করি—কার্য্য করি, তাহার সংস্কার আমাদের চিত্তে রহিয়া যায়,—তাহাই আমাদের পাপ বা পুণ্য,—তদ্দ্বারাই আমরা পরলোকে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকি।

আমি। বহুকাল হইতেই ঐ সকল কথা শুনিয়া আসিতেছি।

সন্ন্যাসী। যাহা শুনিয়া আসিতেছ তাহাতে বিশ্বাস করিতে পার না কেন?

আমি। এমন অনেক কথা শুনিয়া আসিতেছি, যাহার অস্তিত্ব নাই। যেমন ঘোঁড়ার ডিম।

সন্ন্যাসী। যাহা নাই—যাহার সম্ভাবনা নাই, তাহারই সহিত ঘোঁড়ার ডিমের উপমা করা হয়, সুতরাং তাহার সহিত তুলনা কেন?

আমি। ছেলেদের 'জুজু' বলিয়া ভয় দেখায়, বাস্তবিক কিন্তু জুজু বলিয়া কোন জিনিষ নাই।

সন্ন্যাসী। জুজু বলিয়া কোন জিনিষ নাই, একথা বলিতে পার না।

আমি। কেন?

সন্ন্যাসী। জুজু কথাটা যখন এবং যে দেশে প্রচলিত হইয়াছে, তখন হয়ত সে দেশে জুজু বলিয়া কোন ভয়ঙ্কর পদার্থ ছিল,-- কালে তাহার নাম বা সে পদার্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

আমি। তেমনি পরলোকও কি বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে না?

সন্ন্যাসী। না।

আমি। কেন?

সন্ন্যাসী। ইহলোক বিনষ্ট না হইলে পরলোক বিনষ্ট হইবে কেন? আবার জীবাদির একান্ত ধ্বংস না হইলে ইহপরলোক কিছুতেই বিনষ্ট হইতে পারে না। যদি দিবাভাগ বিনষ্ট না হয়, তবে রাত্রি বিনষ্ট হয় না, যথা—রাত্রি বড় হইলেই দিবাভাগ ছোট হয়। এবং পৃথিবী থাকিলেই দিবারাত্রি থাকিবে।

আমি। তবে আপনার মতে পরলোক ইহলোকেরই অবস্থান্তর?

সন্ন্যাসী। নিশ্চয়ই।

আমি। তাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস কিসে হয়?

সন্ন্যাসী। ভূয়োদর্শনে।

আমি। কে তাহা দেখাইতে পারেন?

সন্ন্যাসী। সদ্‌গুরু।

আমি। আপনি আমার গুরু।

সন্ন্যাসী। আমাকে তাহা অবশ্য দেখাইতে বলিতেছ?

আমি। অধম শিষ্যের তাহাই প্রার্থনা।

সন্ন্যাসী। কিন্তু এখন তাহা হইবে না।

আমি। কেন?

সন্ন্যাসী। তাহার জন্য এখনও প্রস্তুত হইতে পার নাই।

আমি। আপনি কৃপা করুন।

সন্ন্যাসী। গুরু উপায় বলিয়া দিতে পারেন, শিষ্যকে নিজ সাধনায় প্রস্তুত হইতে হয়।

আমি। আমার এক মহাপাপ জন্মিয়াছে।

সন্ন্যাসী। কি?

আমি। আমার পরকালের সন্দেহ কিছুতেই যাইতেছে না।

সন্ন্যাসী। ঐ সম্বন্ধে আমার একটি প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে।

আমি। কিপ্রকার?

সন্ন্যাসী। আমার প্রত্যক্ষ ঘটনায় অবশ্যই তুমি বিশ্বাস করিতে পারিবে।

আমি। সে বিষয়টি দয়া করিয়া বলুন।

তখন সন্ন্যাসী বলিতে আরম্ভ করিলেন,—'বৎস, আমি বহুকালাবধি নানা তীর্থে, নানা স্থানে ভ্রমণ করিলাম। কিন্তু কেহত আমাকে এরূপ প্রশ্ন করে নাই। যাহা হউক, আজ আমি তোমার প্রশ্ন শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। উপমা বা দৃষ্টান্ত না দিলে কোন বিষয় সুস্পষ্ট বুঝিতে বা বুঝাইতে পারা যায় না, অতএব আমি প্রচলিত দৃষ্টান্ত দ্বারা সাধ্যানুসারে তোমাকে উহা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি।

বোধ হয় তুমি স্বীকার করিবে যে, কোন প্রাণী প্রগাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলে তাহার আর বাহ্য চেতনা থাকে না। তখন তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং চক্ষুকর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে বিরত হইয়া এমন নিশ্চেষ্টভাব ধারণ করে যে, ধীরে ধীরে ঐ হস্তপদাদি, এমন কি সমস্ত দেহ পর্য্যন্ত স্থানান্তরিত করিলেও

তাহার সজীবতার লক্ষণ দেখা যায় না। ঐ সময়ে বিষয়ের বিষময় বাসনা, মায়ার মোহিনী ছলনা, এবং দুরাশার দুঃসহ তাড়না প্রভৃতি কোনপ্রকার উদ্বেগই আর তাহার হৃদয়ে স্থান পায় না। এ অবস্থায় ঐ ব্যক্তি পার্থিব বস্তুর সহিত আপনার সম্বন্ধ পর্য্যন্ত ভুলিয়া যায়। নিদ্রাভঙ্গের পরে আবার বিষয়বাসনাদি সমস্ত ঘটনাই স্মৃতিপথে উদিত হয়।

এই নিদ্রা আবার সামান্য ও মহৎ ভেদে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সামান্য নিদ্রা ও মহানিদ্রা স্থূল দৃষ্টিতে পৃথক্ বোধ হইলেও ইহাদের আভ্যন্তরীণ প্রভেদ অল্প। অর্থাৎ সামান্য নিদ্রার নির্দ্দিষ্ট কাল আছে, মহানিদ্রার তাহা নাই। সামান্য নিদ্রায় জীবাত্মা দেহেই থাকেন, মহানিদ্রায় জীবাত্মা দেহ ত্যাগ করেন। পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করা এবং জীবাত্মার এক দেহ ত্যাগ করিয়া অন্য নূতন দেহ ধারণ করা একই প্রকার। পুরাতন পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া নূতন পরিচ্ছদ পরিধান করিলে কি তুমি আর তোমাকে চিনিতে পারিবে না? সেইরূপ পুরাতন দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহে জাতিস্মর জীবাত্মা অবস্থান করিলে কি সে পূর্ব্বজীবনবৃত্তান্ত ভুলিয়া যাইবে?

তাই একটী সতী রমণীর জীবনবৃত্তান্ত তোমাকে উপদেশচ্ছলে বলিতেছি, শুন। কোন দিন একটী পতিব্রতা রমণী পতিহারা হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় আমার আশ্রমসম্মুখে উপস্থিত হয়। সে বহু দেশদেশান্তর ঘুরিয়া ফিরিয়া, পতির অনুসন্ধানে বহু কষ্ট পাইয়া, অবশেষে আমারই সম্মুখে তাহার প্রাণোপম স্বামীকে সন্ন্যাসীর বেশে দর্শন করিয়া, পরম পুলকিত ভাবে আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া লজ্জা ভয়, মান অভিমান সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া

মনের ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। তাহার ধারণা, তাহার প্রিয় পতিকে আমিই সন্ন্যাসী সাজাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আনিয়া তাহার মনকষ্টের কারণ হইয়াছি। এই বিশ্বাসে আমাকে নানারূপ তিরস্কার সূচক উপদেশ সকল বলিয়া, মনের তীব্র ইচ্ছার ফলেই হউক কিম্বা রমণীর পতিপরায়ণতার সুমধুর বলেই হউক সতী তৎক্ষণাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। সেই মূর্চ্ছিতা সতীর মস্তক উরুদেশে স্থাপন করিয়া বসায় তাহার স্বামীও জ্ঞানশূন্য হয়। তাহাদের তখনকার আত্মিক অবস্থা দর্শন জন্য আমিও প্রস্তুত হইলাম।

কি আশ্চর্য্য! রমণী মূর্চ্ছিতা হইবার পরক্ষণেই দেখি, আমার সম্মুখস্থ সমস্ত ভূমি ও বৃক্ষাদি এক অনির্ব্বচনীয় আলোকমালায় আলোকিত এবং ঐ দম্পতিযুগল জীবনশূন্য। এমন সময় সহসা আকাশ হইতে এক জ্যোতি আবির্ভূত হইয়া আমাকেও স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর গগনপথের অনেক উর্দ্ধে জ্যোতির্ম্মণ্ডল মধ্যে এক দিব্য রমণীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। তাঁহার উজ্জ্বল গৌরবর্ণ সৌম্যমূর্ত্তি, স্বভাবকুঞ্চিত সুদীর্ঘ চিক্কণ কেশ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পরিধেয় পবিত্র কৌষেয় বসন, ললাটে উজ্জ্বল সিন্দুরবিন্দু, হস্তে পবিত্র শঙ্খ (শাঁখা), দক্ষিণ হস্তে একটী কমণ্ডলু। দর্শন মাত্রে তাঁহাকে কোন অলোকসামান্যা (স্ত্রী) দেবীমূর্ত্তি বোধ হওয়ায় ভক্তিভাবে প্রণত হইলাম। ঐ জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী ক্রমশঃ আমার সমীপবর্ত্তিনী হইলেন এবং ধীর মধুর বচনে বলিলেন, "কি ভাই, এখানে আমার প্রিয় ভগিনীকে রাখিয়া কেন যাতনা দিতেছ? উহাকে আমি লইতে আসিয়াছি। তুমি কি করিবে? আমার সঙ্গে এক স্থানে বেড়াইতে যাইবে?" আমি ভয়, সম্ভ্রম, বিস্ময় এবং কৌতূহলের সহিত কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম "কোথায়?"

উক্তি হইল—"পরলোকে ; সে স্থানের নাম সদানন্দধাম।" আমি নাম শুনিয়াই আহ্লাদিত হইয়া কহিলাম—"সে ধাম কোথায় এবং এখান হইতে কতদূর ?"

উক্তি হইল—"সে রাজ্য এখান হইতে অধিক দূর না হইলেও কিঞ্চিৎ উচ্চ প্রদেশে অবস্থিত। যাইবে কি ?"

জিজ্ঞাসা করিলাম—"কাহার সঙ্গে যাইব ?"

উক্তি হইল,—"আমার সঙ্গে।"

আবার প্রশ্ন করিলাম—"দেবি, সে আনন্দধাম কিরূপ স্থান ? এবং সেখানে গিয়া আমার কি লাভ হইবে ?"

উক্তি হইল—"আহা ! সেই স্থানের সৌন্দর্য্য বর্ণনার অতীত আনন্দধাম দর্শন, এবং তাহার পবিত্র সমীরণ সেবন করিলে সকল ক্লেশই দূরীভূত হয়,—এই লাভ। যাইবে কি ?"

এই উক্তি শ্রবণে আমার অন্তঃকরণ আবার ব্যাকুলিত হইয়া উঠিল। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম "দেবি, আপনার সহিত আনন্দধামে যাইবার জন্য আমার একান্ত অভিলাষ জন্মিলেও অপরিচিত প্রদেশে—অপরিচিত ব্যক্তির সহিত যাইতে অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ সঙ্কুচিত হইতেছে, বিশেষতঃ আমাদের সন্ন্যাসীর ধর্ম্মে বলে—কামিনীকাঞ্চনই জীবের মুক্তিপথের কণ্টক। উহা বর্জ্জনই সন্ন্যাসীর ধর্ম্ম। অতএব দয়া করিয়া এ দীনকে পরিচয় প্রদান পূর্ব্বক সুখী করুন।

রমণী বলিলেন,—"আমার সঙ্গে যাইতে কোন শঙ্কা নাই। তবে তুমি যে কথা বলিলে তাহার উত্তরকে ভেবে দেখ, তুমিই এই ভবসংসারের এবার আসিবার সময় কোন্ পথ দিয়া আসিয়াছিলে, স্মরণ হয় কি ? প্রথমতঃ মাতৃগর্ভে আসিয়াছিলে, দ্বিতীয়তঃ

মাতৃস্তনদুগ্ধ পান করিয়াই আজ এত বড় সাধক ও যোগী হইয়াছ ; অতএব সেই কামিনী ত্যাজ্য হইতে পারে কি ? অবস্থা ও সময়-বিশেষে এবং ব্যবহারের ব্যতিক্রমে অমৃতও বিষের ন্যায় ক্রিয়া করে, এবং বিষও অমৃতের ন্যায় উপকারী হয়। এই যখন ভবসংসারের নিয়ম, তখন দয়াময় রাজরাজেশ্বর বিশ্বনিয়ন্তার সৃষ্টির কোন বস্তুকেই ঘৃণা বা ত্যাগ কিম্বা আদর ও গ্রহণ—আকাঙ্ক্ষার সহিত করিতে নাই ; করিলেই অপরাধ। তাঁহার দরবারে সকলেই তুল্যমূল্য, তবে কৃতকার্য্যের ফল পৃথক্। এই বিষয় ইতিপূর্ব্বে আমার এই দেবী ভগিনীর উপদেশরূপ ভৎর্সনাতেই কিঞ্চিৎ শুনিতে পাইয়াছ।”

আমার সংশয়পূর্ণ বচন শুনিয়াও দেবীপ্রতিমার সেই স্বভাবপ্রসন্ন বদনের অণুমাত্রও রূপান্তর লক্ষিত লইল না। তিনি হাসিতে হাসিতে আমার হাত দুটী ধরিয়া বলিলেন, “ভাই, ইহার পর পরিচয় পাইবে, এখন আইস। তোমার কঠোর-সাধনা-ফলে এবং আমার প্রিয় ভগিনী সুমতি দেবীর অনুমতিক্রমে এবং সতীর তেজোবলে তোমার প্রতি প্রসন্না হইয়া আজ তোমাকে আনন্দপুরীতে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছি। সাবধান, এখন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিও না। পুরাণাদিতে পাওয়া যায়, তোমার ন্যায় অনেক সাধক নিজ নিজ সাধনাবলে গোলোক, বৈকুণ্ঠ, ও কৈলাসেও গমনাগমন করিয়াছেন এবং রাজরাজেশ্বর ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ করেন ; কিন্তু এ সতীরাজ্যে গমন তাঁহাদের অনেকের ভাগ্যেও ঘটে নাই। আজ তোমার ঐ শিষ্যরূপিণী সতী রমণীর অলৌকিক তেজ বা শক্তি-প্রভাবে স্থূল শরীরে তুমি সতীরাজ্যে গমন, আনন্দধাম দর্শন এবং যমালয় ভ্রমণ ইত্যাদি অক্লেশে করিতে পারিবে। অতএব আমি তোমার অশুভাকাঙ্ক্ষিণী নহি।”

মহাদেবীর স্পর্শে আমার শারীরিক অনির্ব্বচনীয় অবস্থান্তর হইল এবং তাঁহার কথা শুনিয়া মনে অপ্রতিভতা, লজ্জা ও ভয় মিশ্রিত এক প্রকার ভাব উদিত হইল। বলিলাম, "আপনারা অগ্রবর্ত্তিনী হউন, আমি পশ্চাতে যাইতেছি।" আমি যাইতেছি— শুনিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী যেন অতিশয় তুষ্ট হইয়া নিজ কণ্ঠস্থিত সুন্দর সুরভি কুসুমমাল্য হইতে একটী কুসুম উন্মোচন পূর্ব্বক আমার হস্তে অর্পণ করিয়া সস্নেহে মধুর বচনে বলিলেন "তবে আমার সঙ্গে আইস; দেখিও যেন এই ফুলটি না পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য ইতি পূর্ব্বেই তিনি তাঁহার গলার সেই পবিত্র কুসুম-মাল্য-সদৃশ অপর একটী মাল্য তাঁহার ভগিনীর গলদেশে অর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন, আমি পশ্চাৎ চলিলাম; এ গমন পদব্রজে হইল না। সেই মনোরম কুসুম সৌরভ নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিবামাত্রেই যেন আমার শরীর বায়ু অপেক্ষা লঘু বোধ হইল এবং সেই জ্যোতির্ম্ময়ী-রমণী-শরীরের আকর্ষণী শক্তি আমাকে ঊর্দ্ধদেশে আকর্ষণ করিতে লাগিল! আমি আর অধিক-ক্ষণ চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না; ক্রমশঃ যেন আমার শরীর বিমান-পথে উড্ডীয়মান হইতে লাগিল।

প্রথমতঃ আমি যে, কোন্ পথ দিয়া কিরূপে গিয়াছিলাম, নয়ন নিমীলিত থাকায়, তাহা কিছুমাত্র দেখিতে পাই নাই; কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতির্ম্ময়ীর অনুমতিক্রমে চাহিয়া দেখিতে পাই-লাম, আমরা সকলেই তরুলতাদি-পরিশোভির এক অতীব উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। পার্ব্বত্য প্রদেশ আমার অদৃষ্টপূর্ব্ব না হইলেও, এরূপ সুন্দর শৈলমালা আর কোন কালেই নয়নগোচর হয় নাই। দেখিয়া মনে বড়ই আহ্লাদ

জন্মিল। অনতিবিলম্বেই জ্যোতির্ম্ময়ী, অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা ঐ পর্ব্বতের শিখরদেশ দেখাইয়া আমাকে কহিলেন "এই পথ দিয়াই আমাকে আনন্দধামে যাইতে হইবে।" আমি বিনীত ভাবে বলিলাম "দেবি, আনন্দধাম এখান হইতে আর কতদূর হইবে?" উত্তর হইল, "দূর অল্পই; এইবার আমাদিগকে পদব্রজে যাইতে হইবে; সাবধান! উপরে উঠিতে যেন পদস্খলন না হয়। ঐ স্থান হইতে পতিত ব্যক্তির সজীব থাকিবার সম্ভাবনা অল্প।" এই কথা বলিয়া জ্যোতির্ম্ময়ী সেই বন্ধুর শৈল-সোপানে পদার্পণ পূর্ব্বক স্বচ্ছন্দে পর্ব্বতে উঠিতে বলিলেন; আমিও সতর্কতা সহকারে পথ দেখিতে তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিলাম।

ক্রমশঃ যত উর্দ্ধে উঠিতে লাগিলাম, পথ ততই প্রশস্ত ও সুগম প্রতীয়মান হইল এবং তথাকার অদৃষ্টপূর্ব্ব মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দর্শনে শান্তি ও ক্লান্তি দূর হইল, অন্তরও অধিকতর প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। কোন সুন্দর পার্থিব বস্তুর সঙ্গেই উহার সৌন্দর্য্যের তুলনা দেওয়া যায় না। সেখানে তরু, লতা, গুল্ম, ফল, পুষ্প প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে, কিন্তু পার্থিব তরুলতাদির সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্য দৃষ্টিগোচর হইল।

এইরূপ অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে করিতে পর্ব্বতারোহণ করিতেছি, এমন সময় শিখর দেশ হইতে এই সুমধুর সঙ্গীতটী আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল,—

(গীত)

কে যাবি আয় ভবসিন্ধু পারেতে।
দ্বিদল ছেড়ে, বিন্দু পারে, প্রেমানন্দ-পুরীতে॥

যথা রবি শশী, দিবা নিশি,
পূর্ণোদয় যোগেতে,
হেরে ব্রহ্ম কান্তি, জীবন শান্তি,
মুক্তি পাবি ভক্তিতে ॥
সেথা সহস্রদল সোনার কমল
ফুটে আছে দিন রেতে ;
সেই কমল-মধু খাচ্ছে বিধু
পাচ্ছে সাধু যোগেতে ॥

তৃতীয় খণ্ড।

—:—

প্রথম পরিচ্ছেদ।

—:—

ঊর্দ্ধলোক।

সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—"এইরূপে কিয়ৎকাল গমনের পর, আমরা পর্ব্বতের শিখরপ্রদেশে উপস্থিত হইলাম। ভাবিতেছিলাম, কোন ক্রমে একবার উপরিভাগে উঠিতে পারিলেই আনন্দধাম যাওয়া যাইবে, কিন্তু তাহা বাস্তবিক ঘটিল না। উপরিভাগে উঠিয়া দেখি, পর্ব্বতের অপর পার্শ্বে তরঙ্গাকুলিত অদৃশ্যকূল এক বিশাল জলধি। পার হইবার কোন উপায়ই দৃষ্টিগোচর হইল না। কিছুক্ষণ এক দৃষ্টে বিশেষ রূপে লক্ষ্য স্থির রাখিয়া দেখা গেল—বহুদূরে একখানি পরমসুন্দর নৌকা কয়েকজন আরোহী বক্ষে করিয়া দ্রুতবেগে পরপারাভিমুখে ছুটিতেছে। বিশাল তরঙ্গমালা মধ্যে দোদুল্যমান তরণী খানির উপরিভাগে একমাত্র কর্ণধার বাম হস্তে হাল ধারণ এবং দক্ষিণ হস্তে অভয় প্রদান পূর্ব্বক তীব্র বেগে

যইতেছেন। ক্ষণকাল পরে তরণীখানি দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঐ নৌকাস্থিত লোকমধ্যে আমার তপঃকাননাশ্রমে ইতঃপূর্ব্বে যে নবীন সন্ন্যাসী দেহ ত্যাগ করিয়াছেন তিনিও আছেন। দেখিয়া আমি বিস্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে বলিলাম আনন্দধাম কোন্ স্থানে অবস্থিত, তাহা জানিবার জন্য বড়ই বাসনা হইতেছে।" "এই সাগরের পর পারেই আনন্দধাম"—এই উত্তর পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "এ সমুদ্র অতিশয় ভীষণ—কি করিয়া পার হইব?" উত্তর হইল—"পাথেয় সঙ্গে থাকিলে, পারের ভাবনা কি?"

তখন আমি কহিলাম—"তাহা হইলে আমার পারে যাইবার সাধ্য নাই। আমার সঙ্গে কড়ি নাই—কি করিয়া পার হইব?"

জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেবি! ঐ নবীন সন্ন্যাসী কি দিয়া পার হইতেছে? আমার খুব স্মরণ আছে, মৃত্যুকালে উহার সহিত সম্বল ছিল না।" দেবী হাসিয়া বলিলেন—"উহার পত্নী, স্বামী আসিতেছে শুনিয়া, তাহার নিজ সম্বল হইতে আগেই পারের কড়ি নাবিকের হস্তে অর্পণ করিয়াছে।"

আমি বলিলাম,—"তবে আমার উপায় কি?" দেবী হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার সঙ্গে সম্বল আছে বলিয়া দিতেছি, শোন। তুমি আজন্ম যে জপ তপ সাধনা ভজনা করিয়াছ, তাহার ফল যদি আমার করে অর্পণ কর, তবে পার হইয়া যাইতে পার।"

আমি সভয়ে বলিলাম, "দেবি! দয়াময়ি! আমাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে এখনও আমার পার্থিব পরমায়ু শেষ হয় নাই। আমি কেন আসিলাম তাহা আপনি জানেন।"

দেবী হাসিয়া বলিলেন—"আর নাই বা গেলে।" আমি বলিলাম, "আমি আসিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না।" দেবী বলিলেন, আসিবার জন্য জীব প্রস্তুত থাকে না, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। মহামায়ার সংসারে নানাকষ্টে পড়িয়াও জীব সংসারে জড়িত থাকে, ইহাই আশ্চর্য্য! স্বদেশে থাকিতে তোমার কেন অনিচ্ছা?"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম—"স্বদেশ! আমি ত স্বদেশে যাইবার কথাই বলিতেছি।"

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী হাসিয়া বলিলেন—"কোথায় স্বদেশ? জীবের স্বদেশ ঐ সাগরের পারে। এখনই তুমি স্বদেশে চলিয়াছ। আর মর্ত্ত্যভূমি কর্ম্মক্ষেত্র মাত্র। সে বিদেশে কর্ম্ম ক্ষয় করিতে জীবের গমনাগমন মাত্র। উহা আনন্দধামের অধীশ্বর কর্ত্তৃক নিয়োজিত মায়া নাম্নী এক মহাশক্তির শাসনাধীন একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। তাহাকে সংসার বলে! আরও স্থূলকথায় উহাকে আনন্দধামের অপরাধীদিগের কারাগার বলা যায়। সেখানে গিয়া অপরাধী জীবগণ মহামায়ার মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া পড়ে এবং পরস্পরে মাতা পিতা ভ্রাতা ভগিনী গুরু শ্বশুর বন্ধু প্রভৃতি সম্বন্ধ করিয়া লইয়া দিনাতিপাত করিতে থাকে। মায়ার প্রবল আকর্ষণে পড়িয়া তাঁহারা নিজ দেশের কথা বিস্মৃত হয়, এবং নানা প্রলোভনে পতিত হইয়া কালযাপন করিতে থাকে। কিন্তু সে কয় দিনের সম্বন্ধ? পরমায়ু শেষ হইলেই সব ফুরাইয়া যায়; তখন সকলই পড়িয়া থাকে। কেবল তথাকার কৃত কর্ম্মের ফল লইয়া বিচারার্থ আবার এখানে আসে। সংসারদ্বীপ বা ভবকারাগারের চারিদিকেই প্রথমে বিস্তৃত বালুকাময় চর, তৎপরে এই পর্ব্বতরূপ অত্যুচ্চ প্রাচীর, তৎপরে সাগর,—এবং সাগরের পারেই আনন্দধাম। তুমি

বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ ইচ্ছা করিলেই কেহ আনন্দধামে প্রবেশ করিতে পারে না। সংসারদ্বীপ হইতে আসিতে হইলে প্রাচীরাদি উল্লঘন করিতে হয়,—তাহাতে সক্ষম হইলেও সাগর-পারের প্রয়োজন। আর পলাইতে যাহারা চেষ্টা করে, তাহারা যদি কোন ক্রমে সংসারদ্বীপের শাসনকর্ত্রীর লোচন-পথে পতিত হয়, তবে তিনি তাহাকে যথোচিত দণ্ড বিধান করিয়া থাকেন। প্রকৃত প্রস্তাবে যাহাকে তোমরা স্বদেশ বল, তাহা তোমাদের স্বদেশ নহে এবং যাহাদিগকে আপনার জন বল, তাহারাও আপনার জন কেহ নহে। কেবল ঋণদাতা মহাজন মাত্র।”

দেবীর কথা শুনিয়া আরও শুনিবার বলবতী ইচ্ছা আমার হৃদয়ে জাগরূক হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম—“সংসারী জীব কৌশল দ্বারা ঐ সুখময় স্থানে পৌছিতে পারে না, কিন্তু তাহাদের ওখানে যাইবার আর কি উপায় আছে, তাহা আমাকে বলিয়া আমার কৌতুহল নিবৃত্তি করুন।”

দেবী কহিলেন—“যিনি এই সুখময় আনন্দপুরীর অধীশ্বর, তাঁহার কৃতান্ত নামক এক কর্ম্মচারী আছেন। তিনি প্রত্যেক জীবকে তাহাদের স্ব স্ব কর্ম্মফলের উন্নতি-অবনতি ক্রমে আপন অধীন করেন, এবং পাপ বা পুণ্যের দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করতঃ তাহাদের স্বদেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেন। তাহারা তখন সমস্ত বুঝিতে পারে,—স্ব স্ব কর্ম্মফলানুসারে আবার সংসারে যায়, আবার জন্মে, আবার মরে। কিন্তু এই জন্ম ও মরণের মধ্যবর্ত্তী সময়ে তাহারা যদি এই মায়াসাগর-পারের সম্বল সংগ্রহ করিতে পারে, তবেই সানন্দে ইহা পার হইয়া আনন্দপুরীতে গমন করিতে সক্ষম হয়।”

আমি বিস্ময়ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবি! সম্বল কি, এবং কি প্রকারে তাহা সঞ্চয় করিতে হয়?"

দেবী বলিলেন—"সংসার-মায়াবদ্ধ জীব যখন মায়াবিনী মহামায়ার কুহকজাল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া, আপনি কে, তাহা জানিতে পারে, এবং স্বজনপ্রীতি প্রভৃতি বিদূরিত হয়, তখনই সে সম্বল সংগ্রহ হয়।"

আমি সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলাম—"এতদূর আসিয়া তবে কি আমার ভাগ্যে সে সুখভবন দর্শন ঘটিল না?"

দেবী কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন—"যখন ডাকিয়া সঙ্গে আনিয়াছি, যখন দেখাইব বলিয়া আশা দিয়াছি, তখন অবশ্য দেখাইব। আইস,—আমার সঙ্গে আগমন কর।" চক্ষু মুদ্রিত কর—যতক্ষণ চক্ষু উন্মীলন করিতে না বলিব, ততক্ষণ এতদ্রূপ ভাবেই অবস্থান করিও।"

আমি দেবীর আদেশানুসারে নয়ন নিমীলিত করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম।

চক্ষু মুদ্রিত করিয়া রহিলাম বটে, কিন্তু আমি উত্তমরূপে অবগত হইতে পারিলাম যে, পূর্ব্বের ন্যায় দেবীর আকর্ষণী শক্তি দ্বারা আমি চালিত হইয়া শূন্যমার্গে চলিতে আরম্ভ করিয়াছি।

কতদূর চলিলাম, তাহা আমার ঠিক ছিল না। আকর্ষণ-বলে গমন করিতেছিলাম—এই সময় আমার কর্ণকুহরে মনোহর বাদ্যধ্বনি প্রবেশ করিল। সে বাদ্য যে কি মধুর, কি মনোহর, তাহা বর্ণনা করিয়া বলা যায় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:•:—

আনন্দরাজ্যে প্রবেশ।

যিনি এই বিশাল বিশ্বের সৃজন পালন ও লয় করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় পঙ্গুতে পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, শ্মশান রাজধানীতে এবং রাজধানী শ্মশানে পরিণত হয়, বন্ধ্যা চিরপ্রার্থিত পুত্র বদন দর্শন করে। পুত্রবতী পুত্রহীনতার যাতনায় রোদন করে। যিনি অঘটনঘটনপটীয়সী মায়ারও প্রভু,—সেই অনন্তদেবের কৃপায় ও এই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর প্রসাদে আমি এক দিব্য স্থানে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। দেবী বলিলেন—"চক্ষু উন্মীলন কর।" আমি নয়ন উন্মিলিত করিলাম; কিন্তু চাহিয়া থাকিতে পারিলাম না। অন্ধকার হইতে আসিয়া হঠাৎ প্রখর সূর্য্যকরের দিকে যেরূপ দৃষ্টিপাত করা যায় না, আমিও তদ্রূপ চাহিয়াও চাহিতে পারিলাম না,—চক্ষু ঝলসিয়া গেল। সেখানে যেন একপ্রকার জ্যোতি-লহর ক্রীড়া করিতেছিল।

তদনন্তর পুনরায় চেষ্টা করিয়া চাহিলাম। কি দেখিলাম? যাহা দেখিলাম, তাহা বর্ণনাতীত। যে স্থানে আমি তখন দণ্ডায়মান ছিলাম, তাহা এক অদৃষ্টপূর্ব্ব অকৃত্রিম উদ্যান। উদ্যানের সর্ব্বত্রই ফলপুষ্প যেন সৌরভে ও সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ হইয়া নিজেরাই হাসিতেছে এবং তরুলতা নানাবিধ ফলপুষ্পভরে অবনত হইয়া অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। মর্ত্ত্যভূমির তরুলতার মত ইহাদিগের বর্ণ নহে—যেন সৌরভ ও গৌরবে পরিপূর্ণ হইয়া দুলিতেছে,

এবং উজ্জ্বল হৈমকিরণে ইহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ যেন প্রভা বিস্তার করিতেছে। তৃণরাশিরও হেম-বরণ বলিয়া বোধ হইল। সর্ব্বত্র দেখিয়া লইব—মনে মনে হইলেও স্বাধীনতার অভাবে তাহা পারিয়া উঠিলাম না।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তখন আমাকে বলিলেন—"আইস আমরা প্রাসাদ মধ্যে গমন করি। সেখানে যাহা দেখিতে পাইবে, নিশ্চয়ই তাহাতে মুগ্ধ হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। তিনি তাঁহার সঙ্গিনী ভগিনীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক অগ্রবর্ত্তিনী হইলেন। আমি তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম।

সেই জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে যাহারা দেখিতে লাগিল, তাহারাই ভক্তিবিনম্রভাবে শির নত করিয়া প্রণাম ও সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিল। প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইবামাত্র, দুইজন রক্ষক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীকে ও চির পরিচিতের ন্যায় তাঁহার সঙ্গিনী রমণীকে এবং আমাকেও অবনত মস্তকে প্রণাম করিলেন। দ্বাররক্ষকদ্বয়ের সুন্দর কান্তিবিশিষ্ট কলেবর, পবিত্র পরিচ্ছদ এবং অলৌকিক শিষ্টাচার দেখিয়া আমার মনে বড়ই আহ্লাদ জন্মিল। তাহাদের কি সুন্দর রূপ! উভয়েই যেমন বলবান্ তেমনই সুরুপুষ। শুনিলাম উহাদিগের একের নাম সত্য ও অপরের নাম বিবেক। রক্ষকদ্বয় প্রণত হইলে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীও সসম্ভ্রমে উহাদিগকে প্রণাম করিলেন। আমি পূর্ব্বেই উহাদিগকে মনে মনে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিয়াছিলাম। চরণ স্পর্শের ইচ্ছা হইল কিন্তু সাহস পাইলাম না। আমাকে প্রণত দেখিয়া রক্ষকদ্বয় স্বাভাবিক বিনীত ভাবে এবং সুমধুর বচনে বলিলেন "ভাই, আর আমাদিগকে ভুলিয়া থাকিও না।" এরূপ বলিবার কারণ কিছু

বুঝিতে না পারায় কোন উত্তর দিতে পারিলাম না। এমন সময় জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী ইঙ্গিত করিলেন। আমি তাঁহার অনুগমন করিলাম।

প্রাসাদ-তোরণের পার্শ্বে এক অপূর্ব্ব মনোরম সরোবর দৃষ্টিগোচর হইল। সরসীর চারিদিকে শ্বেতপ্রস্তরের বাঁধা ঘাট, এবং প্রতি ঘাটেরই তিন দিকে সুবর্ণ-বর্ণ নানাবিধ সুগন্ধি পুষ্পোপবন-শোভিত সুবর্ণ-বর্ণ লতাগুল্মের সারি। দেবদেবীগণ সেখানে স্বচ্ছন্দে জল-বিহার করিতেছেন, এবং সেই নির্ম্মল সলিলে প্রফুল্লমুখী পঙ্কজিনী মধুকরে বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। এই অমৃত সরোবরের নির্ম্মল সলিলে প্রতি ঘাটেই দেবদেবীগণ স্নান তর্পণ করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা শিশুর ন্যায় সরল ও মধুর ভাবে জলক্রীড়ায় নিমগ্ন আছেন,—তাঁহাদের বসন-ভূষণ ও শারীরিক গঠন-পারিপাট্য প্রায় একইরূপ দৃষ্ট হইল। এমন কি, যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আমাকে সঙ্গে লইয়া সেই স্থানে প্রবেশ করিয়াছিলেন, অপরাপর দেবীগণ তাঁহারই অনুরূপ গঠন-বিশিষ্ট। দেবগণ কিঞ্চিৎ বিভিন্ন, তবে সকলেই একাকৃতি বোধ হইল এবং স্ত্রীপুরুষ সকলকেই সমান প্রফুল্ল দেখিয়া আনন্দধামকে বাস্তবিক আনন্দপুরী বলিয়াই প্রতীতি হইল।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া ক্রমে আমরা এক অপূর্ব্ব প্রাসাদমধ্যে প্রবেশ করিলাম। আমরা যেখানে প্রবেশ করিলাম, সেই সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠমধ্যে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীরই দেহের অনুরূপ অলোকসামান্যা সুন্দরী অপর দুইজন দেবী দুই খানি রত্নময় সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। ঐ দেবীমূর্ত্তি দর্শনে নয়ন ও মন মোহিত হইয়া গেল। আমাদের দৃষ্টি দেবীদ্বয়ের প্রতি পতিত হইবামাত্র তাহারা

যেন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ইহা দেখিয়া আমি বিস্মিত ও সঙ্কুচিত হইলাম।

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী আমাকে দেখাইয়া তাঁহাদিগকে কি ইঙ্গিত করিলেন এবং বলিলেন "ইনিই সেই ব্যক্তি।" এই কথা শুনিয়া রমণীদ্বয় আহ্লাদ সহকারে তখন সসম্ভ্রমে অহ্বান করিয়া পার্শ্বস্থিত একখানি উত্তম আসন দেখাইয়া আমাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। আমি আদেশ প্রাপ্তে সে আসনে উপবেশন করিলাম! সমীপস্থ আর দুইখানি আসনে আমার সঙ্গিনী দেবীদ্বয়ও বসিলেন।

আমার ন্যায় অপরিচিত সামান্য ব্যক্তিকে এতাদৃশ যত্ন সম্ভ্রম করিবার কোন কারণ বুঝিতে না পারিয়া মনে নানাবিধ চিন্তার উদয় হইল। কিন্তু তাঁহাদের প্রশান্ত মূর্ত্তি, প্রফুল্ল বদন, সরল ভাব, ও বিনীত ব্যবহার দেখিয়া অণুমাত্রও আতঙ্ক জন্মিল না। উপবিষ্ট হইবার পর, জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী উঁহাদের সহিত কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। কথোপকথনের সকল অংশ সুস্পষ্ট বুঝিতে না পারিলেও ভাবে বোধ হইল যেন জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর সঙ্গিনী সেই দেবী ভগ্নীটীর সম্বন্ধেই কথাবার্ত্তা হইতেছে।

কিয়ৎক্ষণ পরে জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী তাঁহার সেই প্রিয় ভগ্নীটীর হাত ধরিয়া দাঁড়াইলেন, এবং আমাকে বলিলেন,—"ভাই, তুমি এখানে ইহাঁদের নিকট কিছুক্ষণ অবস্থিতি কর, আমার কর্ম্মের সময় হইয়াছে, সমাধা করিয়া শীঘ্রই আসিতেছি।" এই বলিয়া সঙ্গিনীর হাত ধরিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গিনী দেবী এতাবৎ কাল মধ্যে অর্থাৎ মূর্চ্ছা যাইবার পর আর একটী কথাও কহেন নাই, কেবল ম্লান মুখে অধোবদনেই ছিলেন দেখি-

য়াছি। আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করি নাই, তবে একটী বার মাত্র পথে সেই মায়াসাগর পার হইবার সময় সেই নাবিকের নৌকায় তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি সন্দর্শন করিয়া যুবতীর মুখ প্রফুল্ল দেখিয়াছিলাম। এখন ঐ যুবতীদেবী আমাকে বিনীত নমস্কার করিয়া বলিলেন, "গুরুদেব, তবে আমি এখন আসি।"

আমি অপেক্ষা করিতে পারিলাম না, আনন্দে অধীর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম "মা, আপনারা কোথায় যাইবেন?"

যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোন উত্তর করিলেন না। জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী বলিলেন—"এখন তাহা তুমি শুনিতে পাইবে না। আসিয়া এসমস্ত বিবরণ তোমাকে বিস্তৃত ভাবে শুনাইব।"

তাঁহারা আর অপেক্ষা করিলেন না। তদ্দণ্ডেই সেস্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

আমি অত্যন্ত বিস্ময় সহকারে পার্শ্বস্থ দেবীদ্বয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম "উহাঁরা কোথায় গমন করিলেন?" একজন বলিলেন, "সতীরাণী উহাঁকে লইয়া যোগ্য স্থানে রাখিতে গেলেন।"

আমি অধিকতর বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"সতী রাণী বলিয়া আপনারা কাহাকে নির্দ্দেশ করিতেছেন?" দেবী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিলেন, "তুমি যাঁহার সহিত সংসার-দ্বীপ হইতে এই স্থানে আগমন করিতে সক্ষম হইয়াছ, তাঁহার উপস্থিত নাম সতীরাণী।"

আমি। আর একটি বিস্ময়ে পতিত হইয়া আছি। দয়া করিয়া যদি আমার সে বিস্ময় বিদূরিত করেন, কৃতার্থ হইতে পারি।

দেবীদ্বয় আমার বদনপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন, "তোমার যাহা জিজ্ঞাস্য থাকে, অকপটে জিজ্ঞাসা করিতে পার।" আমি

বলিলাম, "আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াই দেবী আপনাদিগকে বলিলেন যাঁহার কথা বলিয়াছিলাম, ইনি সেই ব্যক্তি। আমাকে সঙ্গে করিয়া আনিবেন, এমন কোন বন্দোবস্ত পূর্ব্বে ছিল কিনা জানি না, কিন্তু আমি আসিলে আমার অসমক্ষে আপনাদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎও হয় নাই, সুতরাং কখন ইনি আমার কথা আপনাদিগকে বলিলেন ?"

দেবীদ্বয় কহিলেন,—"ভাই, আমরা দৈবীশক্তিসম্পন্ন। আমাদের কথা অতি দূরে দূরে থাকিয়াও সম্পন্ন হয়। যখন তোমাকে আনিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখনই তোমার কথা উনি আমাদিগকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।" আমরা এ সকল কার্য্য যোগবলে নিত্য ব্যবহার্য্য রূপে জানিতে পারি, আর সংসারদ্বীপবাসী নরনারী বহুজন্মের সাধনা ফলে জ্ঞাত হইতে সক্ষম হয়।"

আমি আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তদ্বিষয় মনে মনে অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। ক্রমে পুলকে আমার হৃদয় পূর্ণ হইল।

অনেকক্ষণ তদবস্থায় অতিবাহিত করিয়া অবশেষে জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবি! আপনাদের পরিচয় জানিতে আমার অত্যন্ত বাসনা হইতেছে। দয়া করিয়া পরিচয় দানে অধীনের কৌতূহল নিবারণ করুন।"

দেবীদ্বয় প্রকৃতিসুলভ সলজ্জভাবে মৃদু হাস্য করিলেন। তার পরে একজন অমৃতমধুর বচনে বলিলেন "আমার নাম দয়া, আর আমার পার্শ্ববর্ত্তিনী এই দেবীর নাম শান্তি, আমরা এই আনন্দধামেরই অধিবাসিনী। আমরা এক সঙ্গেই থাকি। দয়া যেখানে, শান্তি সেখানে। আমরা যমজ ভগনীর ন্যায় একস্থানেই বসতি করিয়া মর্ত্ত্যবাসী নরনারীর আনন্দদান করি।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনাদের সতীরাণী মর্ত্ত্য-ধামে কি জন্য গমন করিয়াছিলেন, তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলুন।"

দয়া বলিলেন, "ঠিক জানি না। তবে উনি তোমার সেই শিষ্যপত্নীকে আনয়নের জন্য গমন করিয়াছিলেন এইরূপই অনুমান করিতে পারি।"

আমি কহিলাম, "দেবি! আপনাদের কৃপা অসীম! আমার ন্যায় সংসারকারাবদ্ধ ক্ষুদ্র জীবের প্রতি এত করুণা, এত কৃপা, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয়।"

দেবী হাসিয়া বলিলেন "না না তাই! তুমি ভুল বুঝিতেছ। আমরাই ভবকারাবাসী জীবগণের অধীনা এবং অনুগ্রহপ্রার্থিনী। যে আমাদিগকে কৃপা করিয়া আহ্বান করে, আমরা তাহার হৃদয়েই বৃত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হই; কিন্তু সরল ও সাধুহৃদয় ব্যতীত তিষ্ঠিতে পারি না। তুমি গুণবান্—ভবসংসারে তোমার মত সাধুপুরুষ যাহারা, তাহারাই ধন্য। তোমাদের আদর্শ লইয়া ভবসংসারে মানবগণ উন্নতি লাভ করিয়া থাকে। তোমরা সংসারকারাগারে অবস্থিত থাকিয়াও নিত্য মুক্ত। এক্ষণে তোমার যদি অন্য কোন বিষয় জিজ্ঞাস্য থাকে, বলিতে পার।"

আমি বলিলাম, "দেবি! আপনাদিগের নিকট জানিবার অনেক বিষয় আছে। এ ধাম আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন এবং এখানকার দৃশ্য সমুদায় আমার নিকট অভূতপূর্ব্ব। এক্ষণে জানিতে বাসনা হইতেছে, আমার শিষ্যপত্নী ঐ রমণী কোন্ পুণ্যফলে আপনাদের এতাদৃশ করুণালাভে সমর্থা হইয়াছে।"

এই সময় শান্তিদেবী কহিলেন—"দিদি দয়া! শুনিতে পাইতেছ, সতীরাণী আমাকে আহ্বান করিতেছেন?"

দয়াদেবী কহিলেন, "হাঁ শুনিয়াছি। তোমাকে যাইবার জন্য আমিও বলিব ভাবিতেছিলাম। যাও, তুমি ত্বরিত গমনে সেখানে চলিয়া যাও।"

শান্তিদেবী সেখানে আর মুহূর্ত্তও অবস্থান করিলেন না। মন্থর-গমনে তথা হইতে চলিয়া গেলেন।

দয়াদেবী বলিলেন, "তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, তাহার উত্তর প্রদান করিতেছি, শ্রবণ কর। যে রমণী ভবকারাগারে গমন করিয়া পতিপদে ঐকান্তিক ভক্তি স্থাপন করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহাকে সতী বলে, এবং সেই সতীকে আমরা এতাদৃশ যত্ন করিয়া এই স্থানেই আনয়ন করিয়া থাকি।"

আমার মনে অত্যন্ত আনন্দোদ্রেক হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "দেবি! আপনি যখন এত করুণাবতী, তখন সংসারের জীবগণের হৃদয়ে নিয়ত বাস করেন না কেন? আপনি যাহার হৃদয়ে বাস করেন, শান্তি দেবীও সে স্থানে বসবাস করিয়া থাকেন। অতএব আপনি যদি কৃপা করিয়া সাংসারিক জীবের হৃদয়-রাজ্যে বাস করেন, তবে সংসারও পুণ্যস্থানে পরিণত হইয়া উঠে।"

দেবী হাসিয়া কহিলেন, "আহ্বান না করিলে আমি কুত্রাপি গমন করিতে পারিব না। আর আমাকে আহ্বান করিতে হইলে আমার বাসস্থান জীবের হৃদয়মন্দির নির্ম্মল করিতে হয়। তবে আমি তথায় গমন করিতে সক্ষম হই এবং আমি গমন করিয়া সে হৃদয় মন্দিরে অবস্থান করিলে শান্তিও তথায় বাস করিতে আরম্ভ করেন।"

আমি তাঁহার এই হিতকর বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক মনে মনে তাহার আলোচনা করিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুনরাগমন।

আমি দীয়া দেবীর সহিত এবম্বিধ কথোপকথনে নিরত ছিলাম, এতৎসময়ে শান্তিদেবীর সহিত সতীরাণীর তথায় পুনরাগমন হইল।

জলধর-পটল-সমাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল পরিস্কৃত হইলে শশাঙ্কের উদয়ে যামিনী যেমন প্রসন্নমুখী হয়েন, সতীরাণীর আগমনে সেই গৃহও তদ্রূপ প্রসন্নতা লাভ করিল।

সতীরাণী ও শান্তিদেবী গৃহে আগমন পূর্ব্বক দুই খানি আসনে উপবেশন করিলেন।

আমার মনে কেমন একরূপ সঙ্কোচভাবের উদয় হইতেছিল। যেহেতু আমি পুরুষ হইয়া তাঁহাদের কক্ষে অবস্থান করিতেছি, যদি তাঁহারা ইহাতে মনে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ ভাবের পোষণ করেন। কিন্তু তাঁহাদের প্রসন্নতা দৃষ্টে আমার সে আশঙ্কা বিদূরিত হইল।

এমন সময়ে সেই গৃহে আর একটি দেবী প্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবয়ব-সৌসাদৃশ্য এই দেবীগণেরই অনুরূপ, কেবল অঙ্গ-দ্যুতি কিঞ্চিৎ বিমলিন,—তাহাও স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হইল না। বোধ হইল, কোন কঠোর চিন্তা বা দুর্ভাবনায় তাঁহার মালিন্যভাব উপস্থিত হইয়াছে। বোধ হইল, যেন কোন প্রকার শারীরিক বা মানসিক পীড়াই তাঁহাকে ঐরূপ বিরূপা করিয়াছে, এবং তিনি যেন কতই ক্লান্ত শ্রান্ত হইয়া আসিতেছেন।

এই রমণী আসিয়া পার্শ্বস্থিত অপর একখানি সিংহাসনে উপবেশন করিলে পর, শান্তি তাঁহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন, "সুমতি! তুমি সংসারদ্বীপের অবস্থা দেখিতে গিয়া এই অল্পকাল মধ্যেই এত ক্ষীণ ও মলিন হইয়া আসিলে কেন বোন? সেখানে গিয়া তোমার কোন প্রকার অসুখ হইয়াছিল কি ?—

শান্তির আগ্রহ দেখিয়া সুমতি একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভগ্নি, বলিব কি, মায়ার মোহিনী-শক্তিপ্রভাবে সংসারাবরুদ্ধ জীবের আত্মবিস্মৃতি জন্য দুর্গতি, ও তজ্জন্য আমার প্রতি তাহাদের হতাদর দেখিয়া, আমি এ যাত্রায় যে কিরূপ ক্লেশ পাইয়াছি, তাহা বলিয়া সম্যক্ বুঝান যায় না প্রথমতঃ কিছু দিন ত আমি সংসারদ্বীপনিবাসী মানবশরীরধারী, প্রায় সকলেরই নিকট বিনীত ভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলাম, কিন্তু মুহূর্ত্তকালের জন্যও কুত্রাপি স্থান পাইলাম না। যাহাদের নিকট যাই, তাহাদের মধ্যে অনেকেই আমাকে তৃণবৎ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল; কেহবা আমার গৃহে (হৃদয়ে) স্থান নাই বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিল; কেহ কেহ বা অল্পক্ষণ জন্য স্থান দিতে স্বীকৃত হইলেও তাহার চতুর্দ্দিকস্থ অমাত্যবর্গ একান্ত অমত করিল এবং প্রভুকে ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন বলিয়া বুঝাইয়া দিল। কেহ বা এখানকার শাসনকর্ত্রীর (মায়ার) অধিকার মধ্যে তোমার মত কাহাকেও বাসস্থান দিবার আদেশ নাই বলিয়া আশ্রয়দানে অস্বীকৃত হইল, কেহ বা আমাকে হত্যা করিবার দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। এইরূপে কিছু দিন প্রায় অনাহারে ও অনিদ্রায়, এবং অবিশ্রান্ত পর্য্যটনে, সমগ্র সংসারদ্বীপ পর্য্যটন করিলাম। কিন্তু কোন স্থানে ক্ষণকালের নিমিত্ত স্বচ্ছন্দে অবস্থিতি করিতে পাইলাম না। সমগ্র ভবকারাগার পরিভ্রমণ

করিয়া যে অত্যল্পসংখ্যক প্রাণীর আবাসে আশ্রয় পাইয়াছিলাম, মায়ামোহিনীর কুচিন্তা নাম্নী এক নূতন সঙ্গিনীর সংস্রবে, সেই সকলের মধ্যে অনেক গৃহই এমন মলিন হইয়া উঠিল যে, অল্পকাল পরেই আমি সে সকল আশ্রম ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলাম। অসংখ্য কারাবাসীর মধ্যে দুই এক জনকেই কেবল শক্তিমান্ ও মায়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বোধ হইল। কিন্তু এই ২।৪ জন মাত্র বীর-পুরুষ কি কখন অসংখ্য বিপক্ষসৈন্যের সহিত সংগ্রামার্থ সম্মুখীন হইতে পারে? সুতরাং তাহাদিগকেও নীরব ও নিশ্চেষ্ট দেখিলাম। তার উপর আরও এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম বোন! তাহা বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে। মায়া রাক্ষসীর কি মোহিনী শক্তি! জীবগণকে কিরূপ মোহান্ধ ও বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে, তাই শুন।

ভবকারাবাসী মানুষ সকলের মধ্যে আবার তথাকার রাজার শাসন ও আইন প্রণালীর বাধ্য হইয়া বহুসংখ্যক লোক অপরাধী সাজিতেছে। এবং তথায় আবার সেই রাজার বিচারে অপরাধ অনুসারে তথাকার কারাগারে (জেলখানায়) দুই, চারি, দশ বা চৌদ্দ বৎসরের জন্য জেলে যাইতেছে। এক দিন সেই জেল-খানা দেখিবার জন্য মনে বড় কৌতূহল জন্মিল। তথায় গিয়া উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম তথাকার অধিবাসী সকলেই একটী জেল-দারগার অধীনে বহুপাহারা-পরিবেষ্টিত হইয়া কয়েদীর পোষাক পরিধান করিয়া সরকারী কর্ম্ম করিয়া বেড়াইতেছে। তথাতেও তাহারা প্রত্যেকে নির্দ্দিষ্ট একটী এক-দরজার ঘর, একখানি খাটলী, একটী লোটাও একখানি কম্বল পাইয়াছে। সমস্ত দিনের কার্য্য সমাধান্তে প্রহরী সঙ্গে নিজ নিজ গৃহে আসিয়া রাত্রি যাপন করে।

এর মধ্যে দেখিলাম, একটী চতুর্দ্দশবৎসর মেয়াদের অপরাধী তাহার নির্দ্দিষ্ট গৃহের সন্মুখস্থ ভূমিতে একটী কাঁটাল বৃক্ষ রোপণ করিয়াছে। দৈনিক কার্য্য সমাপনান্তে ঐ বৃক্ষে জল সেচন ও নানা প্রকার যত্ন চেষ্টা দ্বারা তাহাকে বড় করিয়া তুলিয়াছে। কয়েদীর দ্বিতীয় বৎসর গত হইয়া তৃতীয় বৎসর প্রবৃত্ত হইয়াছে, উক্ত বৃক্ষও এই তিন বৎসর মধ্যে বহু শাখা প্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক কয়েদীর মনে আনন্দ দান করিতেছে। ঐ বৎসরের শেষ ভাগে উক্ত কাঁটাল গাছে বহুতর ফল অর্থাৎ পনস ধরিয়া অতি শোভমান হইয়াছে। এত ধরিয়াছে যে, তাহার সংখ্যা করা কঠিন। এমত সময় ২।১টী কাঁটাল সুপক্ক হইয়াছে। রজনী প্রভাতেই কারাবাসী পক্ক কাঁটাল পাড়িয়া নিজেও খাইবে এবং অপরাপর সঙ্গিগণকে দিবে, অবশ্য এইরূপ ধারণা করিয়া রাত্রে নিদ্রিত হইয়াছে। এমত সময়ে হঠাৎ হুকুম আসিল, রাজা রাণীর আগমন-উৎসবে দীর্ঘম্যাদী কয়েদী সকল খালাস। ঐ আদেশ জেল দারগার উপর প্রচার হইয়া গিয়াছে। দারগা রাত্রেই সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন। নামানুসারে পোষাক ও খালাসী হুকুমনামা পাহারাদারদিগের জিম্মা করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, যাদের নামে খালাস দেওয়া গেল, তাহাদিগকে অতি প্রত্যুষে সূর্য্য-অভ্যুদয়ে জেল হইতে বাহির করিয়া দিবে। এই কয়েদী সকলের মধ্যে ঐ চতুর্দ্দশবর্ষ মেয়াদী কাঁটাল বৃক্ষরোপকও একজন বটে। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইতে না হইতেই প্রহরী জেলারের হুকুমনামা লইয়া, উহাকে উঠাইয়া, উহার পূর্ব্ব পরিচ্ছদ পরাইয়া, হুকুমনামার মর্ম্ম শুনাইয়া বাহির করিয়া দিল। বল দেখি ভগ্নি! তখন ঐ বৃক্ষরোপকের মনভাব কিরূপ হইয়াছিল। তাহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া আমি চমৎকৃত ও

মোহিত হইয়া মায়ার মোহিনীশক্তিকে ধন্যবাদ দিতে দিতে তোমাদের সঙ্কেত আকর্ষণে সজীব শরীর লইয়া ফিরিয়া আসিয়াছি, ইহাই পরম লাভ!

এমন সুখের অবস্থায় পড়িয়া আমার শারীরিক ও মানসিক মালিন্য বা দৌর্ব্বল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ কি?"

সুমতির প্রমুখাৎ এই অদ্ভুত ব্যাপার শুনিয়া, আমার ত কথাই নাই, দয়া, শান্তি ও সতীরাণী, সকলেই বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তি ব্যথিত ভাবে বলিলেন,—"সর্ব্বনাশ! মায়ামোহিনীর কঠোর শাসনে তবে ত ভবকারারুদ্ধ প্রাণিগণ নিদারুণ যাতনা পাইতেছে!"

সুমতি কাতরস্বরে কহিলেন,—"আহা! ভবকারারুদ্ধ জীবগণের যন্ত্রণা স্মরণ হইলেও অশ্রু সংবরণ করা যায় না। তাহাদের প্রায় প্রত্যেকেই সেই মায়া-সহচরী-কুচিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া, এখন সর্ব্বদাই নিদারুণ রোগ শোক দারিদ্র্য প্রভৃতি যাতনায় জর্জ্জরীভূত মুমূর্ষুপ্রায় হইলেও কারা-শাসনকর্ত্রী মায়া-মোহিনীর মোহনমন্ত্রপ্রভাবে অধুনা এমন মোহিত হইয়া পড়িয়াছে যে, আর তাহাদের এইখানে আসিবার কথা স্মরণ পর্য্যন্ত নাই। এমন কি, কেহ কেহ বহু সন্তান প্রসব করিয়া কোনটীর অকাল মৃত্যু, কোনটী রোগগ্রস্ত, কোনটী চোর, কোনটী দস্যু হওয়ায় শোকে দুঃখে ছট্‌ফট্ করিয়া বেড়াইতেছে। আবার কেহ কেহ বা একটী স্কন্ধে, একটী বক্ষে, একটীর হস্ত ধরিয়া ও অপরটীর ব্যাধির চিকিৎসার জন্য চিকিৎসালয়ে ছুটাছুটি করিতেছে। কেহ বা অপূর্ব্ব স্নেহের সামগ্রী একমাত্র সর্ব্বগুণসম্পন্ন যশস্বী ধার্ম্মিক ও ধনবান্ পুত্র অকালে কারামুক্ত হওয়ায়, তাহা না বুঝিয়া, তাহার অভাব-

জনিত শোকে অন্ধ হইয়া উন্মাদগ্রস্তপ্রায় দিন কাটাইতেছে। আর কেহ বা অনিত্য অর্থ উপার্জ্জন লালসায়, শোক তাপ সমস্ত ভুলিয়া, অর্থের সেবা ও সঞ্চয় করিতেছে। কোনও রমণী অকালে তাঁর জীবনসর্ব্বস্ব গুণবান্ রূপবান্ মনোমত পতি-ধনে বঞ্চিত হইয়া, সংসারমোহে অনিত্য পুত্র-পৌত্রাদির মায়ায় মোহিত থাকিয়া, আত্মচিন্তা ও অন্তরঙ্গ ভুলিয়া, নয়নের জল নয়নেই শুষ্ক করিয়া, পুনঃ মুখে হাসি মাখিয়া ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে।

ভগ্নি! কত কহিব, কত দৃষ্টান্ত দিব। আরও দেখিলাম, যদি কোন শক্তিমান্ পুরুষ তাহাদিগের পূর্ব্বজন্মকৃত-সুকৃতিফলে তাহাদের গৃহে উপস্থিত হন, এবং উহাদিগকে বলেন যে, তোমাদিগকেও যখন ভবসংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক লোকান্তরে বিশ্ববিধাতা রাজরাজেশ্বরের নিকট যাইতে হইবে, তখন আর বৃথা শোক কেন? এবং নিজ নিজ কৃতকার্য্যের ফল নিজেকেই ভুগিতে হইবে, উহারা কেহই অংশ লইবে না, স্মরণ রাখিও, কিন্তু তাহারা মোহিনী মায়ার মন্ত্রপ্রভাবে সে কথায় কর্ণপাতই করে না। অথবা বাতুল বলিয়া ঐ উপদেষ্টাকেই উপহাস করে। আহা—শান্তি! বল দেখি, ইহা অপেক্ষা দুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে?”

সুমতির কথা শ্রবণ করিয়া শান্তিদেবী কহিলেন,—“জগদীশ্বর আমাদিগকে জীবের শান্তি প্রদান করিবার জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের শরীর ধারণের হেতু—জীবের অশান্তি বিনাশ করিয়া শান্তি স্থাপন করা। আহা! ভবকারাবাসী জীবের অবস্থা শ্রবণ করিয়া আমারও নিতান্ত কষ্ট বোধ হইতেছে। কি প্রকারে তাহাদিগের এই সকল দুঃখদুর্দ্দশা দূর করিতে পারা যায়, তাহার কি কোন উপায় চিন্তা করিয়াছ?”

দয়াদেবী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"চেষ্টা করিলে কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ থাকে না। আমিই ভগিনী সুমতিকে ভব-সংসারে প্রেরণ করিয়াছিলাম। জীবকুল যদি সুমতির শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের ভবকারামোচনের উপায় হইতে পারে।"

শান্তিদেবী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"দেবি! আপনি ত সুমতিকে ভবসংসারে প্রেরণ করিয়াছিলেন, সুমতি ভগিনীও তথায় গমন পূর্ব্বক সকলের পরিচর্য্যার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু কেহই তাঁহাকে গ্রহণ করিল না কেন? ইহার কারণ কি, বলিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুস্থির করুন।"

দয়াদেবী বলিলেন,—"ভগিনি! তোমার এই তত্ত্বময়ী কথা শ্রবণে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। তুমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার উত্তর দিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর। সংসারে জীবকুলকে পাশাবদ্ধ করিবার জন্য মোহিনী মায়া সর্ব্বদা নিযুক্ত রহিয়াছে। পুনশ্চ তাহার প্রভূত ক্ষমতাশালী পুত্র পাপ দিবানিশি মানবগণকে স্ববশে আনিবার জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। পাপের দুই পত্নী। একটির নাম অশান্তি এবং অপরটির নাম কুচিন্তা। তাহারা স্বামীর সঙ্গে মিলিত হইয়া মানবগণকে শাসিত রাখিবার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিয়া ফিরিতেছে।

পাপের শিক্ষা ও দীক্ষা গুরুর নাম কলি। কলি অতিশয় বলবান্। মানবগণ ইহাদিগেরই কাল-কবলে পতিত হইয়া দিবানিশি ঘুরিয়া মরিতেছে। তাহাদিগকে সৎশিক্ষা প্রদান বা উদ্ধার করিতে গেলেও তাহারা উপদেশ গ্রহণে অসমর্থ হয়। কাজেই মায়াদির অধীন হইয়া পুনঃপুনঃ দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।"

শান্তি কহিলেন—"হে কৃপাবতি! তবে কি তাহাদের উদ্ধারের কোন উপায় নাই? আবহমান কালই কি তবে তাহারা ঐরূপ কঠোর যন্ত্রণা ভোগ করিয়া বেড়াইবে?"

দয়া বলিলেন,—"ভগিনি! জীবের উপরে তোমার এতাদৃশী করুণা দেখিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।—পরোপকার—প্রবৃত্তি-পরায়ণে! জীবের ভবকারাকষ্ট নিবারণ করিতে হইলে প্রথমতঃ কুচিন্তাকেই তাহাদের নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিতে হইবে। কুচিন্তা বিদূরিত হইলে, অশান্তি অর্থাৎ কুচিন্তা-সপত্নীও তখনই ভয়ে তথা হইতে প্রস্থান করিবে। কুচিন্তা ও অশান্তি পলায়ন করিলে পাপও তাহাদের বিরহে সে দেহপুরী পরিত্যাগ করিবে। কেন না, পাপ অত্যন্ত স্ত্রৈণ,—সে ঐ উভয় পত্নীর সন্নিকটে সতত বসবাস করিয়া থাকে। পাপ দূরীভূত হইলে ক্রমে ক্রমে মোহিনীমায়ার ক্ষমতাও হ্রাস হইয়া আসিবে। অতএব এই প্রকারেই জীবকুলকে আনন্দপুরীতে আসিবার পথ প্রদর্শন করিয়া দুঃখদুর্দ্দশা হইতে পরিত্রাণ করিতে হইবে।"

শান্তি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনার উপদিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইলে প্রথমে কি করা কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়া আমার উৎসুক-প্রাণকে স্থির করুন।"

দয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন—"প্রথমে ভগিনী সুমতির কার্য্য আবশ্যক। ঐ ভগিনীর শরণাপন্ন হইতে না পারিলে জীবের উদ্ধারের দ্বিতীয় উপায় নাই। অতএব জীবকুল যাহাতে প্রিয় ভগিনী সুমতির বশতাপন্ন হয়, তাহার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে করিতে হইবে। সাধুসঙ্গই এই কার্য্য সংসাধনের একমাত্র পন্থা।"

শান্তি বলিলেন—"দেবি! সাধুসঙ্গ অসম্ভব কাজ। পূর্ণ কলির রাজত্বকালে কি সাধু এখনও বিদ্যমান আছেন? আমার বোধ হয়, প্রকৃত সাধু আর এখন নাই।"

দয়াদেবী বলিলেন—"সাধুহীন সংসার হইতে পারে না। তবে সংখ্যায় তাঁহারা অতিশয় অল্প হইয়া গিয়াছেন। ঐ যে ব্যক্তিকে দেখিতেছ (ইঙ্গিত দ্বারা দয়া আমাকেই নির্দ্দিষ্ট করিলেন), উনি একজন প্রকৃত সাধু। আমাদের এই কার্য্যে উহাকে কেন্দ্রস্থল করিতে হইবে। উনি আমাদিগের সহায় হইবেন,—সেই জন্যই উঁহাকে এস্থলে আনয়ন করা হইয়াছে। সুমতি ভগিনী ইহাঁদিগের সাহায্যেই ভবকারাগারের মানবগণের উপর আধিপত্য করিতে সক্ষম হইবে; এবং এখনও যে দুই এক স্থলে সক্ষম হইতেছে, তাহাঁও ইহাঁদিগেরই যত্ন ও চেষ্টায় বলিতে হইবে।"

শান্তিদেবী দয়াদেবীর এই আশাপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রফুল্ল-মনে কহিলেন—"দেবি! শুনিতে আমার প্রবল বাসনা হইতেছে যে, কুচিন্তা ও অশান্তির নিত্য সহচর মানবগণ কিরূপে এই সকল সাধুর সাহায্যে সুমতির বশবর্ত্তী হইবে?"

দয়াদেবী কহিলেন,—"সাধুদিগের নিজ তপোবলের এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে, যদ্দ্বারা জীবগণ বাধ্য হইয়া সৎপথের অন্বেষণ করিয়া থাকে. কিন্তু সেটি ক্ষণস্থায়ী। পরক্ষণেই মায়া আসিয়া তাহাদিগের হৃদয় অধিকার করিয়া বসে—কাজেই ক্রমে ক্রমে তাহার পাপাদি পরিবারবর্গ সেখানে উপস্থিত হইয়া অশেষ কষ্ট প্রদান করিয়া থাকে।

এক্ষণে আমাদিগকে যাহা যাহা করিতে হইবে, এবং যাহা আমাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর।

এই সকল সাধুসঙ্গে যেমনই মানবের মনে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তদ্দণ্ডেই সেখানে ভগিনী সুমতিকে উপস্থিত হইতে হইবে। সুমতির সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামী সত্যও গমন করিবেন। তাঁহাদিগের উভয়ের অবস্থিতি হইলে মোহিনী মায়া সহজে সে স্থানে আসিতে সক্ষম হইবে না। ইত্যবসরে শান্তি, তুমিও তথায় গমন করিবে। তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ তোমার স্বামী বিবেকও যাইবেন। তদনন্তর আমিও তথায় উপস্থিত হইব। এইরূপে আমরা সকলে একত্রে বাস করিলে ভবকারাবদ্ধ জীবের চিত্ত-ভূমি পবিত্র হইবে এবং সেই পবিত্র হৃদয়ে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে ধর্ম্মবৃক্ষের উৎপত্তি হইবে এবং কালে ঐ বৃক্ষই মুক্তিফল প্রসব করিবে।"

শান্তিদেবী দয়ার এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত হইলেন, এবং উত্তেজিত হইয়া বলিলেন,—"জীবোদ্ধারের এমন সহজ পন্থা বর্ত্তমান থাকিতে আমরা মায়াদির নিকট পুনঃ পুনঃ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি, ইহা নিতান্ত লজ্জা ও ক্ষোভের কথা। অতএব, আর ক্ষণবিলম্বের প্রয়োজন নাই। চল, অদ্যই আমরা ভবকারাবাসের মানবকুলকে সাহার্য্য করিতে গমন করি।"

শান্তির উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তাঁহারা সকলেই গাত্রোত্থান করিলেন।

আমি কহিলাম,—"ভগ্নীগণ! আমার উপায়? আমি কোথায় যাইব?"

দয়া সতীরাণীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেবি! তুমি ইঁহাকে রমণী কুল সৃষ্টির কারণ ও তাহাদের কর্ত্তব্য,—ভগবানের

ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য,—আর নারীজাতীর বর্ত্তমান অবস্থা জানাইয়া, আনন্দপুরী সন্দর্শন করাইয়া হরিদ্বারে, তৎপর হরিদ্বার হইতে ইহাঁর আশ্রম অমরনাথে রাখিয়া আসিবে।"

সতীরাণী তাঁহাদিগের কথায় স্বীকার হইলেন।

তাঁহারা সতীরাণীকে নমস্কার করিয়া সেই সুসজ্জিত কক্ষ পরিত্যাগে সমুদ্যতা হইলেন।

আমি ভক্তিভরে তাঁহাদিগের প্রত্যেককে প্রণাম করিলাম।

তাঁহারা আমাকে যথাযোগ্য প্রতিপ্রণাম করত গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—*—

রমণীকুল-কাহিনী।

সুমতি প্রভৃতি রমণীগণ গৃহ-নিষ্ক্রান্ত হইলে পর, ঐ অবস্থায় আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহাদের পূর্ব্বোক্ত কথোপকথন বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সতীরাণী সহাস্য বদনে আমাকে বলিলেন, "ভাই, তোমাকে আমি এখানে সঙ্গে করিয়া আনিয়া কি, তোমার কোন কষ্টের কারণ হইয়াছি?"

আমি বিনয়নম্রবচনে কহিলাম "দেবি, আপনিই দয়া করিয়া আমাকে এইখানে আনিয়াছেন, আপনার কৃপাবলেই আমি আজ এই আনন্দধামে বিচরণ করিতেছি। দেবি, এ ধামে ত কোন কষ্টই নাই, তবে কেন আমাকে কষ্টের কথা বলিতেছেন? এখন আমার একটী বিষয় জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহল হইতেছে, দয়া করিয়া তাহা বলিয়া আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন।"

দেবী কহিলেন—"কি বল।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমার শিষ্যারূপিণী ঐ রমণীরত্নটীর উপর আপনার এত করুণার কারণ কি? এবং ঐ রমণীরত্নই বা কে? আর মায়া নদী পার হইবার সময় সেই নৌকায় উহার স্বামী আমার শিষ্যরূপী সেই দিব্য পুরুষকে দেখিতে পাইলাম ইহার কারণ কি, এবং ঐ পুরুষ আমাদের অগ্রেই বা কি করিয়া এত শীঘ্র এই ধামে আসিল, কেই বা উহাকে লইয়া আসিল, কি শক্তিতেই বা অগ্রে অগ্রে আসিয়া অক্লেশে পার হইতে সক্ষম হইল, এবং এখনই বা উভয়ে কোথায় অবস্থিতি করিতেছে,—আপনার কোন-

রূপ বিরক্তির কারণ না হইলে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিয়া আমার কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।”

আমার কথা শুনিয়া সতীরাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “ভাই তুমি এত আগ্রহ প্রকাশ না করিলেও, সমস্ত ঘটনাই আমি তোমাকে বলিতাম। আচ্ছা এখনই বলিতেছি, শুন।—

আমি এই আনন্দধামবাসিনী সতীরাণী বলিয়া পরিচিতা। আনন্দময় বিশ্বনাথের আদেশক্রমে আমি এই দেহ পাইয়াছি। আমার কার্য্য—সংসারদ্বীপে যাবতীয় সতীত্ব-রক্ষা-ইচ্ছুক সতীরমণীগণকে রক্ষা করা, এবং সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া তাদের আপদ্ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করা। এ কারণ সর্ব্বদাই আমি শ্রীভগবান্ বিশ্বেশ্বরের আদেশ পালন জন্য সতীরমণীগণের হৃদয়ে সতত বাস করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফিরি। তাই আমার প্রিয় ভগ্নী আর্য্যসতী তোমার শিষ্যপত্নী—ঐ সতীরমণীর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলাম। ঐ রমণী পতি হারা হইয়া বহু কষ্টে বহু যাতনায় আপন সতীত্বরত্ন রক্ষা করিয়াছে। তৎপরে নানা দেশদেশান্তর পরিভ্রমণ করিয়া, বহুতর কষ্টে যাতনা ভোগান্তে অবশেষে তোমার আশ্রমে গিয়া তাহার স্বামীকে সন্ন্যাসিরূপে দর্শন পাইয়াছিল। তাই তাহার মানসিক শক্তি অতিশয় প্রবল ভাবে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল, এবং সংসারের সুখ-দুঃখ-বিষয়ক নানা চিত্র হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়ার পর তোমাকেই তাহার স্বামীর-সন্ন্যাসধর্ম্ম-পথপ্রদর্শক মনে করিয়া যথেষ্ট ভৎর্সনা করিয়াছে। অবশেষে রাজরাজেশ্বরের দরবারে বিচার প্রার্থনার তীব্র কামনা দেখিয়া, আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না, তাই সতীকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য ঊর্দ্ধ হইতে দিব্য জ্যোতি বর্ষণ করিয়া উহাকে এখানে আনিয়াছি। আর উহারই সতীত্ব-তেজে, উহার স্বামী তোমার প্রিয়শিষ্যরূপী যুবক, অক্লেশে

মায়া-নদী পার হইয়া এখানে আসিতে সক্ষম হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরেই তুমি স্বচক্ষে তাহাদিগকে দেখিতে পাইবে এবং সতীর তেজ যে কি পদার্থ, তাহাও বুঝিতে পারিবে।

যা হউক, তোমাকে এখন আমি সংসারদ্বীপে সতী রমণীগণের বর্ত্তমান কালের অবস্থান ও অবস্থার বিষয় কিছু বলিয়া বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। ভগবানের উদ্দেশ্য রমণীসৃষ্টি অকারণ নহে। দেখ ভাই। পুণ্যভূমি জম্বুদ্বীপ মধ্যে ভারত ব্যতীত সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে সৃষ্টিকর্ত্তারই উল্লেখ আছে, সৃষ্টিকর্ত্রীর বড় একটা উল্লেখ নাই ;--পরমেশ্বরের বর্ণনা আছে, পরমেশ্বরীর বর্ণনা নাই। ক্রমশঃ বর্ত্তমান কাল-মাহাত্ম্যে ভারতবাসী নরনারীও যেন নানা-দেশীয় আদর্শ দেখিয়া ও শিখিয়া উদ্দেশ্যভ্রষ্ট পথহারার ন্যায়, এ ধামে আসিবার শক্তিহারা হইয়া বারম্বার কেবল কৃতান্তপুরে ও সংসারদ্বীপে কারাগারবাসী হইয়া ক্ষণস্থায়ী আনন্দে ঘুরিয়া বেড়াই-তেছে। তাহাদের দুরবস্থা দেখিয়া এতদিন পরে যখন ভগ্নী দয়াময়ীর দয়া হইয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। তাই তোমাকে আজ আমার প্রিয় ভগ্নীর উপদেশে ভারতীয় ললনাকুলের কর্ত্তব্যকাহিনী কিছু বলিব। স্থিরচিত্তে শ্রবণ কর।--

জগতের জ্ঞান, ধর্ম্ম, বিদ্যা, বুদ্ধিদাত্রীও নারী—সরস্বতী দেবী। সম্পদ্, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, সুখ, এবং আনন্দের মুলাধারও সেই রমণী—লক্ষ্মীদেবী। জগতের আদর্শ সতীত্বভূমি - ভারতবর্ষ। ভারতের আদর্শ সতী—দক্ষকন্যা শিবানী। তাঁহার তেজ হইতেই আমার জন্ম (সতীরাণী)।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যে যাদের নারী, মানবের মানবত্বের মূলে যাদের রমণী—লক্ষ্মী, সরস্বতী, সেই ভারত-ললনা-

কুলকে কি আর রমণীধর্ম্ম পৃথক্‌ভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে? তবে কালানুসারে এক একবার না দিলেও চলে না। স্বর্ণ ঘটীও বহুদিন না মাজিলে তাহাতে কলঙ্ক পড়ে। তাই বলিতেছি, জগদ্ধাত্রী দেবী যাদের পালয়িত্রী জননীর আদর্শ, বিশ্ব প্রাণীর ক্ষুধা নিবারণের জন্য যেখানে অন্নপূর্ণা বিরাজিতা, এবং যে অন্নপূর্ণার শক্তিকণা পাইয়া ভারতরমণীকুল অদ্যাপিও ভবসংসারে অন্ন রন্ধন ও বণ্টনের ভার লইয়া রহিয়াছেন, ত্রিতাপহারিণী দুর্গা যাদের দুঃখহারিণী, বিপদ্‌ভয়-বারিণী কালী যাদের চির সহায়,—এক কথায়, যে দেশে সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ও মুক্তির অবলম্বন নারী, সেই নারীর আদর্শে—দেবীর আদর্শে—যে দেশে রমণী, সংসারের ঘরণী, ভরণী, অধিষ্ঠাতৃদেবীস্বরূপা;—যে দেশে কোন ক্রিয়া, কোন অনুষ্ঠান অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী নারী ব্যতীত হইতে পারে না; যে দেশে সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, দময়ন্তী, চিন্তা প্রভৃতি সাধ্বী পতিব্রতার দৃষ্টান্তে হিন্দু রমণীর জীবনপ্রণালী গঠিত, ও যুগযুগান্তর ধরিয়া নিয়ন্ত্রিত; যে দেশের নারীকে দারা, পত্নী, সহধর্ম্মিণী, অর্দ্ধাঙ্গিনী ভার্য্যা বলিয়া মনীষিগণ সম্বোধন করিয়া গিয়াছেন, সে দেশের রমণী-গণকে কোনও কোনও সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ কামিনী কাঞ্চন ত্যাজ্য বলিয়া, ত্যাগ করিবার জন্য সতত উপদেশ প্রদান করিতেছেন কেন? এ জগতে কিছুই ত্যাজ্য নহে; একটী কীটাণুসৃষ্টিও অকারণ হয় নাই। জলৌকার ন্যায় যখন ধরে, তখন ছাড়ে না। যখন ছাড়ে, আপনিই খসিয়া পড়ে। সময় হইলে বিনা চেষ্টাতেই ত্যাগ হইবে। যেমন মাতৃস্তনদুগ্ধ পানে ব্যাঘাত জন্মিলে শিশু গগনভেদী চীৎকার করে, কিন্তু সেই স্তনদুগ্ধ যুবককে দিতে গেলে মুখ বাঁকাইয়া বসে,—এই জাগতিক নিয়ম। বুঝিয়াছি যখন

তোমাদের ভারতের অধঃপতন হইয়াছে, তখন ভারত রমণীর—হিন্দু নারীজাতিরও অধোগতি অনিবার্য্য। অনেক হিন্দু রমণী ক্রমশঃ আত্মহারা, আদর্শচ্যুতা, পথভ্রষ্টা হইতেছেন।

অল্পদিনের কথা বলি, যে দিন হইতে আর্য্যগণ নিজেদের উচ্চ মহান পবিত্র আদর্শ দূরে ফেলিয়া, প্রথমতঃ যবনদিগের আদর্শে গৃহলক্ষ্মীগণকে বাঁদি বা বিলাসসামগ্রী সাজাইয়া, ক্রমে সেইরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, এবং পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষিণীর ন্যায় পুষিতে শিখিলেন, লক্ষ্মীদেবী সেই দিন হইতে চঞ্চলা হইলেন। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল পতিসেবায় লাভ হয় জানিয়া, সতী সাবিত্রী প্রভৃতি সাধ্বী সতীগণ দাসীর ন্যায় পতিসেবা করিয়া গিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহারাও গৃহলক্ষ্মীর ন্যায়—অধিষ্ঠাত্রী দেবীর মত চিরপূজনীয়া হইয়াছিলেন। সে সকল রমণী যে একাধারে দেবী ও দাসী ছিলেন, এ কল্পনা অপর দেশবাসী রমণীগণ করিতে পারে কি? তাই বলি ভাই, মনোযোগ পূর্ব্বক শুনিয়া যাও, এই ধর্ম্মবিপ্লবের মধ্যেও আমাকে সতী রমণীগণের সঙ্গে সঙ্গে প্রচ্ছন্নভাবে থাকিতে ও দেখিতে হয়। এবং তেজোরশ্মি দ্বারা কিরূপে ফিরিতে হয়, তাহা স্বচক্ষেই দেখিয়াছ।

তৎপরে যে দিন হইতে ইংরাজরাজ আসিলেন, অর্থাৎ শ্রীযুক্তেশ্বরী জগজ্জননীর মানস কন্যারূপে স্বর্গীয়া শ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরী (কুইন্ ভিক্টোরিয়া) জন্ম গ্রহণ করিয়া রাজ্যপ্রাপ্তে সুশাসন আরম্ভ করিলেন, সেই দিন হইতেই বাঁদির আচরণের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল,—প্রতিক্রিয়া হইতে লাগিল—পত্নীর তুল্যাধিকার প্রচারিত হইল। ইচ্ছা করিলে পত্নী পতির অধিকারে থাকিতে পারেন, ইচ্ছা না হইলে স্বাধীনা হইতে পারেন,—পত্নীর উপর

পতির চিরস্বত্ব নাই। ভালবাসা ইচ্ছাধীন, পাতিব্রত্য ইচ্ছাধীন, সতীত্বও এখন হইয়াছে ইচ্ছাধীন।

এ জন্যই এসময় আমাকে আর বড় কেউ ভালবাসে না। তাই অধিক সময়ে আনন্দধামস্থ সতীপুরীতেই বাস করি। ধর্ম্মের সহিত, জীবনের সহিত, সংসারদ্বীপ ভবকারাগারের সহিত, আর এই চিরশান্তিদাতৃ শান্তিনিবাসের সহিত, যেন কোনই সম্বন্ধ নাই। ঘুচিয়া গেল সীতা সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত; ঘুচিয়া গেল জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণার স্বর্গীয় আদর্শ; ঘুচিয়া গেল যুগযুগান্তরের আচরিত বংশপরম্পরাগত পাতিব্রত্য ধর্ম্ম; ঘুচিয়া গেল জন্মজন্মান্তরের সতীত্বশক্তি। তবে মাটীর দেহ মাটীতে মিশাইবে জানিয়া আর্য্য-মহিলাগণ সে দিন পর্য্যন্তও অগ্নিকুণ্ডে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছিলেন; কিন্তু এখন আর সেদিন নাই। হিন্দুপতিপত্নীর মিলন—হৃদয়ে হৃদয়ে, প্রাণে প্রাণে, অস্থিতে অস্থিতে, মাংসে মাংসে, ত্বকে ত্বকে—একাঙ্গরূপে সম্পন্ন হইত। তাই পতিবিয়োগ-মাত্রে বিয়োগবিধুরা পত্নীর দেহের অস্থি মাংস ত্বকের অনুভব-শক্তিও যেন পতির সহিত বিলুপ্ত হইয়া যাইত। তাই সতী কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অনায়াসে অবিচলিত চিত্তে জ্বলন্ত চিতায় আত্মদেহ ভস্মীভূত করিতে পারিতেন। পতির পার্শ্বে যেন পরমসুখে, পরমানন্দে নিদ্রা যাইতেন এবং পরমশান্তি লাভ করি-তেন। কিন্তু সে তেজও অপহৃত হইল, সে শক্তিও বিনষ্ট হইল, সে আদর্শও লোপ পাইল। সবই গিয়াছে, আছে কেবল বিধবার ব্রহ্মচর্য্য। সংসারের আমোদ-প্রমোদে নির্লিপ্তা, সুখসাধে বীতস্পৃহা, ব্রহ্মচারিণী হইয়া, সতী পতির ধ্যানে, পতির চিন্তায়, পতির উপাসনায়, অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

সতী রমণীর দৃষ্টান্ত শত শত সহস্র সহস্র দিলেও অত্যুক্তি হয় না। সাধ্বীর হৃদয়ের বল ও শক্তি দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, আমার তেজঃপ্রভাবে পতিহারা সতী তিলার্দ্ধও ভবকারাগারে থাকিতে ইচ্ছা করে না। তাহার দৃষ্টান্ত দেখ—

জগদীশ্বর ভগবান্ তাঁহার কৃতান্ত-শাসিত রাজ্য সংসারদ্বীপবাসী জীবগণকে তাঁহার এই সদানন্দধামের কণিকামাত্র মিলনসুখ দিয়া মায়াকে মোহিনী শক্তি দ্বারা শাসন জন্য পাঠাইয়াছেন। জীবকুল ঐ কণিকামাত্র আনন্দের আভাস পাইয়া পরমসুখ জ্ঞানে মোহিত হইয়া তথায় বাস ও ছুটাছুটি করিতেছে। তন্মধ্যে সুকৃতি দুষ্কৃতির তারতম্যানুসারে জ্ঞান ও অজ্ঞানের আকর্ষণ-শক্তিতে কেহ কেহ বা বারম্বার কৃতান্তপুরে যাতায়াত করিতেছে ও সেই কণামাত্র আনন্দ ভোগে তৃপ্তি বোধ করিয়াই এই অনন্ত আনন্দধাম ভুলিয়া রহিয়াছে। আর কেহ কেহ বা ঐ ক্ষুদ্র আনন্দকে, অনন্ত আনন্দের কণা বলিয়া জানিয়া সতীত্বরত্নের বলে পতিসহ হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণে এই আনন্দধামে চিরনিবাসের অধিকারিণী হইতেছে ও জরা-মরণ হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া সর্ব্বদাই হাস্যমুখে বেড়াইতেছে। ভাই! আমার তেজের পরিচয় তোমাকে কত দিব। সতী পরলোকে ও জন্মজন্মান্তরে পতির সহিত মিলিত হইবার একমাত্র আশায় অতি কঠোরতার সহিত জীবন ধারণ করিতেছেন। ভারতের সহস্র সহস্র গ্রামে সতী, পতির সহমরণ-গমনে বাধা প্রাপ্ত হইয়া, ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনে আছেন দেখিতে পাইবে।

সে সকল স্থানে আজিও ঋষিদিগের পবিত্র আদেশ প্রতি-পালিত হইতেছে, সে সব স্থানে আজও সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী,

দময়ন্তী ও চিন্তার কর্ম্মময় জীবনের আদর্শচিত্র, শত সহস্র ভারত-ললনার হৃদয়ে অনুপ্রাণিত ও অঙ্কিত আছে।

ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত হইতে আরম্ভ করিয়া নিশীথকাল পর্য্যন্ত শত শত হিন্দু নারী আজও সংসারের শত শত কর্ত্তব্য পালন করেন,—চিত্ত-জয়ের, চিত্তশুদ্ধির, আত্মোন্নতির, ও জ্ঞানলাভের এমন প্রত্যক্ষ উপায় আর কিছুতেই নাই। তাই বলি, তুমি সংসারের চিত্র বহুতর দেখিয়াছ, নিরুৎসাহ হইও না। এখনও সামান্য পর্ণকুটীরে, রাজ-অট্টালিকায় সু-উচ্চ প্রাসাদের ত্রিতলে লৌহ সিন্দুকের পার্শ্বে বসিয়া আজও গুপ্ত-সাধিকারূপে আমার ভগ্নীগণ এমত-ভাবে সতীধর্ম্ম পালন করিয়া পতির রজতময় পাদুকা পূজা করিয়া আসিতেছেন যে, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে আমার তেজোরশ্মি অদৃশ্য ভাবে দৈবশক্তিরূপে সর্ব্বদাই নিয়োজিত আছে।

আজও ভারতললনা-মধ্যে প্রত্যক্ষ দেবীমূর্ত্তি বিরাজিত। সহস্র-মধ্যে একটীমাত্র ভাগ্যবানের ভাগ্যক্রমে এখনও আনন্দময়ী গৃহলক্ষ্মী-রূপে সংসারকারাবাসে সেই মূর্ত্তি বর্ত্তমান দেখা যায়।

তবে অনেক অজ্ঞান রমণীকে অনুযোগ করিতে শুনা যায়, আমার ভালবাসা-সেবা স্বামী বুঝেন না, অতএব তাঁকে কিরূপে ভাল বাসিব? ইহা অতি জ্ঞানহীনা অর্ব্বাচীনা নারীর কথা। মানুষ পাষাণময় দেবতাকে (বিগ্রহ) ভালবাসে কেন? পাষাণের বিগ্রহ মানুষের ভালবাসা কি বুঝে? মানুষ কেবল ভগবৎ-প্রাপ্তি বাসনায় দেবতাজ্ঞানে পাষাণময় বিগ্রহের সেবা-পূজা করিয়া থাকে।

পতিই রমণীর দেবতা; পতি ভাল বাসুন বা নাই বাসুন, তাহাতে লক্ষ্য করিবার প্রয়োজন নাই। সে তাহার,—তুমি তোমার

কর্ত্তব্য পালন করিয়া যাও। মানুষ যে ভাব লইয়া বিগ্রহ সেবা করে, রমণী সেই ভাবাশ্রিতা হইয়া পতিসেবা করিবেন। যিনি তাহা পারেন তিনিই ধন্যা, তাঁহার সংসার কারাবাসও সুখৈশ্বর্য্যসমৃদ্ধ হইয়া নানা সুখপূর্ণ, এবং তিনি দেহান্তেও আমার আকর্ষণে আনন্দধামের অধিবাসিনী হইয়া চিরশান্তি লাভ করেন। -

কিন্তু এ সাধনা সহজে মিলেনা এবং সকল রমণীর ভাগ্যেও ঘটে না। পতি অপ্রিয়াচরণ করিলেও পত্নীর রুষ্ট হওয়া অবিধেয়। স্বামীর নিষ্ঠুরাচরণও যে রমণী প্রসন্নচিত্তে সহ্য করিয়া থাকেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মশীলা এবং অসীমা শক্তিশালিনী। তাঁহার শক্তি ও তেজো-বলে, এবং সাধনার ফলে লম্পট মাতাল চরিত্রহীন নিষ্ঠুর ধর্ম্মহীন পাতকী পতিও ঘোর নরকযন্ত্রণা ভোগ. না করিয়া, সতীর তেজঃপ্রভাবে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ, অন্তকালে আমার অধিবাসে, পবিত্র সতীর সহিত আনন্দধামবাসী হইতে পারেন।".

এই বলিয়া সতীরাণী গাত্রোত্থান করিয়া বলিলেন "ভ্রাতঃ! এখন আমার সঙ্গে আইস, আর বিলম্বের সময় নাই। তোমাকে সমস্ত দেখাইয়া শুনাইয়া, রাখিয়া আসিতে হইবে।" তখন আমার শরীর এবং মন বিস্ময়েও আহ্লাদে এরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, আমি প্রস্তর প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় নির্নিমেষনয়নে তাঁহার মুখের দিকেই চাহিয়া রহিলাম। মনে কত প্রকার প্রশ্নই উদিত হইল কিন্তু কথায় তাহার কিছুই প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

---

* বিগ্রহ সেবার ন্যায় পুরুষগণেরও দেবীসেবায় নিযুক্ত হওয়া উচিত। রমণীগণ যেরূপ স্বামিসেবা করিবেন, স্বামিগণও তদ্রূপ পত্নীর প্রিয় আচরণে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন। তবেই উভয়ে অক্লেশে শান্তিধামের অধিকারী হইতে পারিবেন। নচেৎ একের জন্য অন্যের বিঘ্ন ও পতন হইতে পারে।

অনেক্ষণের পর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া ধীরে ধীরে বলিলাম 'দেবী, আপনিই যে আমার পরম পথপ্রদর্শক অযাচিত বন্ধু, তাহা আমি বিশেষরূপে জানিতে পারিয়া, বারম্বার বিরক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। আমাকে রাখিয়া আসিবেন বলিলেন, কোথায় রাখিয়া আসিবেন? আমি কি আনন্দধামবাসী হইয়া আপনাদিগের নিকট বাস করিতে পাইব না?"

আমার কথা শুনিয়া সতীরাণী ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন—"ভাই! তোমাকে যখন সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি, তথন অবশ্যই তোমাকে এখানে পূর্ব্ব-নিবাসের অধিকারী করিয়া দিতে পারিলেই আমি নিশ্চিন্ত হইব; কিন্তু তাহার কিঞ্চিৎ বিলম্ব আছে। তোমাকে তোমার সংসারদ্বীপের সেই আশ্রমে গিয়া আর কিছু দিন বাস করিতে হইবে। তৎপরে অজ্ঞানান্ধ-মনুষ্য-হৃদয়ে উপদেশরূপ ঝটীকা-প্রবাহে কুচিন্তা-রূপ তৃণ দূরীভূত করিয়া সুমতিরূপ দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠার সাহায্য করিতে হইবে। এ ছাড়া তোমার তথাকার সামান্য কার্য্য যাহা আছে, তাহা শেষ হইলেই স্বয়ং কৃতান্তদেব গিয়া তোমাকে লইয়া আসিবেন, তখন তুমি নিশ্চিন্ত ভাবে পরমানন্দে এই আনন্দধামে বাস করিবার অনুমতি পাইবে। এখন আর বাক্যালাপের সময় নাই, চল তোমাকে কৃতান্তদেব যমরাজের সহিত এখনই পরিচয় করাইয়া দিই।"

এই বলিয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া গৃহের বাহির হইলেন, এবং উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করিয়া একটী সুমধুর [illegible] করিলেন। পরক্ষণেই দেখি একটি অতি সৌম্যমূর্ত্তি গৈরিক-বসন-পরিধান পবিত্র সাধুবেশ-ধারী পুরুষ আসিয়াই সতীরাণীকে মস্তক অবনত করিয়া প্রণাম করিলেন।

সতীরাণীও প্রতিপ্রণাম করিয়া কহিলেন,—"ভাই ধর্ম্মরাজ, সংসারদ্বীপবাসী এই সাধুবেশধারী পবিত্র-আত্মা-ভ্রাতাকে আমি সতী-তেজ-প্রভাবে এখানে আনিয়াছি। ইহাঁকে আনন্দধামের রাজপ্রাসাদ এবং তোমার শাসনপ্রণালী, ও শাসিত সংসারদ্বীপে কারাবাসী জীবগণের যাতনাভোগ ইত্যাদি সমস্ত যত্নপূর্ব্বক দেখাইয়া আমার নিকট আনিয়া দিবে। উহাঁকে এখন সংসারদ্বীপে রাখিয়া আসিতে হইবে, পরে যথাসময়ে কাল পূর্ণ হইলে তুমি স্বয়ং গিয়া উহাঁকে আনিয়া আনন্দধামবাসী করিবে।"

এই বলিয়া সতীরাণী অদৃশ্য হইলেন। কি আশ্চর্য্য! কৃতান্ত-দেবের নাম শুনিয়াই প্রথমতঃ আমার অন্তর একটু কাঁপিয়াছিল; কিন্তু এ ধামের গুণেই হউক কিম্বা সতীরাণীর করুণাবলেই হউক, কৃতান্তের মূর্ত্তি দর্শনে এবং তাঁহার ব্যবহারে আমার পরম আনন্দ হইতে লাগিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:—

সভামণ্ডপ।

এমত সময় কৃতান্তদেব হাসিয়া কহিলেন,—"ভাই! এই স্থানের নামই আনন্দধাম। আর ঐ যে প্রকাণ্ড তোরণ দেখিতে পাইতেছ, উহাই মহারাজ আনন্দময়ের প্রাসাদ। প্রবিষ্ট হইবার একটি দ্বার; এখন তোমাকে রাজরাজেশ্বরের সভামণ্ডপে যাইতে হইবে, আইস।"

এই বলিয়া তিনি আমাকে লইয়া অগ্রবর্ত্তী হইলেন। রাজবাটীর তোরণে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই একটী অশ্রুতপূর্ব্ব সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রবণে আমি বড়ই পুলকিত হইয়াছিলাম। এখানে আসিয়া দেখিলাম যে, ঐ তোরণ-পার্শ্বস্থিত একটি উচ্চ প্রদেশ হইতেই ঐ সুমধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুত হইতেছে। রাজতোরণটী এমন সুন্দররূপে সজ্জিত যে, তাহা বিশেষ করিয়া দেখিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কৃতান্তদেব অবিলম্বেই আমাকে লইয়া প্রাসাদ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আর দর্শন ঘটিল না।

নানা প্রকারে সুসজ্জিত বহু প্রকোষ্ঠ অতিক্রম পূর্ব্বক আমরা এক অত্যাশ্চর্য্য সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম সুবিস্তৃত উৎকৃষ্ট আসন। অসংখ্য সভাসদ্ যেন কাহারও আগমন-প্রতীক্ষায় ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ঐ সকলের মধ্যে এক দিকে সমুদয় পুরুষ ও অন্য দিকে ন্যূনাধিক চারি হস্ত

ব্যবধানে সমস্তই স্ত্রীমূর্ত্তি। সকলেই এমন সুশৃঙ্খলে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া আছেন যে, দর্শন মাত্রেই নয়নের অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি জন্মে।

পুরুষেরা যথাযোগ্য পবিত্র-বসন-পরিহিত, আর রমণীগণ তদনুরূপ বসনভূষণ-পরিহিতা। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই স্ত্রীপুরুষগণের মধ্যে কাহারও আকৃতিগত ও বয়োগত বিশেষ প্রভেদ দেখিলাম না; অধিকন্তু আমার আশ্রমাগত সেই নবীন সন্ন্যাসীকে ও তাহার সহধর্ম্মিণীকেও এই উভয় শ্রেণীর মধ্যে দর্শন করিয়া অতীব বিস্মিত হইলাম। কৌতূহল বশতঃ ধর্ম্মরাজকে জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হইল।

এমন সময়ে ঐ বাদ্যধ্বনি অপেক্ষাকৃত প্রবল বেগে বাজিয়া উঠিল। আর জিজ্ঞাসা করা হইল না।

ঐ উভয় শ্রেণীর মধ্যস্থিত কিঞ্চিৎ উচ্চস্থানে স্বর্ণ বেদিকার উপরিভাগে নানারত্ন খচিত রমণীয় অনেকগুলি সিংহাসন সংস্থাপিত দেখিলাম। ঐ সকলের মধ্যভাগে যে সিংহাসনখানি রহিয়াছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, সুগঠিত এবং সুসজ্জিত। অন্যান্য সমস্ত সিংহাসনের পার্শ্বেই এক এক জন তেজস্বী দিক্‌পাল পুরুষ নতশীর্ষ ও কৃতাঞ্জলি হইয়া দণ্ডায়মান।

কিন্তু ঐ বৃহদাসনের অধিকারী পুরুষকে দেখিতে পাইলাম না। এইরূপ বহু অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মনে মনে নানাবিধ চিন্তা করিতেছি, এমন সময় সভাসদ্‌বর্গ সকলেই ভক্তিভাবে জানু পাতিয়া এইরূপ স্তব আরম্ভ করিলেন;—

"পিতৃদেব! যামিনী-যোগে তোমার প্রেমময় মূর্ত্তি দর্শনে বঞ্চিত থাকিয়া, আমরা প্রতিনিমিষেই জীবনের অবসান-কাল সম্মুখীন

ভাবিতেছিলাম। কিন্তু এক্ষণে তোমার শুভাগমনে অভিনব জীবন, অদমনীয় উৎসাহ ও অপার তৃপ্তি প্রাপ্ত হইলাম। আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি। হে করুণানিধান, তোমার অনন্ত করুণায় আমরা অসীম সুখ ভোগের অধিকারী রহিয়াছি বলিয়া, পাছে দুঃখ বিনা, অবিচ্ছিন্ন সুখ আর আরামদায়ক না হয়, এই ভাবিয়াই বুঝি তুমি নিশাযোগে আমাদিগকে নিদারুণ বিরহসাগরে ভাসাইয়া স্বয়ং অন্তর্হিত হও। এবং প্রাতঃকালে পুনর্ব্বার দর্শন দিয়া বিগত যামিনীর দুর্ব্বিসহ বিরহ-যাতনার শান্তি কর? কিন্তু হে আনন্দস্বরূপ! যখন আমরা তোমার অদর্শন যাতনায় কাতর হইয়া রোদন করিতে থাকি, কৈ তখন তো আর তুমি দর্শন না দিয়া থাকিতে পার না। এই জন্য তোমার করুণা-শক্তিকেও প্রণাম করি।

দয়াময়! তোমার সুবিচারে তোমার সমদৃষ্টিতে এবং তোমার অপরিসীম করুণায় এই আনন্দধামে আমাদের কোন ক্লেশ, কোন অভাব অথবা কোন প্রার্থনাই সম্ভবপর নহে; তথাপি হে ইচ্ছাময়! আমরা এই প্রার্থনা করি, তোমার যে উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য আমাদিগকে এই হৃদয়, ইন্দ্রিয় ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি-সমন্বিত দিব্য শরীর প্রদান করিয়াছ, অভিমান বলবান্ হইয়া যেন ইহাকে অধঃ-পাতিত না করে। আমাদের হৃদয় যেন নিরন্তর তোমার মঙ্গল কামনায় অনুবর্ত্তী থাকে। রসনা যেন অসার আসক্তি-রসের রসিক হইয়া, তোমার নিত্যশক্তিপ্রদ নাম-পীযুষ পানে বিরত না হয়।

হে অনন্তশক্তে! যদি তুমি আমাদিগের প্রিয়সহবাস হইতে চিরবিচ্ছিন্ন কর, যদি তুমি আমাদিগকে এই অসীম সুখরাশি সংহরণ পূর্ব্বক অপার দুঃখসাগরে ভাসাইয়া দেও, এমন কি, যদি তুমি

আমাদিগকে ক্ষুধার্ত্ত অবস্থায় ভিক্ষার্জ্জিত মুখগ্রাস হইতেও বঞ্চিত কর, তাহা হইলেও তোমার কৃপালব্ধ আমাদের এই হৃদয় যেন, তোমার এই শুভ ইচ্ছা পূর্ণ হউক- বলিয়া অক্ষুণ্ণ ও অবিচলিত ভাবে থাকিতে পারে; আমাদিগকে এমন শক্তি দান কর। আমরা নিরত তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।"

এই বলিয়া সকলে নিস্তব্ধ হইলে, কৃতান্ত দেব স্বয়ং স্তব আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে ঐ সকল স্ত্রীপুরুষ পুনরায় এই সুমধুর স্তোত্র পাঠ করিতে লাগিলেন;—

(পরম-শিবের স্তব।)

ওঁ নমস্তে সতে সর্ব্বলোকাশ্রয়ায়,
নমস্তে চিতে বিশ্বরূপাত্মকায়।
নমোঽদ্বৈততত্ত্বায় মুক্তিপ্রদায়,
নমো ব্রহ্মণে ব্যাপিনে নির্গুণায়॥
ত্বমেকং শরণ্যং ত্বমেকং বরেণ্যং,
ত্বমেকং জগৎকারণং বিশ্বরূপম্।
ত্বমেকং জগৎকর্ত্তৃ পাতৃ প্রহর্ত্তৃ,
ত্বমেকং পরং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পম্॥
ভয়ানাং ভয়ং ভীষণং ভীষণানাং,
গতিঃ প্রাণিনাং পাবনং পাবনানাম্।
মহোচ্চৈঃপদানাং নিয়ন্তৃ ত্বমেকং,
পরেষাং পরং রক্ষকং রক্ষকাণাম্॥

পরেশ প্রভো বিশ্বরূপাবিনাশিন্,
অনির্দ্দেশ্য সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্য সত্য।
অচিন্ত্যাক্ষর ব্যাপকাব্যক্ততত্ত্ব,
জগদ্ভাসকাধীশ পায়াদপায়াৎ॥
তমেকং স্মরামস্তমেকং জপাম-
স্তমেকং জগৎসাক্ষিরূপং নমামঃ।
তমেকং নিধানং নিরালম্বমীশং,
ভবাম্ভোধিপোতং শরণ্যং ব্রজামঃ॥

এই প্রার্থনা-স্তোত্র সমাপ্তির পর, বৎস বলিব কি? আমি সে সময় উহাঁদের ঐ পীযূষবর্ষিণী হৃদয়হারিণী স্তুতিগাথা শ্রবণ করিয়া এমন বিমোহিত হইয়াছিলাম যে, কিয়ৎকাল বুঝি আমার বাহ্য চেতনাই ছিল না। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরেই আমার সে ভাব তিরোহিত হইল। তখন চাহিয়া দেখিলাম, সেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সিংহাসনের সম্মুখে অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময় এবং অনির্ব্বচনীয় সুন্দর এক মহাপুরুষ দণ্ডায়মান।

এতক্ষণ আমার দৃষ্টিতে ঐ সভাসদ্ পুরুষ ও রমণীগণের রূপপ্রভা, অমানিশার আকাশমণ্ডলস্থ তারাগণের ন্যায়, উজ্জ্বল পরিলক্ষিত হইলেও, এক্ষণে এই জ্যোতিঃসম্পন্ন অকলঙ্ক নিত্যপুরুষ শশাঙ্কের আবির্ভাবে উহাঁদের রূপ নিতান্তই নিষ্প্রভ বোধ হইল। সে যাহা হউক, ঐ মহাপুরুষের অদৃষ্টপূর্ব্ব ধীর প্রসন্ন শ্রীমূর্ত্তি দর্শনে আমার অন্তঃকরণে যে অননুভূতপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা শব্দে প্রকাশ করা অসাধ্য; তবে বাক্য দ্বারা তোমার মনস্তুষ্টির জন্য রূপ বর্ণন করিতে হইলে এই বলিতে পারি যে, তাঁহার দীর্ঘ বপুঃ নাতিস্থূল নাতিকৃশ সুগঠিত। বর্ণ

জ্যোতির্ম্ময় অথচ স্নিগ্ধ। মনোহর-মুকুট-মণ্ডিত মস্তকে সুচিক্কণ দীর্ঘ কুঞ্চিত কেশকলাপ বিন্যস্ত। ঋষিসদৃশ অনতিলম্বিত সুশ্রী শ্মশ্রু-রাজি এবং পরিধেয় ও উত্তরীয় পবিত্র সুন্দর শ্বেতাম্বর। ফলতঃ সেই সর্ব্বজনৈককমনীয় দিব্য শিবমূর্ত্তি দর্শন মাত্রেই চিত্ত যেন তন্ময় হইয়া উঠিল।

আমি এতক্ষণ ধর্ম্মরাজের মুখপানে চাহিয়া ছিলাম এবং সমস্ত কথা শুনিতেছিলাম। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, নবাগত এই আনন্দময় মহাপুরুষের পরিচয় জনিবার জন্য কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া, কৃতান্তদেবকে মৃদুস্বরে ও বিনীতভাবে বলিলাম "ধর্ম্মরাজ! এই মহাপুরুষ কে?" যম কহিলেন "ইনিই এই আনন্দধামের অধীশ্বর পরম পিতা।"

আমি কহিলাম "কৃতান্তদেব! সংসারদ্বীপবাসী জীবগণের ভাগ্যে কি পরম পিতার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনলাভ ঘটে না?" কৃতান্ত দেব কহিলেন "ভাই, তাহাদের ত এখনও ভগবান দর্শন করিবার অধিকার হয় নাই। তবে তোমার কথা স্বতন্ত্র; সতীরাণীর সংস্পর্শে এবং আমার সংসর্গে তোমার এ অধিকার জন্মিয়াছে।"

আমি কহিলাম "কখন তাহাদের অধিকার হইবে?"

কৃতান্তদেব বলিলেন, "যখন তাহারা মোহিনী মায়ার সুদৃঢ় শৃঙ্খল খুলিয়া মুক্ত হইবে, এবং কুচিন্তা ও অশান্তির অধীনতা ভুলিয়া অন্তিমবন্ধু আমার সহায়তায় সংসারদ্বীপ হইতে স্বচ্ছন্দে এখানে আসিতে পাইবে, তৎক্ষণাৎ সর্ব্বশক্তিমান্ করুণা-নিধান পরম পিতা স্বয়ং তাহাদিগকে সস্নেহ সম্ভাষণ না করিয়া আর থাকিতে পারিবেন না। একান্ত যত্ন করিলে নিশ্চয় তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।"

আমরা মৃদুস্বরে এই কথাবার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময় মহারাজ আনন্দময় সস্মিত বদনে নিজ দক্ষিণ বাহু উত্তোলন করিয়া কহিলেন "পুত্রকন্যাগণ, তোমরা আসন পরিগ্রহ কর। আমি তোমাদিগের আন্তরিক অনুরাগপূর্ণ আচরণ দেখিয়া এবং সুসঙ্গত প্রার্থনা শুনিয়া প্রীত হইলাম। আশীর্ব্বাদ করি, একাগ্রতার সহিত তোমাদের অভীষ্ট ব্রত পরিপালন পূর্ব্বক অক্ষুণ্ণ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সম্ভোগ কর।"

এই বলিয়া রাজরাজেশ্বর ভগবান্ আনন্দময় নিজ সিংহাসনে উপবেশন করিলেন। সভাসদগণও নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন।

রাজা ও সভাসদগণ বসিবার পর সভামণ্ডপ নীরব হইলে, একটি মৃদু মধুর বাদ্যধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। শুনিলাম, এই বাদ্য শেষ হইলেই সভার প্রাত্যহিক কার্য্যারম্ভ হইয়া থাকে। মহেশ্বরের এই মহাসভায় যে মহাকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব ভাবিয়া মনে বড়ই আহ্লাদ জন্মিল বটে, কিন্তু কার্য্য যাহা দেখিয়াছিলাম তাহা স্মরণ হইলে আজও আমার হৃদয় দুঃখে অবসন্ন হয়।

রাজসিংহাসন দক্ষিণ দিকে, আমরা উত্তর দিকে ছিলাম। কিঞ্চিৎ দূরে একটী অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পুরীর কিয়দংশ দেখা গেল। যত দূর লক্ষিত হইল, তন্মধ্যস্থ একটী গৃহের দ্বারগুলি উন্মুক্ত রহিলেও, যবনিকা লম্বিত থাকায় বহির্ভাগ হইতে ভিতরের কোন বস্তুই দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গৃহমধ্যস্থিত ব্যক্তিগণ যবনিকার অন্তরাল হইতে বাহিরের সমস্ত কার্য্য দেখিতে পায়, এইরূপ ভাবে গঠিত অনুমান হইল।

পরে জানা গেল, ঐটীকেই যমালয়স্থ গুপ্তগৃহ কহে। সংসার-বাসী অপরাধী জীবগণ মুক্তিপ্রাপ্ত না হওয়া কাল পর্য্যন্ত পার্থিব দেহ ত্যাগের পর কৃতান্তদূত দ্বারা সূক্ষ্ম শরীরে তাদের স্বদেশ আনন্দধাম দর্শন করিবার নিমিত্ত যমালয়ে আসিয়া এই গৃহে ক্ষণকালের জন্য থাকিতে পায়। ইহার পর তাহাদের পুনর্জ্জন্ম হয়। এই গৃহ-সাজঘর হইতেই তাহারা নূতনরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া ভোগ-ভূমিতে গমন করে। উহারা ঐ স্থান হইতে আনন্দধামের অন্যান্য প্রায় সমস্ত বস্তুই দেখিতে পায়। কেবল দিব্য দৃষ্টির অভাবে ভগবান্ আনন্দময়ের রাজরাজেশ্বর রূপ কিছুতেই দেখিতে পায় না। এই স্থান হইতে শরীর পরিচ্ছদ (পোষাক) পরিয়া আপন শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগ করিবার জন্য জীব নানা জগতে নানা যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। এই জন্মগ্রহণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবাত্মা ঐশিক নিয়ম বশে, পরমাণুরূপে নীহারকণায় সংযুক্ত হইয়া যায়। পরে সেই নীহারকণিকা জলে, স্থলে, তৃণাদিতে, শাকে ও ফলে মিশ্রত হইয়া মর্ত্তধামে পড়ে। প্রাণিগণ বিশেষতঃ মানবজাতীয় নরনারী সেই জল ফল ও শাকাদি ভক্ষণ করিলে তাহা ক্রমে শোণিতশুক্রে পরিণত হয়। সেই শোণিতশুক্রের সংযোগই জীব-জন্মের কারণ।

অল্পক্ষণ পরে ঐ বাদ্যধ্বনি নিবৃত্ত হইল। তখন আনন্দরাজ ঐ যবনিকাবৃত গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ধীর গম্ভীর বচনে বলি-লেন,—"বৎসগণ! আমি তোমাদের অসদাচরণে ব্যথিত হইয়াছি। আমার ইচ্ছা নহে যে, আমার সন্তান হইয়া তোমরা দুঃখ পাও; কিন্তু তোমরা আমার বিধান উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক—আমাকেই উপেক্ষা করিয়া—অসীম সুখলাভের আশায় স্বেচ্ছা বা অহঙ্কার বশে যখন কলুষ-সুরাকে পীযূষ-রস ভ্রমে পান করিয়াছ এবং তজ্জনিত মত্ততা

নিবারণ নিমিত্ত বারংবার ভবকারাগারে যাতায়াতরূপ নিদারুণ যাতনা ভোগ করিয়াও যখন তোমাদের চৈতন্য হইতেছে না, তখন আমি রাজ্যরক্ষা ও প্রজা রঞ্জনার্থ বিধানের বাধ্য হইয়া অগত্যা বলিতেছি যে, তোমরা আবার অভিনব শরীর-পরিচ্ছদ গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার সংসারদ্বীপেই প্রতিগমন কর। যদি কখনও সুমতির কৃপায় পাপমত্ততা-বিমুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার চেতনা লাভ হয় এবং আপনাপন দুর্দ্দশা বুঝিয়া অনুতপ্ত হইতে পার, তবে যথাকালে আসিয়া আমার সমীপে নিজ নিজ আবাসে বাস করিতে পাইবে। অন্যথায় এইরূপ যাতায়াত ও পুনঃ পুনঃ গর্ভবাসই কৃতকর্ম্মের ফল।"

ভগবানের এই নিদারুণ অটল আদেশ শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই যেন শঙ্কিত হইলেন। এই সময় সেই যবনিকার অন্তরাল-স্থিত গুপ্তগৃহ মধ্য হইতে কতিপয় ক্ষীণ কাতর কণ্ঠ-বিনিঃসৃত এই সকরুণ প্রার্থনা শ্রবণগোচর হইল ;—

"পিতৃদেব! তোমার অজ্ঞান সন্তান আমরা পরিণাম চিন্তা না করিয়া অমৃত জ্ঞানে পাপ-হলাহল সেবন করিয়াছি। সেই বিষ সর্ব্বাঙ্গে পরিচালিত হইয়া জ্বালায়প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। এখন তুমি শান্তিবারি সেচন না করিলে কে আর অধম সন্তানগণকে রক্ষা করিবে।

হে করুণাময়, আমরা অহঙ্কারের উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যতই কুকর্ম্ম করি না কেন! আমরা মায়ার কুহকে বিমোহিত হইয়া যত কালই কুচিন্তার পদসেবায় নিযুক্ত থাকি না কেন! অশান্তির পীড়নে যতই নিপীড়িত হই না কেন! কৃতান্তদেবের কৃপায় এক্ষণে যখন তোমার শান্তিময় চরণ-প্রান্তে হৃদয়-বেদনা নিবেদনার্থ আসিতে সময় পাইয়াছি, তখন হে দয়াময় দীনবন্ধো! তুমি আর কেমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে নিরাশ্রয় অনাথদিগকে ত্যাগ করিবে?

প্রভো! যদি আমাদের কৃতাপরাধের দণ্ড ভোগ না হইলে আমাদের নিত্য নিবাস এই আনন্দপুরীবাসের অধিকারী না হই, যদি কুসন্তান বলিয়া, আমরা তোমার সম্মুখেও উপস্থিত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত না হই; তাহাতে আমাদের তত দুঃখ নাই। কিন্তু হে অনাথনাথ! আমাদিগকে আর সেই পাপ-দস্যু শাসিত মায়া-রাক্ষসী-রক্ষীভূত অশান্তি-পিশাচী-নিপীড়িত ভয়ঙ্কর সংসারদ্বীপে পাঠাইও না। আমাদিগকে রক্ষা কর, এখানে আমরা তোমার সমীপে থাকিলে যে দণ্ড বিধান কর তাহা ভোগ করিয়াও একদিন শান্তি পাইবার আশা থাকিবে। কিন্তু হে শান্তিময়! আবার ভবকারাদ্বীপে গিয়া আবদ্ধ হইলে আর এই ভাগ্যহীনদিগের মুক্তিলাভের আশা থাকিবে না। সেই মায়ারাক্ষসীর কুহকজালে পড়িয়া—অল্পায়ু কীর্ত্তিমান পুত্র ও বিষকুম্ভ পয়োমুখ ভার্য্যা পাইয়া এবং নানারূপ বিষয়-সম্ভোগ-বাসনায় জড়িত হইয়া আমরা হয়ত তোমাকে ভুলিয়া যাইব; সেই জন্যই এত কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগকে এবার ক্ষমকর।

আমরা তোমার সম্মুখে করজোড়ে প্রতিজ্ঞা করিতেছি,, আর আমরা মায়াকুহকে ভুলিব না; আর আমরা বিষয়রসে মজিব না; আর কুচিন্তার দাসত্ব করিব না; আর পাপ-মদে মাতিব না, আর আমরা তোমাকে কখনও ভুলিব না এবং আর আমরা তোমার শ্রীপাদপদ্মও ছাড়িব না। হে শরণাগত-রক্ষক! আমাদিগকে ক্ষমা কর প্রভু! রক্ষা কর।"

গুপ্ত গৃহের অভ্যন্তরস্থ ব্যক্তিবর্গের এইরূপ হৃদয়ভেদী প্রার্থনা শুনিয়া উহাদিগকে সংসারপ্রত্যাগত অপরাধী বলিয়াই প্রতীতি জন্মিল। উহাদের ঐ প্রকার ব্যাকুলতা শ্রবণে অপর সাধারণের

কথা দূরে থাকুক স্বয়ং দয়ার সাগর ভগবান্ পর্য্যন্ত অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

কঠোর রাজ্যশাসন বিধির অনুবর্ত্তিতা হেতু তিনি তাহাদের জন্য নির্দ্দিষ্ট বিধানের অন্যথাচরণে অসমর্থ হইয়া বলিলেন,—"বৎসগণ! আমি তোমাদিগকে কৃতকর্ম্মের নিমিত্ত অনুতপ্ত হইতে দেখিয়া তুষ্ট হইলাম। কিন্তু আমি নিয়মের অনুবর্ত্তী কার্য্য করিতে বাধ্য থাকায় তোমাদিগকে এবারেও ভবকারাগার প্রতিগমনের আদেশ করিতে হইতেছে, তবে অনুতপ্ত হইয়াছ বলিয়া এবার সংসারদ্বীপে গিয়া যাহাতে অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছন্দে থাকিতে পার, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিতেছি। কোনও চিন্তা নাই।"

জীব নিজকৃত অপকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হইলেই ভগবানের অনুগ্রহ লাভ করিতে পারে, ইহা কি জীবের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুকম্পা নহে? বিশেষতঃ পাপানুগত আত্মবিস্মৃত জীবও মৃত্যু দ্বারা তাঁহার নিকট নীত হইয়া যদি অনুতাপাশ্রু বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করে, তবে করুণানিধান কৃপা-পরতন্ত্র হইয়া তাঁহার আত্মার উৎকর্ষ সাধন নিমিত্ত তাহাকে উন্নত শ্রেণীভুক্ত করিয়া সংসারে ভোগক্ষয়ের জন্য প্রেরণ করেন, এই রূপে ভগবানের

অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইলেই, জীব ধর্ম্মভীরু পবিত্র ঋষিবংশে বা রাজবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। এইবার যদি সেখানে পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল বা অতীত দুঃখ স্মরণ রাখিয়া সতর্কভাবে কাল যাপন করিতে পারে, তবে কাল পূর্ণ হইলে কৃতান্ত গিয়া তাহাদিগকে লইয়া আসেন। আর তাহাদিগকে সংসারে যাইতে হয় না।

এই সময় দেখিলাম, ধর্ম্মরাজ কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বলিলেন,—

"প্রভো! দাস নিকটে উপস্থিত; ঐ দম্পতিযুগলকে আনয়ন

করিয়াছি।" উঁহাদের প্রতি যেরূপ বিধিবিধান যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহা করিতে আজ্ঞা হউক। দাস এক্ষণে রাজকীয় কার্য্য সম্পাদন জন্য বিদায় প্রার্থনা করিতেছে।"

মহারাজ আনন্দময় জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ সে দম্পতী যুগল কোথায়?"

যমদেব, আমার শিষ্য সেই নবীন সন্ন্যাসী ও তাঁহার পত্নীকে দেখাইয়া দিলেন।

আনন্দময় মহারাজ বলিলেন—"কৃতান্ত! তোমায় দর্শন করিলে আমার হৃদয়কন্দরে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উদ্ভূত হয়। বিশুদ্ধহৃদয়ে সরলতা বর্ত্তমান থাকিলে সকলেই যে, তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার মত কর্ত্তব্যপরায়ণ দ্বিতীয় নাই। তোমার উপরে আমার এই বিশাল সাম্রাজ্যের ভারার্পণ করিয়া আমি নিশ্চিন্ত থাকি। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, ঐ দম্পতীর কর্ম্মফল কি প্রকার,—তাহা সবিস্তারে আমার নিকটে ব্যক্ত কর।

যম কহিলেন—"প্রভো! আপনি সর্ব্বান্তর্য্যামী, তথাপি দাসের নিকট যখন শ্রবণাভিলাষী হইয়াছেন, তখন দাস আপনার অনির্ব্বচনীয় শক্তির কৃপায় যতটুকু উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, তাহাই চরণপ্রান্তে নিবেদন করিতেছে, শ্রবণ করিতে আজ্ঞা হউক।

এই ব্যক্তি আনন্দধামের অধিবাসী হইবার জন্য ভবকারাবাসে থাকিয়া বহুস্থান ভ্রমন করিয়াছে, বহুতীর্থ দর্শন করিয়াছে, বহু ভেকধারী সাধুর উপদেশ গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সম্যক্ ফল প্রাপ্তি বিষয়ে বঞ্চিত হইয়া নিরাশ হৃদয়ে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা এক প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী সাধুর দর্শন প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ

করে,—সন্ন্যাসীও কৃপা পূর্ব্বক ইহাকে তত্ত্বজ্ঞানে জ্ঞানী করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু এই ব্যক্তির উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও পূর্ব্ব কর্ম্মক্ষয় না হওয়ায় ভার্য্যার মনে কষ্ট দিয়াছে। পতিব্রতা সতী রাত্রে নিদ্রাভঙ্গের পর উঠিয়া পরম দেবতা স্বামীকে দেখিতে না পাইয়া বড়ই চঞ্চলা হইয়া পড়েন, এবং প্রভাতে উঠিয়া স্বামীর অনুসন্ধান করিতে থাকেন।

এইরূপে কয়েক দিন অতিবাহিত হইল, তথাপি স্বামী-দেবতার আগমন না হওয়ায় সতী তখন সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বামী-অন্বেষণে বহির্গত হন। তদবধি বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়া নানাবিধ দুঃখঃ কষ্ট সহ্য করিয়াও সতীত্বরত্নের শক্তিবলে অবশেষে অমরনাথে গমন পূর্ব্বক স্বামী-দেবতার সাক্ষাৎ লাভ করেন।

সতীর স্বামী সেখানে ঐ সন্ন্যাসীর শিষ্যত্ব লাভ করিয়া অবধূত-রূপে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতেছিল। সতী স্বামীকে ঐরূপে দর্শনে পরম পুলকিত হইয়া গৃহে লইয়া যাইবার জন্য সন্ন্যাসীর নিকটে বহু কাকুতি মিনতি করেন, সন্ন্যাসীও উহাঁদিগকে গার্হস্থ্যাশ্রমে গমন করিয়া দাম্পত্যধর্ম্ম প্রতিপালন করিতে আদেশ প্রদান করেন। কিন্তু সতীর কাল পূর্ণ হওয়ায় সতীরাণীর কৃপায় তখন পার্থিব ভোগদেহ পতন ও উহাঁর মৃত্যু হয়,—বিধির বিধানে সেই দিবস সতীর স্বামীরও কাল পূর্ণ হয়।

তখন সতীরাণী আপন তেজঃপ্রভাবে সতী ও তাঁহার স্বামীকে এই আনন্দধামে আনয়ন করেন। সতীর তেজোবলে এবং তদীয় পুণ্যফলে তাঁহার স্বামী এই আনন্দপুরীতে আগমনে সমর্থ হইয়াছে। সতীরাণী নিজে ইহাদিগকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন। কিঙ্কর তাঁহাকে ঐ কার্য্যে সহায়তা করিয়াছে মাত্র।"

কৃতান্তের বাক্যশ্রবণে মহারাজ আনন্দপুরুষ কহিলেন—"বৎস কৃতান্ত! সতীরাণী আমার অতি স্নেহের কন্যা। আমি তাঁহাকে সংসারদ্বীপের সতীরমণীগণের রক্ষণাবেক্ষণ ও তাহাদিগকে অন্তে এখানে আনয়ন জন্য নিযুক্ত করিয়াছি। কিন্তু সতীগণের পুণ্যফলে যে, তাহাদের স্বামিগণ এখানে আগমন করিবে, এরূপ বিধি আমার বিধি-বিধানের মধ্যে নাই। অতএব সতীরাণী কেন এবম্বিধ কার্য্য করিলেন, তাহা আমি শুনিতে চাই। এক্ষণে সতীরাণী কোথায় আছেন, তাঁহাকে একবার এখানে আহ্বান কর।"

কৃতান্ত করযোড়ে বিদায় লইয়া, তৎক্ষণাৎ সতীরাণীকে ডাকিয়া আনিলেন।

সতীরাণী তথায় আগমন করিয়া কহিলেন—দেব! "পিতঃ। কি জন্য আমাকে আহ্বান করিয়াছেন?"

মহারাজ আনন্দপুরুষ কহিলেন—"তুমি ঐ সতীরমণীর সহিত উহার স্বামীকে এস্থানে কেন আনয়ন করিলে? আমার নিয়ন্ত্রিত কোন বিধানের মধ্যেই ত এরূপ বিধি নাই।"

সতীরাণী কহিলেন—"পিতৃদেব! আপনার নিয়োগক্রমে দাসী সতত সচেষ্টভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। কখনও কোন বিধি ব্যতিক্রম করিতে সাহস করে না। বর্ত্তমানে এই সতীনারী স্বগৌরবে আপনার সতীত্ব রক্ষা করিয়া চিরদিন আমার শরণাপন্ন ছিল; সম্প্রতি ইহার মৃত্যু হওয়ায় উহাকে আনয়ন করিতে যাই। ইহার স্বামীও সাধুপুরুষের উপযুক্ত উপদেশে আপনার কর্ম্মফল ক্ষয় করিতে থাকে। সামান্য যৎকিঞ্চিৎ যাহা অবশিষ্ট ছিল, তাঁহাও সতীর তেজঃপ্রভাবে ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। আমি তাই কৃপাপরায়ণ হইয়া এই দম্পতীকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। যমরাজের হস্তদ্বারা এখনে না আসিলে

কেহই আপনার সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারে না বলিয়া আমি উহাঁ-দিগকে যমরাজের হস্তে অর্পণ করিয়াছি। প্রভো! বিচারপতে! যদি আমার কৃত কর্ম্মে কোনও ত্রুটী হইয়া থাকে, দাসী বলিয়া তাহা মার্জ্জনা করিতে আজ্ঞা হয়।"

সতীরাণীর কথা সমাপ্ত হইলে মহারাজ আনন্দময় বলিলেন,— "ভয় নাই। আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট আছি। এক্ষণে তোমার মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হউক। আমার ঐ সন্তানযুগলের অতি উৎকৃষ্ট স্থানে বাসের ব্যবস্থা করিব। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আপনার কার্য্য সম্পাদনার্থ গমন করিতে পার।"

তৎপরে মহারাজ আনন্দময়পুরুষ আমার দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া বলিলেন—বৎস! তুমি সতীরাণীর কৃপায় এবং নিজ তপোবল ও সুদৃঢ় অধ্যবসায় জন্য এই আনন্দধাম দর্শনে সক্ষম হইয়াছ। ইহা দর্শনের অবশ্যপ্রাপ্য পুরস্কারস্বরূপ তুমি দেহান্তে এখানে আগমন করিয়া নিজ বাটীতে বাস করিতে সক্ষম হইবে।"

তদনন্তর কৃতান্তদেবকে কহিলেন—"তুমি এই যুগল দম্পতীকে যত্ন পূর্ব্বক তোমার আলয়ে আমার পথভ্রষ্ট সন্তানগণের কর্ম্মফলভোগ দর্শন করাইয়া, এই সদানন্দ ধামে উহাদিগের পূর্ব্বাবাসে রাখিয়া যাইবে। এক্ষণে তোমরা সকলে স্ব স্ব কর্ম্মে গমন কর।"

মহাপুরুষের বদনকমল হইতে এই আদেশ-বাক্য নির্গত হইলে, সভাভঙ্গের মনোহর স্তোত্রাদির পর সভাসদ্ প্রভৃতি সকলেই বিদায় গ্রহণ করিলেন। তোরণরক্ষী সত্য ও বিবেক প্রভৃতি সেস্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

আমি তখন কোথায় যাইব, এই বিষয়ে চিন্তা করিতেছি, এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম, আমার পশ্চাতে সতীরাণী অতি প্রশান্ত মূর্ত্তিতে দণ্ডায়মানা আছেন। আমি তাঁহাকে কহিলাম, "দেবি! ঐ শিষ্যদম্পতী এখন কোথায় বাস করিবে, আর আমিই বা এক্ষণে কোথায় যাইয়া কি করিব?"

দেবী কহিলেন—"ভাই! তোমার সরলতা সন্দর্শনে আমি নিতান্ত মুগ্ধ হইয়াছি।—

ঐ দম্পতী যমালয় দর্শন করিয়া আসিয়া সুমতি ও শান্তি প্রভৃতি দেবীগণের এবং আনন্দময়-রাজপুরীরক্ষক সত্য ও বিবেক প্রভৃতি দেবপুরুষগণের তত্ত্বাবধানে এক রমণীয় নিবাসে সদানন্দে বাস করিবে।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া রাজরাজেশ্বরের মহাসভায় গমন, স্তুতি-গাথা গান, ভগবদ্দর্শন, তাঁহার আদেশ পালন এবং সুমতি সত্য শান্তি ও বিবেক প্রভৃতি দেবদেবীগণের সহিত বাস, তাঁহাদের কৃপায় ভগবান্ বিশ্বনাথের ও ভগবতী যোগমায়ার বিবিধ মহা ঐশ্বর্য্য দর্শন ও মাহাত্ম্য শ্রবণ করাই ঐ দম্পতীর নিত্য কর্ম্ম। ঐ দম্পতী এখন হইতে এই আনন্দধামের পুনরধিবাসিত্ব পাইয়া স্বচ্ছন্দে বাস করিবে।

কিন্তু তোমাকে আবার সেই মোহিনীমায়া-শাসিত সংসার-দ্বীপে গমন করিয়া যে দুঃখ পাইতে হইবে, এই চিন্তা করিয়া আমার চিত্ত পুনঃ পুনঃ ব্যথিত হইতেছে। তবে তোমারও দেহান্তে যাহাতে এই আনন্দধামে বাস হয়, তজ্জন্য আমি প্রিয়—ভগিনী সুমতির মন্ত্রণাক্রমেই তোমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছি। সেই সুমতিদেবী এক্ষণে মায়ার সহিত সংগ্রাম করিবার জন্য

সংসারদ্বীপে গমন করিয়াছেন। এই সময় তুমি সংসারে যাও —সেখানকার নরনারীগণকে প্রিয় ভগিনী সুমতির আশ্রিত করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া জ্ঞান—উপদেশ প্রদান কর। তোমার নিকট মোহিনীমায়া কতক পরিমাণে পরাজিত হইয়াছে; তথাপি ঐ নেংটী কমণ্ডলু প্রভৃতির উপরে আসক্ত হইয়া এখনও কিয়ৎ পরিমাণে অবস্থান করিতেছে। যাহা হউক, তুমি মহারাজ আনন্দময়ের ভবকারাবাসী পুত্রকন্যাগণকে যত্ন করিয়া সুমতির অধীন হইবার উপদেশ দিবে—একবার যদি তাহারা সুমতির অধীন হইতে পারে, তবে ক্রমে সত্য, বিবেক, শান্তি প্রভৃতি সকলেই সে স্থানে গমন করিবে। এবং ইহাদিগের আশ্রিত হইলে জীব মায়ার মোহজাল ছিন্ন করিতে সক্ষম হইবে।"

এই সময় একটী অপরিচিত মূর্ত্তি আসিয়া ব্যস্তভাবে সতী-রাণীকে বলিল—"আপনি কি করিতেছেন? নিত্যকর্ম্মের সময় অতিবাহিত হইয়া গেল,—চলুন।"

সতীরাণী তাহার সহিত গৃহবহির্ভাগে চলিয়া গেলেন। আর কে যেন একখানি কৃষ্ণবর্ণ স্থূল বস্ত্রে আমার সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া দিল এবং সবলে নিবিড় অন্ধকারময় এক পুরীমধ্যে নিক্ষেপ করিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সংগ্রাম।

বিপুল কষ্টে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। আনন্দধাম হইতে একবারে দুর্গন্ধপূর্ণ অন্ধকারাবৃত পুরী মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া দুঃখে মধুসূদন নাম করিতে আরম্ভ করিলাম।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সতীরাণী আসিয়া আমাকে মুক্ত করিলেন। তাঁহার কৃপায় আমি এক পর্ব্বতোপরি উপস্থিত হইলাম,—সতীরাণী কার্য্যান্তরে গমন করিলেন।

আমি পর্ব্বতোপরি উঠিয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে পর্ব্বত হইতে এক বিস্তীর্ণ নগর সন্দর্শনে মোহিত হইলাম।

নগরটীর বর্ণনা করা অসাধ্য না হইলেও দুঃসাধ্য। নগর খুব বৃহৎ এবং নানাবিধ সাজ-সজ্জায় সজ্জীভূত, যে স্থানে আমি দাঁড়াইয়া ছিলাম, তথা হইতে নগরের প্রায় সকল স্থানই দৃষ্টিগোচর হইতেছিল। নগরে অসংখ্য সুন্দর সৌধ সুপ্রশস্ত রাজপথ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন বিবিধ তরুলতা-রমণীয় পুষ্পবন, কমনীয় কমল-কুমুদ-পরিশোভিত সরোবর, কলনাদিনী তরঙ্গিণীও দেখিতে পাইলাম। দর্শনে কিঞ্চিৎ আহ্লাদও হইল।

কিন্তু অচির-দৃষ্ট নিত্যানন্দ-নিলয় সদানন্দধামের কথা স্মরণ হওয়ায়, ইহা তুলনায় হীন ও নিষ্প্রভ বলিয়াই বোধ হইল। সেখানকার অধিবাসী নরনারী ক্ষুদ্রকায় আনন্দশূন্য এবং মলিন।

তাহাদিগের অবস্থা সন্দর্শনে আমার হৃদয়মধ্যে প্রভূত বেদনা উপস্থিত হইল। আমি উত্তমরূপে দর্শন করিবার জন্য আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলাম।

দেখিলাম নিজ নিজ কর্ম্মফলের জন্যই ঐ সকল মানব ঐ প্রকার ক্ষীণকায় এবং রোগ—শোক—দুঃখগ্রস্ত হইয়া অন্তরে যাতনা ও মুখে হাসির ছটা-বিকাশে দিন কাটাইতেছে।

এই অবস্থায় আমি পর্ব্বতের এক স্থানে দাঁড়াইয়া ঐ সকল দর্শন করিতেছি, এমত সময়ে দেখিতে পাইলাম, নগরের এক প্রান্ত ভাগে দুইটী পুরুষ এবং তিনটী রমণী আপন আপন কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। তাঁদের অঙ্গের জ্যোতি অপূর্ব্ব — এবং তাঁহাদের অঙ্গের জ্যোতিতে ঐ নগরের সেই অংশ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ইহাঁদের মধ্যস্থ একটী রমণী সেই হতভাগ্য শ্রীভ্রষ্ট হীনবল মানবাকার নরনারীগণকে তাঁহার মধুর স্বরে আহ্বান করিতেছেন কিন্তু কেহই তাঁহার কথা শ্রবন করিতেছে না। যেন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া দলে দলে সকল লোক পলায়ন করিতেছে।

অনেকক্ষণ পরে একদলস্থ কয়েকজন লোক ফিরিয়া আসিল এবং উহাদিগের দিব্য শরীর-বিনিঃসৃত স্নিগ্ধ কিরণ—প্রভায় তাহারাও যেন নব বলে বলীয়ান হইয়া উঠিল।

তখন সেই রমণী বলিলেন—"ভাই ভগ্নীগণ! কথা স্মরণ আছে কি? এ সংসারদ্বীপে কি করিতে আসিয়াছিলে, কি করিয়া যাইবে? মোহিনী মায়ার জালে এবং কুচিন্তা রাক্ষসীর আশা-মরীচিকায় আবদ্ধ হইয়া তোমরা আত্মবিস্মৃত হইয়া রহিয়াছ; কিন্তু তোমাদের স্বদেশের কথা স্মরণ কর। পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছ, আর মহারাজ

আনন্দময়ের নিকট স্বীকার করিয়া আসিতেছ যে, আমরা এবার ভবকারাগারে গমন করিয়া আর মোহিনী মায়ার অধীন হইব না, কুচিন্তার ছলনায় ভুলিব না। কিন্তু এখানে আসিয়াই সে সকল ভুলিয়া যাইতেছ। আমাদের কথা শ্রবণ কর—আমাদের সঙ্গে আইস, তোমাদিগকে উদ্ধার করিব; পথ দেখাইয়া লইয়া যাইব। আর এ শোক, তাপ, জরা, মরণ ও দুঃখ দারিদ্র্য বার বার ভুগিতে হইবে না।"

এই বাক্য শ্রবণে, যাহারা আগমন করিয়াছিল, তাহারা তাঁহাদিগের শরণাগত হইল।

আমি আরও কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া সেই দিব্য নরনারীগণকে সুস্পষ্ট ভাবে দর্শন করিতে সক্ষম হইলাম। তাঁহারা আমার পূর্ব্ব-পরিচিত—সত্য, বিবেক, সুমতি, শান্তি ও দয়া প্রভৃতি এ স্থানে আসিয়াও তাঁহাদিগের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হইয়া আমি সমধিক আনন্দিত হইলাম।

যাহা হউক, সেই সকলের অগ্রবর্ত্তিণী সুমতির আহ্বানে এবং সত্য ও বিবেকাদির সস্নেহ প্রিয়সম্ভাষণে সংসারনিবাসী যে সকল নরনারী উহাঁদের সমীপবর্ত্তী হইয়াছিল, তন্মধ্যে কয়েকজন বিনীত-স্বরে কহিল—"আমরা মায়া মোহাদির কৌশলে আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকাতে আপনাদিগকে এতক্ষণ চিনিতে পারি নাই। এক্ষণে সম্যক্ চিনিতে পারিয়াছি,—অতএব আমাদিগকে ক্ষমা করুন, রক্ষা করুন। দয়া প্রকাশে, আমাদিগের উপায় কি, তাহাই বলিয়া দিন।"

শরণাগত ব্যক্তিবর্গের উপর করুণা করিয়া শান্তি বলিলেন—ভাই ভগিনীগণ! এই ভবধাম জীবের পরীক্ষামন্দির। জীবগণ

পরীক্ষা প্রদান জন্যই এখানে সমাগত হইয়া থাকে। এখানে মায়ার মোহজাল সতত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে - জীব সেই সকল জালাবদ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হয়। যাহা অসৎ ও অনিত্য, তাহাতেই মত্ত হইয়া থাকে।' আমরা সেই মহারাজ আনন্দময়ের আদেশানুসারে তোমাদিগকে সেই জাল ছিন্ন করত উদ্ধার করিয়া লইবার জন্যই এখানে আগমন করিয়াছি। যাহাতে তোমরা মায়ার মোহিনীশক্তি অতিক্রম করিয়া তোমাদের স্বদেশ আনন্দধামে গমন করিতে পার, তজ্জন্য নিয়ত চেষ্টা করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। আর ভুলিয়া মায়ার কুহক-জালে সমাচ্ছন্ন হইও না, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সেই আনন্দপুরীতে গমন পূর্ব্বক সুখে বাস করিতে পারিবে।

এই ভবকারাগারে আসিয়া জীবগণের সাধুসঙ্গই একমাত্র উদ্ধারের উপায়। কিন্তু মোহিনীমায়ার ছলনায় পতিত হইয়া জীবগণ সাধুসঙ্গকেই ক্রূর অসুখকর জ্ঞান করে, এবং পাপসহচর-দিগের সরলতাময় সঙ্গলাভে অত্যন্ত ইচ্ছুক হইয়া পড়ে। ক্রমে সেই ভয়ঙ্কর পাপসহচরগণের সহবাসে তাহাদের চিত্ত কলুষিত হয়, এবং ক্রমে ক্রমে পাপাদির অধীন হইয়া পড়ে।

পাপের বশীভূত হইলে তাহাদের নিকটবর্ত্তী হইবার সাধ্য ভাল লোকের আর থাকে না। আমি, সুমতি, সত্য, বিবেক ও দয়া সকলেই তখন তথা হইতে নির্ব্বাসিত হই। কুমতি, অশান্তি, পাপসহচর রিপুগণ প্রভৃতি তখন তাহাদিগকে লইয়া পাপক্রীড়া করিতে থাকে। তৎফলে তাহাদের হৃদয় পাপকালিমায় সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে।

জীবের হৃদয় পাপকালিমায় সমাচ্ছন্ন হইলে আর তাহার হিতা-হিত জ্ঞান থাকে না। তাহারা তখন তাহাদের স্বদেশের কথা

ভুলিয়া যায়,—মহারাজ আনন্দময়ের উপদেশবাণী বিস্মৃত হয়। যাহা তুচ্ছ—যাহার নাশ আছে, সেই সেই অবান্তরিত পদার্থকে সত্য এবং অবিনাশী ভাবিয়া তাহাতে পূর্ণরূপে মত্ত হয়। তখন আসক্তির প্রলোভনে জেলখানার কাঁটাল বৃক্ষ ছাড়িয়া আসার ন্যায় কষ্ট অনুভব করে। মিছে আমার আমার করিয়া, সর্ব্বদা দেহাদিতে আত্মজ্ঞান করে।

দস্যুতা, চৌর্য্য, বিশ্বাসঘাতকতা, পরদারগমন প্রভৃতি কোন কদর্য্য কার্য্যই তখন তাহার অনিষ্টকর বলিয়া জ্ঞান হয় না। ক্রমে ক্রমে তাহারা এতদূর অধঃপতিত হয় যে, মৃত্যু বলিয়া যে, সত্য বিষয় তাহাদের সম্মুখে সর্ব্বদা নৃত্য করিতেছে, তাহাও বিস্মৃত হয়। তাহারা যেন কখনও মৃত্যুর অধীন হইবে না। কখনও যে তাহাদের দেহ বিষয়াসক্তি ও আত্মীয় স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়া মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবে, এরূপ বিশ্বাস করে না।”

ভবকারাবদ্ধ সেই সকল জীব—যাহারা সুমতি প্রভৃতির অনুগত হইল,—তাহারা সে কথাগুলি হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইল।

আমি সেই অদ্ভুত দৃশ্য দর্শন করিয়া পর্ব্বতোপরি বিস্মিত মনে বসিয়া রহিলাম।

আমি সেখানে বসিয়া বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। এমত সময় অনেক চিন্তার পর সতীরাণীর কৃপাবলেই বোধ হয় দিব্য দর্শন লাভ হইল। আমার মনে উদয় হইল—আমাদের এই দেহ এক একটি ক্ষুদ্র রাজ্য—এই রাজ্যের রাজা জীবাত্মা। হৃদয়নগর নামক দেহান্তর্গত রাজধানীর মধ্যে মহারাজ জীবাত্মা পরমাত্মারই আংশিক শক্তি) বাস করিয়া থাকেন। মন জীবাত্মার মন্ত্রী, এবং সত্য বিবেক প্রভৃতি তাঁহার সভাসদ্। জীবাত্মা বিচক্ষণ রাজা

হইলেও মন্ত্রী মনের মন্ত্রণার উপরেই তাঁহার সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়া রহিয়াছে। মন যাহা করে, তাহাই হইয়া থাকে। মনের কতকগুলি সহকারীও আছে—সেই সকল সহকারিগণের সহায়তায় মন-মন্ত্রী রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এদিকে নিষ্কণ্টকে রাজ্য পরিচালন হইতে থাকে, ওদিকে অলক্ষ্যে সহসা সেই ত্রিবর্গ লাভের উপায় দেহরাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য বিপক্ষ সৈন্য আসিয়া সমবেত হয়। বিপক্ষের রণদুন্দুভি বাজিয়া উঠে। মহারাজ জীবাত্মা শত্রুর আক্রমণ বুঝিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠেন বটে, কিন্তু মন্ত্রী মন তাঁহার সুশিক্ষিত সেনাধিনায়ক সত্য, ও বিবেককে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধার্থে সুসজ্জিত করিয়া প্রেরণ করিয়া থাকে। হস্তপদাদিরূপ প্রজাবর্গও সত্য ও বিবেকের সাহায্যার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কার্য্যক্ষম থাকে।

কিন্তু সকল যত্ন—সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া অনেক সময় সেই বিপক্ষ সৈন্যেরই জয়লাভ হয়। অবিবেক, অসত্য ও পাপ তাহাদের দলাধিপতি।

তাহাদের করে অনেক স্থলেই বিবেকাদি আহত ও বিধ্বস্ত হইয়া পড়েন। অল্প স্থানেই বিবেকাদির জয় হয়।

যেখানে পাপাদির জয় হয়, সেখানে জীবাত্মা তাহাদের দ্বারা পাশাবদ্ধ ও বন্দী হন। মন তখন তাহাদেরই আদেশানুসারে, তাহাদেরই মন্ত্রিত্ব করিতে বাধ্য থাকে। বিবেকাদি আহত, অবমানিত ও বিধ্বস্ত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত হন। এরূপ স্থলে মহারাজ জীবাত্মার পরম সুহৃদ্ যে ধর্ম্ম, তিনি কিছুক্ষণ নব আক্রমণকারী পাপাদি শত্রুদলের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া অবশেষে ক্ষতবিক্ষত শরীরে পলায়ন করেন। তখন ভয়বিহ্বল মন্ত্রী মন

তাঁহাদিগকে দেখিতে না পাইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়া ক্রমশঃ দুর্ব্বল ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। ঐ সময় সুযোগ বুঝিয়া পাপ প্রফুল্ল বদনে হৃদয়নগর মধ্যে সসৈন্যে প্রবেশ করে। এবং বল ও সহায়বিহীন মন্ত্রী মনকে সামান্য যুদ্ধেই পরাস্ত করিয়া নিজের বশীভূত করিয়া লয়। তখন পাপ গম্ভীর স্বরে বলে, "মন! তোমার পূর্ব্ব প্রভুর ধনাগার ও কারাগার কোথায় আমাকে খুলিয়া দাও।"

অধীন মন তখন কি করে, উপায়ান্তর না দেখিয়া হৃদয়-নগরস্থিত সেই অমূল্য রত্নভাণ্ডার সম্মুখে উপস্থিত করিল। এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্বার খুলিয়া দিল। তন্মধ্যস্থিত অমূল্য রত্ন সকলের সমুজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত নগর আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন মন্ত্রী মন পূর্ব্ব প্রভু ও তাঁহার পরম বন্ধু একমাত্র ধর্ম্মকে স্মরণ করিয়া মর্ম্মব্যথায় কাতর হইয়া অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু পাপ সেই রত্নসমূহের সমধিক উজ্জ্বলতা দেখিয়া কম্পিত হইয়া বলিল,—"উঃ! এ কি? বৈদ্যুতাগ্নির ন্যায় আমার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতেছে! হৃদয়ে জ্বালা বোধ হইতেছে কেন? ইহা ভিন্ন—তোমার হতভাগ্য পূর্ব্ব প্রভুর কি আর কোন ধনাগার নাই?" মন সভয়ে ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক বলিল "আজ্ঞা না, মহারাজ জীবাত্মার ইহাই একমাত্র ধনাগার, ইহার মধ্যে চারিটি পৃথক ভাণ্ডার আছে। আমি আমাদের মহারাজের অযচ্ছল দানের আদেশ প্রাপ্তে এই ভাণ্ডারচতুষ্টয় হইতে মুক্ত হস্তেই দান করিতেছিলাম। এ অক্ষয় ভাণ্ডারে কখনও অভাব হইতে দেখি নাই।"

পাপ রুক্ষস্বরে বিকৃত বদনে বলিল—"দেখ মন্ত্রী! তুমি এখন আমার সম্পূর্ণ অধীন। তোমার পূর্ব্ব প্রভুর প্রশংসা শুনিতে চাই না। এই জ্বালাকর চক্ষুঃশূল বস্তু কয়েটির নাম কি?

আর কোন্ গুণেই বা তুমি রত্ন বলিয়া এ সকলের পরিচয় দিতেছ ?”

পাপের অবমানকর বাক্য শুনিয়া মন মন্ত্রী মর্ম্মাহত হইয়া, কোন উত্তর দানের ইচ্ছা না থাকিলেও, অধীনতাহেতু কাতরভাবে বলিল, “প্রভো! এই ভাণ্ডার চারিটিতে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাস নামে চারি প্রকারের রত্ন আছে।” এই রত্নের গুণ আপনি কি বুঝিবেন ? ইহাদের পরস্পরের মধ্যে এমনই আকর্ষণী শক্তি নিহিত আছে যে, কোন ব্যক্তি সৌভাগ্যবলে যদি ইহাদের একটিকে লাভ করিতে পারেন, তবে অপর তিনটিও অযাচিতরূপে তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করে। এবং সেই ব্যক্তি পূর্ব্ব দুষ্কৃতি জন্য দণ্ড ভোগ কালের অপূর্ণতা হেতু ভব-কারাগারে থাকিতে বাধ্য হইলেও, এই রত্নসমূহের মহাশক্তি-প্রভাবে তাঁহার অচিরাৎ এমন শ্রীবৃদ্ধি হয় যে, তিনি সমস্ত সুখ-দুঃখের অতীত হইয়া সাধুশ্রেষ্ঠ পরমহংসভাবে সদানন্দে এই ভব-সংসারেই বিচরণ করেন। এবং কাল পূর্ণ হইবামাত্র শরীর-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কারামুক্ত হইয়া মহা-আনন্দে সদানন্দ ধামে যাত্রা করেন।”

পাপ, মন-মন্ত্রীর নিকট এই রত্ন চতুষ্টয়ের এবং এই রত্নাধিকারীর প্রশংসা বাক্য শ্রবণে অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, কর্কশস্বরে বলিল, “দেখ মন! তুমি কি ভাবিয়াছ ? আমার অধিকৃত রাজ্যে বসিয়া, আমারই অধীন থাকিয়া তোমার পূর্ব্ব প্রভুর প্রশংসা করিবে আর ঐ গ্লানিকর বস্তুগুলি লইয়া দম্ভ করিবে ? কখনই না। সুখী হইতে চাও, যদি নিজের প্রতি মমতা থাকে, তবে আমার কথা শুন। এই কুৎসিত তুচ্ছ বস্তু চারিটিকে এই মুহূর্ত্তেই ঐ

গৃহবহিষ্কৃত করিয়া অতলসাগরে নিক্ষেপ কর,—গৃহ সুমর্জ্জিত করিয়া ফেল।"

মন কি করিবে, পাপের অধীনতাহেতু সজল নয়নে বড় দুঃখে জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি, বিশ্বাস, চারিটী অমূল্য নিধিকেই বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হইল। তখন পাপ জীবাত্মার হৃদয়নগরস্থিত ধনাগার পরিশূন্য দর্শনে নিজের অভীষ্ট সুন্দর রত্ন সকল রক্ষার উপযোগী বুঝিয়া মহা তুষ্ট হইল।

প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! একবার নিদ্রিত হইবার পূর্ব্বে স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন। আমাদের প্রিয়তম পরম নিধি লাভের অক্ষয় সম্বল জ্ঞান, প্রেম, ভক্তি ও বিশ্বাসকে মন কি অবস্থায় পড়িয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। আর বলুন দেখি, এই ঘটনার সহিত সকলেরই আন্তরিক অবস্থার অনেক বা কিছু কিছু সামঞ্জস্য হই-তেছে কি না!

এই ঘটনার পরক্ষণেই পাপ প্রসন্নবদনে মনকে বলিল "এখন তোমার পূর্ব্ব রাজার কারাগার, কোথায় আমাকে দেখাও।" মন এইবার বড়ই সঙ্কটে পড়িল। কি করে, দ্বিরুক্তি না করিয়া পাপকে সঙ্গে লইয়া হৃদয়নগরের এক প্রান্তভাগে, দুর্গের ন্যায় প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানে উপস্থিত হইয়া, বিনীত বচনে বলিল "ইহাই কারাগার, দৃষ্টি করুন, দ্বার খুলিবেন না। বিশেষ বিপদ্ হইবে। এক্ষণে আমি আপনার আজ্ঞাধীন হইলেও, কাতর প্রার্থনা এই কারাগারের দ্বার কখন উন্মোচন করিবেন না। ইহার মধ্যে অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত দেহ-রাজ্যের কয়েকজন পরম শত্রু কয়েদ আছে। তাহারা এমন বল-বান্ ও ধূর্ত্ত যে, দ্বার খোলা শব্দ মাত্রেই অন্ততঃ একজন বাহির হইয়া পড়িবে। তখন বহু চেষ্টায়ও রক্ষা করিতে পারিবেন না। সঙ্গে

সঙ্গে আর কয়জনাও অক্লেশে কারামুক্ত হইয়া আপনার নব অধিকৃত এই হৃদয়নগর—রাজধানীকে এককালে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিবে।"

পাপ, মন্ত্রী মনের হিতকর কাতরোক্তি শ্রবণে, উগ্রভাবে বলিয়া উঠিল—"এ রাজ্যে এমন কার সাধ্য যে, আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। কাপুরুষের বাক্য আমি শুনিতে চাহি না। তুমি দ্বার উদ্ঘাটন কর, ক্ষতি হয় আমার হইবে। কোন বিপদ্ হয়, তাহার প্রতিবিধান আমি করিব। তোমার ক্ষতি বৃদ্ধি কি! আমি তোমার অত কথা শুনিতে চাই না।"

তখন অগত্যা মন মন্ত্রী কারাগৃহের দ্বার খুলিয়া দিল। দ্বার খোলার শব্দের সঙ্গে সঙ্গেই বন্ধনালয় হইতে ভীষণ শব্দ করিতে করিতে ছয় জন পরাক্রমী শত্রু অক্লেশে হৃদয়নগর মধ্যে আসিয়া প্রফুল্ল বদনে পাপের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল।

পাপ এতক্ষণ স্থিরভাবেই ছিল। এখন সম্মুখে স্ফীত-বক্ষ শত্রুগণকে দর্শনে আলিঙ্গন পূর্ব্বক আহ্লাদ-বিজড়িত বচনে বলিল—"বন্ধুগণ! তোমরা এখানে এ অবস্থায় কি জন্য আবদ্ধ হইয়াছিলে বল ত? এতদিন তোমাদের অদর্শনে বড়ই কাতর হওয়ায় প্রিয়তমা মহিষী আমাকে কহিলেন, তোমরা সত্য বিবেকাদি পাষণ্ডগণের মন্ত্রণায় শাসিত মনুষ্য-দেহরাজ্যের এই কারাগারে আবদ্ধ আছ। সেই দিন হইতে কি প্রকারে তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, এই চিন্তায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া, প্রিয়তমা কুচিন্তার সাহায্যে এখন কৃতকার্য্য হইয়াছি। এ রাজ্য এখন আমারই অধিকৃত, তোমাদের আর কোন চিন্তা নাই।"

তখন পাপ শত্রুগণকে এইরূপ স্বাধীনতা ও অভয় দিলে পর, উহাদের দলপতি, পাপকে শরীররাজ্যের বর্ত্তমান অধীশ্বর জানিয়া

মনে মনে সন্তুষ্ট হইল এবং পাপের প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে শত্রুদলপতি বলিতে আরম্ভ করিল,—

"মহারাজ! দেহরাজ্যের নিয়মরক্ষক কর্ম্মচারী শৈশবকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইবার পর, তাহার আসনে (সিটে) যৌবন যখন ভুবনমোহন বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া নিজের কর্ত্তব্য সাধন ও পরোপকারার্থে এখানে আগমন করে, ঐ সময় আপনার প্রিয়তমা-মহিষী কুচিন্তাসুন্দরী কোন সূত্রে সেই সংবাদ পাইয়াই আমা-দিগকে বলিয়া পাঠান এবং নিজেও অভিনব সুন্দর সাজে সাজিয়া দেহরাজ্যে আসিবার জন্য যৌবনের নিকট আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ভীরু যৌবন, পরস্ত্রীর সহিত এ রাজ্যে আসিতে প্রথমতঃ অনিচ্ছা প্রকাশ করে। মহারাজের মহিষী কুচিন্তাসুন্দরীর রূপে গুণে ক্রমে মোহিত এবং অপরিহার্য্য অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া অবশেষে স্বীকৃত হয়। কিন্তু তথাপি দাম্ভিক যৌবন রাজ্ঞীকে প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইল যে, কুচিন্তা তাহার সঙ্গে আসিয়া দেহরাজ্যে রাত্রি যাপন করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ অল্পকাল মাত্র বাস করিয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইতে হইবে। রাজ্ঞী হইলেও সরলা কুচিন্তা কি করিবেন? যৌবনের সঙ্গে মিলিয়া দেহ-রাজ্যে প্রবেশের বাসনা একান্ত বলবতী হওয়ায় তাহার প্রস্তাবেই স্বীকৃতা হন। এবং অপরিচিত প্রদেশে নিতান্ত একাকিনী আসিতে রাণীর পক্ষে একান্ত অসুবিধা ও মানহানির সম্ভাবনা জানাইয়া যৌবনের অনুমতিক্রমে তাহার সহিত আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া এই শরীররাজ্যে প্রবেশ করেন।

(প্রিয় পাঠক! ইহা কেবল গল্প মনে করিয়া শুনিবেন না আপনাপন আন্তরিক অবস্থার সহিতও মিলাইয়া দেখিবেন।)

কাহারও দুরাশার নিবৃত্তি নাই। দুরাকাঙ্ক্ষ ব্যক্তি আশার অতিরিক্ত অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইলেও যেমন তাহার উহা আরও অধিক পাইবার বাসনা জন্মে, শরীররাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিয়া এই রমণীয় রাজধানী হৃদয়নগর দর্শন করিয়া, এইখানে আসিয়া আশ্রয় পাইবার জন্য কুচিন্তারও সেইরূপ একান্ত বাসনা বা দুরাকাঙ্ক্ষা জন্মিল। অল্পকালের আলাপেই যৌবন কুচিন্তাসুন্দরীর প্রতি মনে মনে কিঞ্চিৎ অনুরক্ত হওয়াতেই, বোধ হয়, তাহার অমঙ্গল আশ-ঙ্কায়, আকাঙ্ক্ষা ত্যাগে অনুরোধ করিল এবং বিপদেরও ভয় দেখাইল। মহারাজ! আমরা নিবৃত্ত হইতে অনেক অনুরোধ করিলাম, কিন্তু রাজ্ঞী কুচিন্তা কাহারও কোন কথা গ্রাহ্য না করিয়া যৌবনের পশ্চাৎ পশ্চাৎ একাকিনীই হৃদয়নগরাভিমুখে ছুটিলেন। রাণী এই শত্রুশঙ্কুল প্রদেশে এক জন পর পুরুষের সহিত একাকিনী আসিবেন, আমরা আপনার চিরানুগত হইয়া নিশ্চেষ্ট থাকিব কি করিয়া, তাই আপনাকে জানাইতেও সময় পাইলাম না। অগত্যা রাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ এখানে আসিতে বাধ্য হইলাম।

মহারাজ, বলিব কি, এই নির্ব্বোধ-কার্য্যের ফল কিন্তু বিষময় হইয়া উঠিল। আমরা যেমন এই হৃদয়নগরমধ্যে প্রবেশ করিলাম, স্মরণ হইলে এখনও আতঙ্ক হয়, অমনি বৈদ্যুতাগ্নির ন্যায় তেজঃপুঞ্জ-কলেবর বিবেকনামক দুর্দ্দান্ত শত্রু আপন এই দুর্দ্ধর্ষশক্তি-শৃঙ্খলে একে একে আমাদের ছয় জনকেই বন্ধন পূর্ব্বক এই ভয়ঙ্কর কারা-গারে আবদ্ধ করিয়া ফেলিল।" এইরূপে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ এবং মাৎসর্য্য এই ছয় জনের অধিনায়ক—কামই সমস্ত আত্মকাহিনী বর্ণন করিল।

পাপ বলিল,—"ভাই, আমাদের ঐ প্রবল বৈরী—বিবেক, সত্য

এবং অন্যান্য শত্রুগণ আমাদ্বারা পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিয়াছে, এখন এ রাজ্য আমার অধিকারভুক্ত।" পাপের এই অনুকূল অনুমতি প্রাপ্ত হইয়া ঐ দুর্দ্দান্ত শত্রুগণ আমাদের হৃদয়নগর মধ্যে জয়পতাকা উড়াইয়া দিয়া পাপের জয় ঘোষণা করিয়া বেড়াইতেছে।

সেই জন্যই বলিতেছি, ভাই ভগ্নী সকল! তোমাদের হৃদয়নগরে পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুহৃদ সত্য ও বিবেক যখন অন্তর্হিত হইয়াছেন, যখন মহারাজ জীবাত্মা একমাত্র সুহৃদ্ ধর্ম্মের বিরহে ম্রিয়মাণ হইয়াছেন এবং যখন তাঁহার সুযোগ্য মন্ত্রী মন, পাপের পদসেবায় নিরত হইয়া, মোহান্ধ তোমরা – তোমাদিগকে অনন্ত নরকপথে আনিয়া ফেলিয়াছে, তখন এ অবস্থায় আর নিস্তারের উপায় নাই দেখিয়াই, পাপাদির অধীন হইয়া হস্তপদাদি তাহাদিগেরই তুষ্টিসম্পাদক কার্য্য করিতে আরম্ভ করে।

জীবাত্মা তাহাদিগের দ্বারা বন্দী ও নিজ্জিত অবস্থায় বড় কষ্টে দিনাতিপাত করেন। তিনি সেই পাশাবদ্ধ হইয়াই পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর অধীন হইয়া গতাগতি করিতে থাকেন।

আর যে স্থলে বিবেকাদি জয়ী হন, সে স্থলে জীবাত্মা স্বরাজ্যে স্বাধীনভাবে অবস্থান করিয়া আনন্দভাবে দিনাতিপাত করেন। হস্তপদাদি-প্রজাগণ সেখানে মনের অধীন থাকে—মন মন্ত্রী তখন বিবেকাদির কথায় পরিচালিত হয়।

দেহপুরীতে সর্ব্বত্রই এইরূপ সংগ্রাম চলিতেছে। এই সংগ্রামে মানবগণ যদি মনোযোগ পূর্ব্বক সুমতির কথা শ্রবণ করিয়া চালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই সুখে থাকিতে পারে। আর যদি মোহিনী-মায়ার মোহপাশে আবদ্ধ হইয়া—পাপাদির ছলনায় মুগ্ধ হয়, সে সময় বিবেকাদি হীনবল হইয়া পড়েন—মানুষ তখন নিতান্ত পিশাচের

ন্যায় হয়, তাহার কোন জ্ঞানই থাকে না। সে নিজ হিতাহিত বুঝিতে অক্ষম হইয়া পড়ে।

এবম্বিধ প্রকারে সৎ ও অসতে—সুমতি ও কুমতিতে, পাপ ও পুণ্যে এ দেহ-জগতে নিত্য সংগ্রাম চলিতেছে। সাবধান! সময় থাকিতে সকলের সতর্ক হওয়া উচিত।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃতান্তপুরী।

কাল কাহারও বশীভূত নহে। সেই ভুবননিয়ন্তার বিচিত্র বিধানানুসারে সময় পল, দণ্ড, প্রহরাদি ক্রমে দিবা-রজনীর আকার ধরিয়া অবিশ্রান্ত বিশ্বনিয়ন্তার মহাচক্রে সমভাবেই বিঘুর্ণিত হইতেছে। কাহারও প্রতি সময়ের পক্ষপাত নাই। রাজা, প্রজা; ধনবান্, দরিদ্র, স্ত্রী, পুরুষ প্রভৃতি সকলের প্রতিই সময়ের সমান অনুগ্রহ। সময় সর্ব্বদাই যেন—আমি চলিলাম আমি চলিলাম! বলিতে বলিতে প্রাতম ধ্যাহ্নাদি বিভাগক্রমে সকলকেই আপনার অবিশ্রান্ত গতি জানাইয়া যাইতেছে।

ইতিমধ্যে যে ব্যক্তি সময়ের ঐ গমনসূচক সঙ্কেত বুঝিয়া কিছু কর্ম্ম করিয়া লইতে পারে, সে-ই যথার্থ চতুর। আর যে নির্ব্বোধ হাসিয়া খেলিয়া পরনিন্দা পরচর্চ্চায় কাটায় এবং আপন অহঙ্কারেই বিভোর হইয়া থাকে, সে আর ঐ সময়ের সারগর্ভ উপদেশ শুনিয়াও বুঝিতে পারে না। সুতরাং তাহার অনিত্য শরীর-ধারণের সমস্ত সময়—জীবিতকাল কেবল বিনা বেতনে মোট-বহা ও ধাত্রীর কার্য্যেই কাটিয়া যায়। এইরূপে দেখিতে দেখিতে যখন তাহাদের শেষ দিনে যমকিঙ্কর আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন সেই সকল নরনারীর আর অনুতাপ ও আত্মগ্লানির পরিসীমা থাকে না।

অনন্তর আমি সেই পর্ব্বতোপরি ভ্রমণ করিতে লাগিলাম। যাইতে যাইতে এক অভিনব প্রদেশে উপস্থিত হইয়া, দেখিতে

পাইলাম—শৈলশ্রেণী-যুগলের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশে একটি অনতি প্রশস্ত দুর্গম পথ। যদিও সে সময় লোকের গমনাগমন দেখা গেল না, কিন্তু ঐ পথে যে লোক যাতায়াত করিয়া থাকে, চিহ্ন দেখিয়া তাহা বোধ হইল। সুতরাং আমি কৌতূহলাক্রান্ত মনে ধীরে ধীরে সেই পথে অগ্রবর্ত্তী হইলাম। কোথায় যাইতেছি, এ পথে গেলে কাহার আশ্রয়ে গিয়া উপস্থিত হইব, সেখানকার লোক আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিবে- মনে মনে এইরূপ নানা ভাবনা উপস্থিত হইলেও, সাহসে নির্ভর করিয়া চলিতে লাগিলাম। পার্ব্বত্য বন্ধুর পথে উপরে উঠিতে পুনঃ পুনঃ পদস্খলন হইতে লাগিল। কিছু দুর গমনের পরে বহুদূরে উর্দ্ধদিকে ধবলাকার একটি প্রকাণ্ড পুরী বলিয়া প্রতীতি জন্মিল। ভাবিলাম, উহা ঐ প্রদেশস্থ কোন প্রতাপান্বিত রাজার অথবা রাজপ্রতিনিধির বাসভবন হইবে।

তদনন্তর আমি যেন সেই পর্ব্বতোপরি বিষম বিপদে নিপতিত হইলাম। সঙ্গিহীন অবস্থায় কোথায় যাইব, কি করিব, ইত্যাকার চিন্তায় বিষণ্ণ হইয়া বসিয়া আছি, এমত সময়ে সতীরাণী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমি তাঁহাকে দর্শন করিয়া সাতিশয় পুলকিত চিত্তে কহিলাম —"দেবি! এক্ষণে আমি কোথায় যাইব, কি করিব, তাহা বলিয়া দিয়া এ দাসকে কৃতার্থ করুন।"

সতীরাণী হাসিয়া কহিলেন,—"তুমি এক্ষণে ভবকারাদ্বীপে গমন কর।"

আমি তাহার উত্তরে কহিলাম—"দেবি! আমার নিজের তথায় গমনে আর কোন শক্তি নাই। কি প্রকারে আমার প্রতি এ অন্যায্য আদেশ প্রদান করিতেছেন? আপনি আমাকে সেখানে

রক্ষা করিয়া না আসিলে কোন প্রকারেই আমি গমন করিতে সক্ষম হইব না।”

সতীদেবী কহিলেন—“তবে চল, আমি তোমাকে সংসারদ্বীপে রক্ষা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তাহার উত্তর প্রদান কর।”

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম—“কি বলুন।”

সতীদেবী কহিলেন—“না ভাই! অন্য কথা কিছুই নহে। তোমাকে সংসারদ্বীপে রক্ষা করিতে যাইবার দুইটি পথ আছে। তাহার কোন্ পথে যাইতে তোমার অভিলাষ হয়, তাহাই জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম ”

আমি কহিলাম—“দেবি! আমি সেই উভয়-পথের কোন পথের অবস্থাই সুপরিজ্ঞাত নহি। কোন্ পথ কি ভাবে অবস্থিত জানিতে পারিলে, কোন্ পথে যাওয়া বিধেয়, তাহা বলিতে পারি।”

সতীরাণী কহিলেন—“প্রথম পথ যাহা, তাহা তুমি আগমনকালে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছ। সে পথে যেরূপ ভাবে আগমন করিয়াছ, গমনকালেও তদ্রূপভাবেই যাইতে হইবে।”

আমি। দ্বিতীয় পথ কি প্রকার?

সতী। কৃতান্তপুরীর পন্থা,—যমালয় হইয়া যাইতে হয়।

আমি। আপনার বাক্য উত্তমরূপে বোধগম্য করিতে পারিতেছি না। সে পথ কিরূপ?

সতী। আমি যে দ্বিতীয় পন্থার কথা বলিতেছি, তাহাতে যমরাজার পুরীমধ্য দিয়া যাইতে হইবে।

আমি। দেবি! সে পথে যাইবার কোন অন্তরায় অবস্থিত আছে কি না, তাহা আমাকে বলিয়া আমার কৌতূহলাক্রান্ত চিত্তকে সুস্থির করুন।

সতী। না, কোন সবিশেষ অন্তরায় তাহাতে নাই। তবে কৃতান্তপুরীতে ভবকারাবাসী মানবগণ নিত্য নিত্য আনীত হইতেছে, নিত্য নিত্য কৃতান্ত কর্ত্তৃক তাহাদিগের বিচার হইতেছে, এবং নরকাদির ভীষণ যন্ত্রণা তাহারা প্রতিনিয়ত সহ্য করিতেছে। সে সকল দর্শন করিলে তোমার চিত্ত বিচলিত হইতে পারে, যেহেতু তুমিও সংসার-কারাবদ্ধ দেহধারী জীব।

আমি। হে দেবি! হে করুণাময়ি! আমাকে আপনি কৃপা পূর্ব্বক সেই পথেই লইয়া চলুন। আমার একান্ত বাসনা হইতেছে যে, আমি কৃতান্তপুরীতে পাপীদিগের অবস্থা সন্দর্শন করিয়া সংসার-কারাবাসে গমন করিব।

সতীরাণী হাস্য করিয়া কহিলেন – "তবে তাহাই হউক। তুমি আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আগমন কর। ইতিপূর্ব্বে কৃতান্তদেবকেই তোমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া তাঁহার বিচারকার্য্য দর্শন করাইতে আদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু তখন তিনি তোমাকে সঙ্গে না লইয়া শুদ্ধ তোমার সেই শিষ্য-দম্পতীকেই লইয়া গমন করিয়াছেন; সেরূপ করিবারও তাঁহার অন্য কারণ ছিল।"

আমি আর দ্বিরুক্তি না করিয়া সতীরাণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলাম।

সেই পথ ধরিয়া আমরা যমালয়ের দ্বারদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। তথায় উপস্থিত হইলে সতীরাণী কহিলেন—"ভ্রাতঃ! আপাততঃ তুমি এই কৃতান্তপুরীর যথা ইচ্ছা তথা পরিভ্রমণ কর—এবং তোমার যাহা যাহা সন্দর্শন করিবার অভিলাষ হয়, তাহাও দর্শন কর। আমার প্রভাবে তোমাকে কেহ বাধা প্রদান করিবে না।"

সতীরাণীর সেই আদেশবাণী শ্রবণ করিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"দেবি! হে মধুরভাষিণি! আপনি এক্ষণে কোথায় গমন করিবেন? আপনি ত আমার সঙ্গে সংসারদ্বীপে আমাকে রক্ষা করিয়া আসিতে গমন করিতেছিলেন। সহসা আপনার এমত কি কার্য্য উপস্থিত হইল যে, আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে উদ্যতা হইতেছেন?"

সতীরাণী কহিলেন—"ভ্রাতঃ! এক মুহূর্ত্তও আমরা বিনা কার্য্যে অতিবাহিত করিতে সক্ষম হই না। বিশ্বপতির বিশ্বকার্য্য সর্ব্বত্রেই এক নিয়মে চলিতেছে। তোমাদের ভবসংসারেও এই নিয়ম প্রচলিত, জীব বসিয়া বা নিদ্রিত অবস্থায়ও ছুটাছুটি করে। মহারাজ আনন্দময়ের আদেশে সর্ব্বদাই আমরা কার্য্য করিয়া ভ্রমণ করিতেছি। এক্ষণে কোন এক সতী রমণী বড় বিপদাপন্ন হইয়া প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে স্মরণ করিতেছে, এখনই আমি তথায় গমন করিয়া তাহার হৃদয়ে সাহস ও বল সঞ্চার করিব। তাহার স্বামীদেবতা নিরুদ্দেশ। কিন্তু সেই রমণী সতত পতিপদ চিন্তা করিয়া এখন উমাব্রত করিতে একান্ত ইচ্ছা করিয়াছে এবং তজ্জন্য সতত ক্রন্দন করিয়া পতিশক্তি কামনা করিতেছে।"

আমি কহিলাম, "দেবি! সে উমাব্রত কি প্রকার, তাহার বিধিব্যবস্থাই বা কিরূপ, আর কিরূপ রমণীই বা সে ব্রত করিতে সক্ষম, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া এ অধীন ভ্রাতার আনন্দ বৃদ্ধি করুন।"

সতীরাণী বলিলেন,—"নারীজাতির একমাত্র পুণ্যকর পুণ্যক-বিধি অর্থাৎ উমাব্রত কীর্ত্তন করিবার সময় এখন নাই। তবে যে রমণীগণ এই ব্রত করিবার প্রকৃত অধিকারিণী, তাহাদের কিঞ্চিৎ লক্ষণ কীর্ত্তন করিয়াই ক্ষান্ত হইব; শুন—

যে রমণী সতীত্ব ধর্ম্ম হইতে বিচলিত না হইয়াছেন, উমাব্রত অনুষ্ঠানে তিনিই প্রকৃত অধিকারিণী। অসতীরা উমাব্রত করা দূরে থাকুক, যদি দান ও উপবাসাদি পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, সে সমস্তই নিষ্ফল হয়। যে সকল ব্যভিচারিণীরা পতিকে বঞ্চনা করে, পুণ্যফললাভের কথা দূরে থাকুক, তাহাদিগকে চিরদিন নিরয়গামিনী হইয়া ঘোরতর নরকযাতনা ভোগ করিতে হয়।

সুশীলা পতিপরায়ণা ধর্ম্মাবলম্বিনী সৎপথগামিনী সাধ্বীরাই এই জগৎ ধারণ করিতেছেন। ফলতঃ যাহাদের মুখ হইতে কথনও কুকথা বিনিষ্ক্রান্ত না হয়, যাহাদিগকে কখন আকাঙ্ক্ষিত বঞ্চনা করিতে হয় নাই, যাহারা নিরন্তর পবিত্র, ধৈর্য্য যাহাদিগের প্রধান আশ্রয়, ব্রতপালন যাহাদিগের নৈমিত্তিক কার্য্য, সেই সাধুবাদিনী সীমন্তিনী-গণ কর্ত্তৃকই জগৎ রক্ষিত হইয়া থাকে।

পতি পতিত হউন, দীন অথবা ব্যাধিগ্রস্ত বা বৃদ্ধ হউন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করা কথনও স্ত্রীর কর্ত্তব্য নহে। পতি অকার্য্য বা কুকার্য্যকারী হউন, পাতকী হউন বা নির্গুণই হউন, একমাত্র সাধ্বী স্ত্রীই কেবল তাঁহাকে পরিত্রাণ করিতে পারে।

স্ত্রী বাক্‌দূষিতা হইলে শাস্ত্র তাহার প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু ব্যভিচারিণী হইলে তাহার আর প্রায়শ্চিত্ত নাই।

সদ্গতি কামনা করিয়া ব্রতই কর আর উপবাসই কর, পতির অনুমতি অনুসারে করাই কর্ত্তব্য।

বিধবা রমণীপক্ষেও পতিমূর্ত্তি অথবা পতিপাদুকাই চিন্তনীয়।

ব্যভিচারিণী রমণীর সহস্রকল্পেও সদ্গতি হয় না। পতিই রমণীর দেবতাস্বরূপ। অতএব যিনি পতিকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন, তাহার

সকল ধর্ম্মই লাভ হয়, তিনিই প্রকৃত সতী, এবং তিনিই উমাব্রত করিবার যোগ্যা।

যাহা হউক পতিভক্তি, বাক্‌প্রিয়তা ও সরলতাই নারীজাতির প্রধানধর্ম্ম। এইরূপ রমণীগণই আমার আদর ও শক্তি লাভের অধিকারিণী। বর্ত্তমানে যতক্ষণ তুমি কৃতান্তপুরী সন্দর্শন করিবে, আমি তোমার নিকটে তাবৎকাল অপেক্ষা করিতে সক্ষম হইব না—আমি আমার অপরাপর কার্য্য সমাপ্ত করিতে গমন করিতেছি। তুমি আমার বরপ্রভাবে এই কৃতান্তপুরীর সমস্ত গুপ্ত বিষয় শ্রবণ ও দর্শন করিতে সক্ষম হইবে। তদনন্তর তোমার দর্শনাদি সমাপ্ত হইলে আমি আগমন পূর্ব্বক তোমাকে সংসারদ্বীপে রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিব।"

আমি স্বীকৃত হইলে দেবী অন্তর্দ্ধান হইলেন। তখন আমি কৃতান্তপুরীর চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম।

কৃতান্তপুরীতে যাহা যাহা অবলোকন করিয়াছিলাম, তাহার বর্ণনা করিতে এখনও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। বৎস! আমি যাহা যাহা দর্শন করিয়াছিলাম, তোমার নিকট তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি, মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ কর।

ভ্রমণ করিতে করিতে আমি যমের দক্ষিণ দুয়ারে উপস্থিত হইলাম। সেখানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, রৌরবাদি চতুরশীতি প্রকার নরক তথায় বিদ্যমান। ভবকারাবাসী জীবকুল তথায় পড়িয়া হাহাকার করিতেছে।

তাহাদিগের সে বিষম দুঃখ দর্শন করিয়া আমার হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল।

এক স্থানে দেখিলাম, এক অগ্নিময় জলকুণ্ড, তন্মধ্যে একটি জীব একবার নিমজ্জিত হইতেছে,—আবার ভাসমান হইয়া উত্থিত

হইতেছে। যখন ভাসমান হইয়া উঠিতেছে, তখনই মস্তকে দণ্ড প্রহার হইতেছে, তাহার চীৎকারে গগনমণ্ডল বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। দ্বাররক্ষক দূতকে জিজ্ঞাসা করিলাম হে কৃতান্তদূত! হে ভ্রাতঃ! এই ব্যক্তি কি মহাপাতক সঞ্চয় করিয়াছে, যাহার ফলে এত প্রকার কঠিন যন্ত্রণা সহ্য করিয়া চীৎকারে ভূমণ্ডল বিদীর্ণ করিতেছে?

যমদূত কহিল,—মহাশয়! এই ব্যক্তি ভবকারাবাসী এক জন তস্কর। নিত্য নিত্য পরস্বাপহরণ করিয়া আনিত, সেই পাতকে ঐ ব্যক্তি এই অগ্নিময় জলমধ্যে নিমজ্জ্যমান হইতেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভ্রাতঃ! কত দিন উহার অদৃষ্টে এই দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণাভোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে?

নরকরক্ষক যমদূত কহিল—দ্বাদশবৎসরকাল এইরূপে নরক-ভোগ করিবে। তদনন্তর পুনরায় সংসারদ্বীপে গমন করিয়া নানা-বিধ যন্ত্রণা ভোগ করিবে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—ভ্রাতঃ! তখন ঐ ব্যক্তি কোন্ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিবে?

যমদূত উত্তর করিল—মহাশয়! আমরা তাহা স্থির করিয়া বলিতে পারি না। মহারাজ কৃতান্তদেব নরক-ভোগান্তে জীবগণের বিচার শেষ করিয়া নূতন জন্মের বিষয় স্থিরতর করিয়া সংসার-দ্বীপে প্রেরণ করিয়া থাকেন।

আমি সে স্থান হইতে অন্যত্র গমন করিলাম। সেখানে গিয়া দেখি, এক পুরীষকুণ্ডে এক হতভাগ্য চক্ষু পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া অবস্থান করিতেছে। তাহার সর্ব্বাঙ্গে কৃমিকীট সকল অহর্নিশি দংশন করিতেছে।

পাপীর নরক যন্ত্রণা ও যমদূত কর্ত্তৃক প্রহার।

কমলা প্রেশ,—বাগবাজার, কলিকাতা।

তাহার দুর্দ্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, যমদূত কহিল— মহাশয়! ভবকারাবাসকালীন এই ব্যক্তি পরস্বারগামী ছিল। সেই পাপে এই নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে।

আমি তাহার যন্ত্রণা দর্শন করিয়া অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলাম। তদনন্তর অন্যত্র গমন করিলাম। সেস্থানে দর্শন করিলাম – একটী রমণী এক লৌহ পুরুষের ভজনা করিতেছে।

জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—সংসার-দ্বীপে বাসকালীন এই পাপীয়সী নিজ স্বামীকে বঞ্চনা করিয়া ঐ পুরুষকে ভজনা করিত। সেই পাতকের ফলে নিরন্তর ঐ উত্তপ্ত লৌহপুরুষকে আলিঙ্গন করিয়া অসীম দুঃখ-ভোগ ও দাহ-যাতনায় ছট্‌ফট্ করিতেছে।

আমি সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া অন্যত্র গমন করিলাম। নরক দর্শনে আর আমার প্রবৃত্তি রহিল না।

আমি গমন করিতে করিতে দেখিলাম, এক অত্যুৎকৃষ্ট প্রাসাদ-ভবন। প্রাসাদের মধ্যে এক প্রকাণ্ড সভামণ্ডপ বিদ্যমান রহিয়াছে। বিস্ময় ও আহ্লাদের সহিত উহার নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রথমতঃ সংসারবাসী সেই (সুমতি, সত্য, বিবেকাদির বশীভূত) সংগ্রাম-বিজয়ী সাধুপুরুষগণকে উত্তম ও উচ্চ আসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলাম। নিবিষ্ট চিত্তে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখিতে দেখিতে একটু অগ্রসর হইয়া আমি সেই সভার অদূরে একটি স্তম্ভের পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিলাম। যেখানে আমি দাঁড়াইলাম, ঐ স্থান হইতে সভার কার্য্য প্রায় সমস্তই দেখা যায়। দেখিলাম, ঐ সভার মধ্য-দেশে একখানি রমণীয় সিংহাসনোপরি কমনীয়কান্তি প্রশান্তমূর্ত্তি এক দণ্ডধর মহাপুরুষ উপবিষ্ট; তাঁহার গঠন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই রক্তবর্ণ-পট্টবস্ত্র-পরিহিত আকর্ণ-বিশ্রান্ত লোচন

উজ্জ্বল-কেশ-শ্মশ্রু-বিশিষ্ট দণ্ডধর দিব্য পুরুষকে দেখিয়া আমি চিনিলাম। ইনিই ধর্ম্মরাজ যম।

ধর্ম্মরাজের বামপার্শ্বে বিস্তৃত পবিত্র আসনোপরি সুপক্ক-কেশশ্মশ্রু-বিশিষ্ট এক বলিষ্ঠকায় বৃদ্ধ বহুবিধ পুস্তক আদি সম্মুখে করিয়া বসিয়া আছেন। জানিলাম, এই বৃদ্ধ পুরুষই কৃতান্তসচিব চিত্রগুপ্ত। তৎপশ্চাতে গম্ভীরভাবে দণ্ডায়মান কতকগুলি ধূম্রবর্ণ পুরুষ,—তাহাদের সুদৃঢ় কলেবর, কেশকলাপ রুক্ষ ও বিশৃঙ্খল, চক্ষু রক্তবর্ণ, হস্তে গদা এবং কটিদেশে অসুরের ন্যায় বস্ত্র সংযত ভাবে পরিহিত,—দৃষ্টি করিয়া তখন আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। ক্রমে জানিলাম, তাহারাই কৃতান্তদূত।

এইরূপ অচিন্ত্যপূর্ব্ব বিস্ময়কর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়া আমি স্তম্ভিত ভাবে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় দেখিলাম, ধর্ম্মরাজের পার্শ্বোপবিষ্ট সংসারবিমুক্ত সাধুপুরুষগণের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি উঠিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন,—ধর্ম্মরাজ, আমাদিগকে এখন কোথায় যাইতে হইবে?

যমরাজ সহাস্য বদনে বলিলেন,—সাধুগণ, আপনারা ভক্তি-ভাজন সত্য, বিবেক, সুমতি, সতীরাণী ও দয়া প্রভৃতি দেবদেবী-গণের প্রসাদে এখন দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। আপনাদের উপর আর আমার কোন অধিকার নাই। এক্ষণে আপনারা আনন্দ-ধামে রাজরাজেশ্বর ভগবানের শ্রীমন্দির-সম্মুখবর্ত্তী আনন্দপাদপ-সমীপস্থিত, আপনাদের নিত্যনিবাস শান্তিনিকেতনে বাসের উপযোগী হইয়াছেন। অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর কিছুকাল এই স্থানে অপেক্ষা করুন, উপস্থিত কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া আমিই আপনাদিগকে শান্তি-নিকেতনে রাখিয়া আসিতেছি। এই বলিয়া কৃতান্তদেব বিচার-

পরিচ্ছদ পরিধান জন্য কক্ষান্তরে গমন করিলেন। বলা বাহুল্য যে, আমার শিষ্য-দম্পতিকেও ঐ সকল সাধুপুরুষগণ-মধ্যে যমরাজ-সভায় উপবিষ্ট দেখিয়াছিলাম।

কিঞ্চৎ কাল পরেই বন্দিগণ আসিয়া সেই সভাস্থলে উপস্থিত হইল, এবং স্তুতিগান আরম্ভ করিল।

তাহাদিগের স্তব সমাপ্ত হইলে, সেখানে অনেকগুলি কর্ম্মচারী আগমন করিলেন।

সহসা ঘণ্টাধ্বনি হইল—সভাস্থ সকলেই যেন সে ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইল। আনন্দের বেশভূষায় ভূষিত হইয়া মহারাজ যম পুনঃ আসিয়া সেই সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সভামধ্যস্থ সেই সিংহাসনে উপবেশন করিলেন।

যমরাজ সিংহাসন গ্রহণ করিলে, অপরাপর সকলে আসন গ্রহণ করিলেন। যমরাজের দক্ষিণ পার্শ্বে খাতাপত্র লইয়া চিত্রগুপ্ত উপবেশন করিলেন।

তখন সভার কার্য্যারম্ভ হইল। চিত্রগুপ্ত কাগজ পরিদর্শন করিয়া সংসারদ্বীপ হইতে আনীত কয়েকটী মানবাত্মাকে আনয়ন করিবার জন্য যমদূতকে আদেশ করিলেন।

চিত্রগুপ্তের আদেশ অনুসারে যমদূত একটী লিঙ্গদেহী মানবকে তথায় আনয়ন করিল।

কৃতান্তদেব গম্ভীর বচনে বলিলেন,—অহে সংসার-কারাবাসী মানব! তুমি সংসারকারাবাসকালে কি কি কার্য্য করিয়াছিলে, এবং এখানে আসিয়া তাহার ফলভোগ কি প্রকার সম্পন্ন করিলে, তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা কর।

সে ব্যক্তি শোকার্ত্তভাবে বলিতে আরম্ভ করিল - হে মৃত্যুপতে! আপনি সকলই অবগত আছেন। আপনি অন্তর্য্যামী, - আপনি না জানিতে পারেন; এমন কোন বিষয়ই নাই। যাহা হউক, যখন আমাকে আমার বিষয় বলিতে আদেশ করিলেন, তখন আমি আদেশ পালন করিতেছি। শ্রবণ করুন।

আমি আপনার এখান হইতে গমন করিয়া কোন এক সুব্রাহ্মণ গৃহে জন্মগ্রহণ করি। কিন্তু দেশ কাল পাত্র ও সঙ্গ-দোষে আপনার আদেশ ও নিজধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হই। ততুপরি সংসারমোহিনী মায়ায় সংসারপাশে আবদ্ধ হইয়া পড়ি;—মায়ার পুত্র পাপাদি আমার হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। তাহাতে আমি আপনার শাসনবাক্য বিস্মরণ হইয়া সদা শূদ্রবৎ ব্যবহার করিয়াছি। ব্রাহ্মণ হইয়া সন্ধ্যাহ্নিক করি নাই। যাহার তাহার ভোজ্য ভক্ষণ করিয়াছি। কদাচারে দিন কাটাইয়াছি। এক রূপসী চণ্ডালপত্নীর প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়া তাহার দত্তা খাদ্য অমৃতজ্ঞানে পান-ভোজন করিয়াছি। তৎপরে সময় হইল—আপনার দূতগণ সংসারদ্বীপে গমন করতঃ আমাকে লইয়া আসিয়া নরকে নিক্ষিপ্ত করিল। তদবধি সেই নরকে পড়িয়া কত কষ্ট যে সহ্য করিতেছি, হে অন্তর্য্যামিন্! তাহা আপনি অবশ্যই জানিতে পারিতেছেন। এক্ষণে আমাকে পরিত্রাণ করুন,—আপনি ব্যতীত উদ্ধারকর্ত্তা আর কেহ নাই।

যমরাজ তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন।

চিত্রগুপ্ত তাঁহার গ্রন্থ দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—মহারাজ! ঐ ব্যক্তির জন্য যে অদৃষ্টলিপি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা বলিতেছি—শ্রবণ করুন।

কৃতান্তদূত কর্ত্তৃক লিঙ্গশরীর বিচারার্থ যমালয়ে নীত।

কমলা প্রেশ,—বাগবাজার, কলিকাতা।

ঐ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়া যখন শূদ্রবৎ আচরণ, চণ্ডালী-গমন প্রভৃতি নানাবিধ পাপকার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, তখন এজন্মে নিকৃষ্ট চণ্ডালগৃহেই জন্মগ্রহণ করিবে। উহার অদৃষ্টে অর্থাদি লাভ হইবে না, এবং বহুসন্তানের পিতা হইয়া তাহাদের ভরণপোষণ জন্য সদাই হীনকার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিবে, অথচ সন্তানগণের একটীরও প্রকৃত জন্মদাতা পিতাও হইবে না। উহার স্ত্রী ভ্রষ্টা হইয়া উপপতি দ্বারা সে সকল সন্তান উৎপন্ন করাইয়া, উহা দ্বারা কেবল ঋণশোধ করাইয়া লইবে। এবং পূর্ব্ব জন্মে এই স্ত্রীকে বঞ্চনা করিয়া বহু রমণী সম্ভোগ করিয়াছিল, এজন্য ঐ ব্যক্তি নিজ কর্ম্মফলে এবার সংসার-দ্বীপে গিয়া এইরূপ শাস্তিকেও সন্তুষ্ট চিত্তে ভোগ-সুখ বোধ করিবে।

যমরাজ সে কথা শ্রবণ করিয়া সেই ভবকারাবাসী জীবের প্রতি চাহিয়া বলিলেন—তোমার অদৃষ্টলিপি শ্রবণ করিয়াছ,- এক্ষণে নূতন জন্ম লাভ করিবার জন্য পুনরায় সংসার-দ্বীপে গমন কর, এবং ধনহীন হইয়া দরিদ্রভাবে দিনাতিপাত করিতে থাক।

সে ব্যক্তি ক্রন্দন করিতে লাগিল। ক্রন্দন করিতে করিতে বলিল—মহারাজ! আমি উচ্চ বর্ণ হইতে নিম্নবর্ণে জন্মগ্রহণ করিতে গমন করিলাম, আমার উদ্ধারের উপায় কি?

কৃতান্তদেব কহিলেন—নিজ কর্ম্মফল। সংসারদ্বীপ কর্ম্মক্ষেত্র। সে স্থানে গমনপূর্ব্বক যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে তদনুরূপ ফল লাভ করিবে। তাহার ব্যত্যয় করিবার ক্ষমতা আমারও নাই। তোমরা এখানে আসিয়া নরকাদিভোগ করিয়া যখন সংসার-দ্বীপে গমন কর, তখন প্রতিজ্ঞা করিয়া যাও, সেখানে এইবার নিশ্চয়ই আমার আদেশবাণী স্মরণ রাখিয়া কার্য্য করিবে, কিন্তু সেখানে গিয়া তাহা ভুলিয়া যাও। মোহিনী মায়ার অধীনতায় আত্ম-বিস্মৃত হইয়া,

পাপাদিকে বন্ধুজ্ঞানে সহায় করিয়া, ক্রমে অধঃপতনের দিকে অগ্রসর হও। যাহা হউক, এইবারের এই যন্ত্রণা সকল স্মরণপূর্ব্বক কার্য্য করিও, তাহা হইলে পুনরায় উন্নত যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে সক্ষম হইবে।

যমরাজ অপর আর একজনকে আনয়নের জন্য আদেশ প্রাদান করিলেন।

যমদূত আর একজনকে লইয়া আসিল। সে যমরাজ-সমীপে কম্পিত কলেবরে দণ্ডায়মান রহিল।

কৃতান্তদেব জিজ্ঞাসা করিলেন- হে সংসারকারাবাসী মানবাত্মা! তুমি সংসার-কারাবাসকালে কি কার্য্য করিয়াছিলে, এবং এখানে আসিয়া তাহার কি প্রকার ফলভোগ করিতেছ, তাহা সবিস্তারে বর্ণনা কর।

কাঁপিতে কাঁপিতে সে ব্যক্তি বলিল—হে কৃতান্ত, হে যমরাজ! অনেক দিন হইল, আপনার ভীষণমূর্ত্তি দূতগণ আমাকে সংসারদ্বীপ হইতে এখানে আনয়ন করিয়াছে। কিন্তু সেই যে মৃত্যুকালে দারুণ তৃষ্ণা হইয়াছিল, সে তৃষ্ণা নিবারণ হইল না। পিপাসায় বক্ষোমধ্যে আগুন জ্বলিতেছে,—এ যাবৎ এক বিন্দু জল পাইলাম না। তৃষ্ণার জ্বালায় ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি, কেহ তাহা বুঝিল না। মহারাজ! কি জন্য আমাকে আপনার সভায় আনয়ন করিয়াছেন? আমার দাঁড়াইবার শক্তি নাই—সর্ব্বাঙ্গ কম্পিত হইতেছে। এক বিন্দু জল দিতে পারিবেন কি?

যমরাজ বলিলেন—হে সংসারদ্বীপবাসী ভ্রান্ত জীব! সংসার-সাগরের দুস্তর পারাবাররূপিণী মোহিনী মায়ার পাপজালে আবদ্ধ হইয়া, সংসারদ্বীপে গমন করিয়া যে সকল কুকার্য্য সম্পাদন করিয়াছ,

এখানে আগমনপূর্ব্বক তাহারই ফলভোগ করিতেছ। এক্ষণে পিপাসার্ত্ত হইয়া জল প্রার্থনা করিলে কি ফল হইবে? তুমি ভব-কারাবাসকালে কি কি কার্য্য করিয়াছিলে, কি কার্য্যের ফল দ্বারা এত পিপাসা ভোগ করিতেছ, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

সে ব্যক্তি কহিল,—হে মৃত্যুপতে! আপনার অবিদিত কিছুই নাই। আপনি সকলই অবগত আছেন। তথাপি যখন আমাকে বলিবার জন্য আজ্ঞা করিলেন, তখন আমি বলিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি এবার ভবকারাবাসকালে কোন ধনীর বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যে গ্রামে বাস করিতাম, তথায় অত্যন্ত জলকষ্ট ছিল,—লোক সমুদয় চৈত্র বৈশাখ মাসে নিদারুণ জলকষ্টে পতিত হইত। পশুপক্ষিকুলও জলাভাবে হাহাকার করিত। আমাদের একটি বৃহৎ পুষ্করিণী ছিল,—ঐ জলকষ্টের সময় আমি সাধারণকে সে জলে যাইতে দিতাম না। যেহেতু সকলে যদি সে জল ব্যবহার করে, এবং তুলিয়া লইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের কষ্ট হইবে বলিয়া বিবেচনা করিতাম।

কত লোক দুই এক কলসী জলপ্রার্থী হইয়া আমার নিকটে আসিয়া কাতর হইত, আমি সে সকল উপেক্ষা করিয়া তাহাদিগকে তাড়না করিতাম। কোন দিন এক হীনবংশজাতা যুবতী রমণী কাতর হইয়া আমার নিকট এক কলসী জল কামনা করে। আমি তাহার বিনিময়ে তাহার সহবাসসুখ প্রার্থনা করি। সে অগত্যা তাহাতেই সম্মত হইয়া এক কলসী জল প্রত্যাশায় আমার অভিলাষ পূরণ করে এবং জল লইয়া চলিয়া যায়। এইরূপ কুৎসিত কার্য্য কতই করিয়াছি এবং পশ্বাদিতে জলপান করিবে বলিয়া পুষ্করিণীর চারিধারে প্রাচীর দিয়া রাখিয়াছিলাম। প্রভো! মৃত্যুপতে! সেই

মহাপাতকেই বোধ হয়, আমাকে কেহ এক বিন্দু জল দান করিতেছে না।

যমরাজ মস্তক সঞ্চালন করিয়া বলিলেন,—হাঁ, সেই পাপেই তুমি তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া এত দিন কষ্ট প্রাপ্ত হইয়াছ, এক্ষণে তোমার নরকভোগের কাল অবসান হইয়াছে। অতএব পুনরায় সেই ভবসংসারে গমন কর।

তদনন্তর যমরাজ চিত্রগুপ্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ইহার নূতন অদৃষ্টে কি প্রকার লেখা হইয়াছে, তাহা বল।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন;–জলদানে কৃপণতা এবং ঐরূপ কুৎসিত কার্য্যাদি হেতু উহার সমধিক পাতক হয়। সে পাপের ফলে এজন্মে ঐ ব্যক্তি চাতকপক্ষী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে এবং তিনজন্ম এইরূপ যাতায়াত করিয়া, মনুষ্যজন্ম পাইয়া রমণীদেহ ধারণ করিবে। ঐ যুবতীই উহার স্বামী হইয়া, উহারই সমক্ষে অন্য রমণী সম্ভোগ করিবে, তাহা দেখিয়া দেখিয়া দগ্ধীভূত হইয়া মরিবে।

যমরাজ কহিলেন—যাও, যেমন করিয়াছিলে, তদনুযায়ী ফল-ভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করগে।

সে ব্যক্তি হাহাকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কিন্তু কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাতও করিল না।

একজন ভীমকান্তি যমদূত তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

তদনন্তর যমরাজের আদেশে অপর আর একটি জীবকে তথায় আনায়ন করা হইল। সে অধোমুখে কৃতান্তসমীপে দণ্ডায়মান হইয়া বলিল,—মৃত্যুপতে! এবার ভবসংসারে গিয়া আমি একটী সুন্দরী রমণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, এবং বোধ হয় পূর্ব্বজন্ম-সুকৃতি-ফলে কোন রাজার দ্বিতীয় পক্ষের পরিণীতা ভার্য্যা হইয়া দিনাতিপাত

করিতে থাকি। রাজা আমার রূপে মোহিত হইয়া সর্ব্বদাই আমাকে লইয়া থাকিতেন, আমার মনস্তুষ্টি করিবার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেন, এবং আমাকে প্রাণ অপেক্ষাও ভাল বাসিতেন; কিন্তু আমি তাহাতে তৃপ্ত না হইয়া, তাঁহার এক কোটালপুত্রের প্রেমে আসক্ত হইয়া, তাহাকেই জীবন অপেক্ষা ভাল বাসিতাম, এবং গোপনে তাহারই সঙ্গসুখ ভোগ করিতাম। এরূপ সময় রাজার রাজসভায় কোথা হইতে একটী সাধু আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং রাজাকে একটী অপূর্ব্ব ফল প্রদান করিয়া বলিলেন যে, মহারাজ! এই অপূর্ব্ব ফলটী আপনি নিজে ভক্ষণ করিবেন; ইহার অত্যাশ্চর্য্য গুণ আছে।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন,—মহাত্মন্! এই ফলের কি গুণ, তাহা বলুন। তখন সাধু বলিলেন,—এই ফল যে ভক্ষণ করিবে, সে স্থিরযৌবন ধারণ করিয়া অতুল ঐশ্বর্য্যভোগে সুখশান্তিতে বহুকাল জীবিত থাকিতে পারিবে।

মহারাজ সাধুকে যথাযুক্ত সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় দিয়া, ঐ অপূর্ব্ব ফলটী স্বয়ং হস্তে করিয়া আমার শয়নকক্ষে হাসিতে হাসিতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আমাকে বলিলেন,—রাণী! এই অপূর্ব্বগুণসম্পন্ন ফলটী এক যোগিপুরুষ আমাকে দিয়া গিয়াছেন। এই ফলটী তুমি খাইলেই আমি সুখী হইব।

আমি রাজার মুখে সেই ফলের অসাধারণ গুণ ও প্রশংসাবাদ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ হাস্যাধরে রাজাকে সুখী করিয়া ফলটী তাঁহার হস্ত হইতে লইলাম, এবং আমি খাইতেছি বলিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিলাম।

পরে রাজা বহির্দ্দেশে গমন করিলে, চিন্তা করিতে লাগিলাম,—কতক্ষণে কোটালপুত্রের সাক্ষাৎ পাইব। ক্রমে রজনী আসিলে,

কোটালপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ঐ ফলের গুণ বর্ণনা পূর্ব্বক তাহাকেই খাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, ফল তাহার করে অর্পণ করিলাম, এবং বলিলাম, এ ফল তুমি খাইলে এবং ফলের গুণসকল তোমাতে বর্ত্তাইলে আমি যত সুখী হইব, এমন আর কিছুতেই হইব না।

কোটালপুত্র আমার মনস্তুষ্টি করিয়া ফল লইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু পরে জানিতে পারিলাম, কোটালপুত্র এক বেশ্যাকন্যাকে আমা অপেক্ষা ভালবাসিত, সে ফল তাহাকেই দিয়াছিল।

ঐ বেশ্যাকন্যা আবার একটী হীনকার্য্যকারী পুরুষকে ভাল বাসিত, সে ফলের গুণ বর্ণনা করিয়া উহা তাহাকেই দেয়। সে ব্যক্তি এক ঘুঁটা-বিক্রয়িণী রমণীর প্রণয়ে মুগ্ধ ছিল। সে ঐ ফল তাহাকেই প্রদান করে। এইরূপে ফল ক্রমে ঘুরিয়া ফিরিয়া পুনরায় রাজার হস্তেই উপস্থিত হয়। কারণ, ঐ রমণী মনে করিল, এমন উৎকৃষ্ট ফল রাজাকেই দেওয়া উচিত। আমার স্থিরযৌবন প্রাপ্তে বাঁচিয়া থাকিয়াই বা লাভ কি? বরং রাজা দীর্ঘজীবন এবং স্থিরযৌবন প্রাপ্ত হইলে দেশের ও দশের মঙ্গল হইবে। এই চিন্তা করিয়া সে ফল রাজার হস্তেই প্রদান করে এবং মহারাজকে খাইতে অনুরোধ করে ও ফলের গুণ ব্যাখা করে।

রাজা তখন ফল দৃষ্টি করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া, ঐ রমণীর উচ্চ হৃদয়ে রাজভক্তি ও শুভাকাঙ্ক্ষার বীজ দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরে দারুণ সন্দেহানল জ্বলিয়া উঠিল।

তিনি তখন মধুর বচনে ঐ রমণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে কৃষকরমণী! তোমার উপর বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি; তুমি অকুতোভয়ে আমার নিকট এই ফলপ্রাপ্তির বিবরণ বল, তোমাকে পুরস্কৃত করিব।

তখন ঐ রমণী,—রমণীস্বভাবসুলভ লজ্জাবতী হইয়া, একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—

মহারাজ! এক কৃষকপুত্র আমার প্রণয়ে মুগ্ধ থাকিয়া আমাকে অতিশয় ভালবাসে। ঐ ব্যক্তি গত রজনীযোগে ঐ ফল কোথা হইতে আনিয়া আমাকে দিয়াছে এবং খাইতে অনুরোধ করিয়াছে। আমি ঐ ফলের গুণ শ্রবণে, আমার ন্যায় সামান্য রমণীর খাওয়া বৃথা বিবেচনায় আপনাকে দিতে আসিয়াছি। এ ভিন্ন আমি আর কিছু জ্ঞাত নহি।

তখন রাজা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐ রমণীর নিকট কৃষক-পুত্রের নাম ধাম জানিয়া তৎক্ষণাৎ পদাতিক দ্বারা তাহাকে উপ-স্থিত করাইলেন।

ভুবনবিজয়ী ফল সম্মুখেই ছিল, রাজা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই ফল তুমি কোথায় পাইলে এবং কাহাকে দিয়াছিলে? যদি শাস্তি পাইবার বাসনা না থাকে, অকপটে সত্য ঘটনা বল, সত্য বলিলে বরং পুরস্কৃত হইবে।

কৃষকপুত্র ইতস্ততঃ করিয়া বলিল,—বেশ্যাকন্যার নিকট পাইয়াছিলাম এবং এই ঘুঁটা-বিক্রয়িণী রমণীকেই দিয়াছিলাম।

এইরূপে বেশ্যাকন্যার মুখে কোটালপুত্রের নিকট এবং কোটাল পুত্রের মুখে রাণীর নিকট ফল প্রাপ্তির কথা শুনিয়া একে একে সকলকেই উপস্থিত করিয়া রাজা ফলের বিবরণ আনুপূর্ব্বিক জ্ঞাত হইলেন। তৎপরে ফল হস্তে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ফল দেখিয়া আমার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল!

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রাজা আমার গৃহে প্রবেশ করিয়া বলি-লেন,—রাণী! এই কি ভালবাসার প্রতিদান? এই ফলটা কি চিনিতে

পার? আমি ফল দেখিয়াই প্রথমে মরমে মরিয়া গিয়াছিলাম,—পাছে আমার জীবন নাশ করেন, এই ভয়ে মৌন রহিলাম। কিন্তু রাজা আমাকে রোষভরে কটু কথা কিছু না বলিয়া কেবলমাত্র বলিলেন,—মহতের ভালবাসা জলের রেখার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী হয় না। তোমাকে যখন ভাল বাসিয়াছি, নিজে সহস্র কষ্ট পাই সেও ভাল, তথাপি তোমার মনে কষ্ট দিব না। ভালবাসার প্রতিদান কিন্তু এ নয়! এর প্রতিফল একদিন ভুগিতে হইবে।

এই বলিয়া তিনি রাজপরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক একখানি সামান্য বস্ত্র পরিধান করিয়া গৃহের বাহির হইয়া গেলেন। তদবধি একেবারে নিরুদ্দেশ।

রাজ্য, ধন, ঐশ্বর্য্য, মান ইত্যাদি সমস্ত এক কথায় মুহূর্ত্তমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়ার পর, আমার কেমন আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। এইরূপ ভাবে কয়েকদিন জীবন অতিবাহিত করিতে করিতে একদিন আপনার দূত গিয়া উপস্থিত হইল এবং আমাকে এই স্থানে আনিয়া রক্তনদীতে নিক্ষেপ করিল। ঐ তপ্ত নদীতে উত্তাপ সহ্য করিতে না পারায় একবার ডুবিয়াছি, একবার মস্তক উত্তোলন করিয়াছি। মস্তক উত্তোলন করিয়াও নিস্তার পাই নাই। আপনার দূত গিয়া মস্তক তুলিবামাত্রই উত্তপ্ত তীক্ষ্ণ লৌহদণ্ড প্রহার করিয়াছে। এইরূপে বহুকাল কাটাইবার পর অদ্য আপনার আদেশে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। এই আমার কৃতকর্ম্ম, এখন যে আদেশ ইচ্ছা হয়, তাহাই করুন।

প্রিয় পাঠক! এই কলির প্রাবল্য-সময়ে প্রায় যথা-তথাই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। ভ্রমান্ধ জীব কেহ দেখে, কেহ বুঝে। কেহ দেখিয়াও দেখে না, কেহ বুঝিয়াও বুঝে না।

তখন ধর্মরাজ প্রিয় সচিব চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—এই রমণীর অদৃষ্টলিপি এবার কিরূপ লিখিত হইল?

চিত্রগুপ্ত বলিলেন,—মহারাজ! এই রমণী প্রকৃত ভালবাসা না বুঝিয়া, স্বামীকে বঞ্চনা করিয়াছে, এই ফলে এবার সংসারদ্বীপে গিয়া রমণীদেহ প্রাপ্ত হইবে, এবং সামান্য সময় স্বামী-সহবাস-সুখ লাভ করিয়া বিধবা হইয়া; সারাজীবন হা হতাশ করিয়া, তুষানলে দগ্ধ হইবে। এই বাক্য পরেই কৃতান্তদূত তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

পরে অন্য ব্যক্তি আনীত হইলে, যম তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—তুমি সংসারদ্বীপে গমন করিয়া কি কি কার্য্য করিয়াছিলে, তাহা বল।

সে ব্যক্তি করযোড়পূর্ব্বক বলিল—মহারাজ! আমি সংসার দ্বীপে পুরুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। অর্থাকাঙ্ক্ষায়,—এমন অসৎ কর্ম্ম নাই, যাহা আমার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই। প্রতারণা, প্রবঞ্চনা, শঠতা - সমস্তই করিয়াছি। যাহাকে দেখিলে ক্রোধে শরীর জ্বলিয়া যাইত, অর্থপ্রাপ্তির আশায়, বঞ্চনা করতঃ চাটুবাক্যে তাহার মনস্তুষ্টি করিয়া ছলে বলে কৌশলে তাহার রুধিররূপ অর্থ শোষণ করিয়াছি। মহারাজ! বলিতে কণ্ঠরোধ হয়, নিজ স্ত্রীকে অসৎ পথে লইয়া, পরপুরুষ ডাকিয়া আনিয়া—তাহার পরিচর্য্যা করাইয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছি। সেই ফলে আপনার কারাগারে কতকাল পুরীষহ্রদে ডুবিয়া ছিলাম। এই মাত্র আপনার দূত আমাকে উত্তোলন করিয়া আনিয়াছে। হে মৃত্যু-অধিপতি! আমার প্রতি আপনার কি আদেশ হয়, কৃপাপূর্ব্বক তাহা বলুন।

মৃত্যু-অধিপতি যম কহিলেন,—তুমি অনিত্য অর্থ কামনায়, মোহিনী মায়ার ছলনায় ভুলিয়া যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছ,

তাহা অতিশয় ঘৃণ্য। যাহা হউক, আমার এখানকার নরকভোগ তোমার অবসান হইয়াছে।—এক্ষণে তুমি পুনরায় সংসারদ্বীপে গমন কর।

তদনন্তর চিত্রগুপ্তের দিকে চাহিয়া বলিলেন,- এই ব্যক্তি কি প্রকারে এবং কোথায় জন্ম গ্রহণ করিবে, বলিয়া দাও।

চিত্রগুপ্ত বলিলেন—যাও, তুমি সংসারদ্বীপে শকুনি হইয়া জন্মগ্রহণ করগে। গলিত শবদেহই তোমার ভোজ্য হইবে। শত জন্ম শকুনি এবং শত জন্ম কাকযোনিতে জন্মগ্রহণ তোমার জন্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

যমদূত তাহাকে ধাক্কা দিতে দিতে লইয়া গেল। সে কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু যমদূতের পীড়নে তাহা বলিতে পারিল না।

পুনরায় অপর একটি মূর্ত্তি আনিয়া তথায় উপনীত করা হইল। কৃতান্ত তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—তোমার কৃতকর্ম্ম যাহা আছে, তাহা ব্যক্ত করিয়া বল।

সে অত্যন্ত শোকার্ত্তভাবে বলিল—মহারাজ! আমি সংসারদ্বীপে রমণীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম। স্বামী থাকা সত্ত্বেও আমি অপর পুরুষে আসক্ত ছিলাম। সর্ব্বদাই তাহাকে লইয়া কামরিপু চরিতার্থ করিতাম। তাহা দ্বারা বহু সন্তান উৎপন্ন করাইয়া, আমার বিবাহিত পতিকে অনেক যাতনা দিয়াছি এবং সংসারকার্য্যে বিন্দুমাত্র ক্রটী হইলে তৎক্ষণাৎ উগ্র মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পতিকে কতই ভৎসনা করিয়াছি। অথচ তাহার সুখদুঃখের দিকে ফিরেও তাকাই নাই। এইরূপ আনন্দেই দিন কাটাইতেছিলাম, এমত সময় আপনার দূত বলপূর্ব্বক

আমাকে আনয়ন করিয়া ঐ অগ্নিকূপ নরকের ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তদবধি নিরন্তর সেই অগ্নির জ্বালা সহ্য করিতেছি। দয়াময়! দয়া বিতরণে আমার এ কষ্ট দূরীভূত করুন। আর সহ্য করিতে পারিতেছি না। যে মহাপাতক করিয়াছিলাম, তাহার যথেষ্ট শাস্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। এক্ষণে আমায় উদ্ধার করুন।

কৃতান্ত কহিলেন,—হাঁ; তোমার নরকভোগের কাল সমাপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে সেই সংসারদ্বীপে পুনরায় জন্মগ্রহণে যাইতে হইবে।

সে ব্যক্তি কহিল—দয়াময়! এবার আমাকে কোন্ যোনিতে যাইতে হইবে? এবং কি করিতে হইবে?

কৃতান্তদেব চিত্র গুপ্তের মুখের দিকে চাহিলেন। চিত্রগুপ্ত বলিলেন—তোমাকে এবার পশুযোনিতে যাইতে হইবে। কিন্তু অতি অল্প দিনেই আবার এখানে আসিতে হইবে। প্রসবের কয়েক দিন পরেই যমদূতেরা তোমাকে এখানে লইয়া আসিবে। এখানে আসিয়া আবার নরক ভোগ করিবে। আবার জন্মিতে যাইবে—আবার কয়েকদিন পরেই মৃত্যুর অধীন হইয়া নরক-ভোগ করিবে। এইরূপে দশজন্ম কষ্ট পাইতে হইবে।

সে ব্যক্তি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিল। যমদূতগণ তাহাকে ঠেলিয়া বাহিরে লইয়া গেল।

তদনন্তর আর একটি আগন্তুককে প্রবেশ করাইয়া যমদূত মহারাজের আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিল।

যমরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—ভবকারাবাসকালে তুমি কি করিয়াছিলে?

সে ব্যক্তি উত্তর করিল—আমি এবার গিয়া ধর্ম্মপ্রচারকরূপে অনেকের চক্ষুতে ধূলি দিয়া, দেশের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠানের ছলে

অর্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মসাৎ করিয়াছিলাম ; কিন্তু আপনার চক্ষুতে কিছুমাত্র লুক্কায়িত থাকে না। আমার সেই সমুদয় কার্য্যের ফলে বহুকাল ধরিয়া নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছি। এক্ষণে আমার প্রতি যে আদেশ হয় করুন।

কৃতান্তদেব চিত্রগুপ্তকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, এবার ইহাকে যেরূপ ভাবে সংসারকারাবাসে গমন করিতে হইবে, তাহা শুনাইয়া দাও।

চিত্রগুপ্ত কহিলেন, তুমি অশ্বযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিবে। যেমন সহস্র সহস্র লোকের পাতকের বোঝা অপসারণ করিয়া দিবে বলিয়া, তাহাদিগের চক্ষে ধূলি দিয়া অর্থাপহরণ করিয়াছিলে, তেমনি তাহাদিগকে এজন্ম বহন করিতে হইবে।

সে ব্যক্তি কাঁদিয়া বলিল—এরূপ আদেশ কেন প্রদান করিলেন ? আমি কি প্রকারে এত কষ্ট সহ্য করিব ?

কেহ তাহার কথার প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। যমদূতেরা তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেল।

তদনন্তর আর একটী জীবাত্মা আনীত হইল, এবং ধর্ম্মরাজকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—হে সর্ব্বদর্শিন্! আমি পূর্ব্ব অপরাধের দণ্ড-ভোগ নিমিত্ত এবার অভিনব মানবশরীর ধারণ করিয়া সংসার-কারাগারে গমন করি। তখন আপনি বারংবার বলিয়া দেন, এবার গিয়া সাবধানে থাকিও। কিন্তু এবারেও তথায় গিয়া মায়া মোহিনীর কুহকে এমনই ভ্রান্ত ও আত্মবিস্মৃত হইয়াছিলাম যে, আবার যে এখানে আসিতে হইবে, তাহা একেবারেই বিস্মরণ হইয়া গিয়াছিলাম। বলিব কি, মায়ানুচর মোহন বেশধারী পিশাচ পাপকেই পরম বন্ধু ভাবিয়া আত্মসমর্পণ করিতে অণুমাত্রও সঙ্কুচিত হই নাই।

সেই দস্যুও ভালবাসা দেখাইয়া, সুখের আশা দিয়া আমাকে যখন যেদিকে লইয়া গিয়াছে, পালিত কুক্কুরের ন্যায় আহ্লাদে তৎক্ষণাৎ সেই দিকে তাহার অনুগামী হইয়া, সে যাহা বলিয়াছে তাহাই করিয়াছি। হায় হায়! ভাবিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, বলিতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। কার জন্য এত করিয়াছি, তখন তাহা বুঝি নাই।

অকারণ কত প্রাণীরই যে প্রাণে বেদনা দিয়াছি, প্রতারণা দ্বারা কত ব্যক্তিরই যে যত্নার্জ্জিত বিষয় আত্মসাৎ করিয়াছি, কত অনাথা বিধবার জীবনোপায়স্বরূপ ব্রহ্মত্রভূমি কাড়িয়া লইয়াছি, ছলে কৌশলে কত সরলা সাধ্বীকেই যে সর্ব্বস্ববঞ্চিতা—পথের কাঙ্গালিনী করিয়াছি, তাহার সংখ্যা নাই।

ধর্ম্মরাজ! এক্ষণে বলিতেও লজ্জা বোধ হয়। এইরূপ করিতে করিতে কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল উত্তীর্ণ হইবার অল্প কাল পূর্ব্বে শরীরের সহিত সদ্ভাব সংস্থাপন করিয়া বার্দ্ধক্য-বন্ধু সংবাদ দিলেন, এখানে আসিবার সময় সম্মুখীন। তখন নিরন্তরই এই সংবাদ দিতে লাগিলেন। হে অন্তর্য্যামিন্! সকলই জানিতে পারিতেছেন, এইরূপ অপ্রস্তুত অবস্থাতেই ঐ ভীষণ সংবাদ শ্রবণে হৃদয়ে অসহনীয় অনুতাপানল জ্বলিয়া উঠিল। হায়! কি কার্য্য করিলাম, এই ভাবিয়া আমার অন্তর দগ্ধ হইতে লাগিল। এই অবস্থায় অল্প কাল অতিবাহিত হইতে না হইতে আপনার দূত বলপূর্ব্বক এখানে আনয়ন করিল। এই আমার সংসার বাসকালীন কার্য্যবিবরণ নিবেদন করিলাম এখন আপনার যাহা সুবিচার হয় করুন।

এই জীবাত্মার সংসারবাস-কালের কৃতকার্য্য শ্রবণ করিয়া যমরাজ গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তোমার যাতনাশাস্তির এখনও

বিলম্ব আছে। তুমি পুনরায় সেই মায়াসাগর-পরিবৃত সংসারদ্বীপ-কারাগারে গিয়া চক্ষুহীন মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া নিজ দুষ্কৃতির দণ্ডভোগ কর। অকপটে আমার নিকট অপরাধ স্বীকার করিলে, এজন্য গুরুদণ্ড বিধান না করিয়া, কেবল দৃষ্টিবিহীনতা বিধান করিয়া দিলাম। মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছাক্রমে তুমি অন্ধতা নিবন্ধন এ যাত্রায় সংসারে গিয়া অনেক শত্রুর হস্ত হইতে নিস্তার পাইতে পারিবে। এবারকার চক্ষুহীনতা-যাতনার কারণ বুঝিয়া যদি সতর্ক ভাবে কালাতিপাত করিতে পার, তবে ভবকারাগার হইতে মুক্তি লাভ করিয় পুনরাগমনে নিশ্চয়ই আনন্দধাম বাসের উপযুক্ত হইবে। সাবধান! যেন এখানে আসিয়া আবার রোদন করিতে না হয়।

যমরাজের এই আদেশবাক্য শ্রবণমাত্র একজন দূত আসিয়া জীবাত্মাকে বহন পূর্ব্বক বহির্দ্দেশে গমন করিল।

পরক্ষণে আর একটী দূত আর একটী জীবাত্মাকে সভাস্থলে উপস্থিত করিল। ধর্ম্মরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার সংসার-বাসের কার্য্যবিবরণ বল।

সে জীবাত্মা বলিল—ধর্ম্মরাজ, আমি সংসারদ্বীপে গিয়া এবার এমন কোন মন্দ কার্য্য করি নাই। সর্ব্বদা আপনাকে স্মরণ করিয়াছি এবং ধর্ম্মকার্য্য করিয়াছি। আপনার উপদেশবাণী একটীও বিস্মরণ হই নাই। এখন আপনার যাহা অভিরুচি তাহাই করুন।

"চিত্রগুপ্ত, মুহুরি শক্ত, হিসাব হাসিলে দড়।
দিনের গণনা, করিছে সেজনা, ফাঁকির বাসনা ছাড়।"

তখন যমরাজ প্রিয় সচিব চিত্রগুপ্তের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন,—এই জীবাত্মার অদৃষ্টলিপি কিরূপ প্রস্তুত হইয়াছে বুঝাইয়া দাও।

চিত্রগুপ্ত তাঁহার অপর গ্রন্থ দৃষ্টে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—ধর্ম্মরাজ এ ব্যক্তি যাহা বলিল সমস্তই মিথ্যা। উহার এবারকার সংসার-কারাবাস-কালের কার্য্যবিবরণ, রাজসংসারের প্রধান কর্ম্মচারী ভবসংসারে নিযুক্ত চন্দ্র, সূর্য্য, দিবারাত্রি ভ্রমণান্তে যে সকল জীবের কৃতকর্ম্ম স্বচক্ষে দৃষ্টি করিয়া আপনার সেরেস্তায় রিপোর্ট করিয়া থাকেন, তাহাই যথাসময়ে লিপিবদ্ধ হয়। তন্মধ্যে এই জীবাত্মার কার্য্যবিবরণ যাহা লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিতেছি, শ্রবণ করুন।

এই দুর্ভাগ্য সংসারকারাবাস-কালে পূর্ব্বসুকৃতির ফলে এবার ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করে; কিন্তু কপট ধার্ম্মিক সাজিয়া বিপরীত কার্য্যে রত থাকে।

এই ব্যক্তি মহা কৃপণ ছিল; সঞ্চিত ধন ক্ষয় হইবে বলিয়া নিজের উদরে পর্য্যন্ত অল্পমূল্য কদর্য্য সামগ্রী ভিন্ন ভাল জিনিষ দেয় নাই। সমাজের বাধ্য হইয়া যদি কখন কিছু দান করিয়া থাকে, তাহা সন্তুষ্ট চিত্তে নহে। তার উপর পরশ্রীতে কাতর। অন্যের প্রশংসা উহার হৃদয়ে শেল সম বিদ্ধ হইত। বহু প্রাণীর অনিষ্টকারী হইয়া, সঞ্চিত অর্থের কিছুমাত্র সদ্ব্যবহার করে নাই। যথাকার ধন তথাতেই রাখিয়া আসিয়াছে।

এই ব্যক্তি বহু অর্থ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় পরিবারস্থ আশ্রিত জনগণের কাহাকেও পরিতৃপ্ত করিয়া ভোজন বা পরিচ্ছদ দানে সন্তুষ্ট করে নাই। অথচ মনে মনে সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়াছে—আমি এত লোকের আহার দিতেছি, আমি না থাকিলে ইহাদিগের উপায় কি হইত! ইত্যাকার চিন্তা করিয়া, এখানে আসিতে হইবে একথা বিস্মরণ হইয়া, অনর্থের মূল অর্থ দেখিয়াই প্রাণ ঠাণ্ডা করিয়াছে।

মহারাজ! ভ্রমান্ধ জীবের কিরূপ ভ্রম দেখুন। ঐ অর্থও উহার নিকটে থাকিত না। কতকগুলি কোম্পানীর কাগজ ও একখানি পাস বহিতে একের পৃষ্ঠে বহু শূন্য দৃষ্টে এত টাকা আমার আছে ভাবিয়া জীবনকে ধন্যবাদ দিয়া দিন কাটাইতেছিল। ইতিমধ্যে কারাবাস-কাল ফুরাইলে যথাসময়ে আপনার দূত গিয়া উহাকে লইয়া আসিল। তদবধি নরকে থাকিয়া বহু যাতনা ভোগ করিয়াছে। এখন সংসার-দ্বীপে গিয়া উহাকে এবার বোবা হইয়া বহু ধনের মালেক অর্থাৎ বিশ্বাসী পাহারাদার রূপে বাস করিতে হইবে। পরে ঐ ধন অপর এক জীবাত্মা উহার পোষ্যপুত্ররূপে গিয়া মদ্যপান ও বেশ্যাপদ-সেবায় ধ্বংস করিয়া আসিবে। এই হুকুম শ্রবণ মাত্রই যমদূতেরা তাহাকে টানিয়া লইয়া গেল।

অনন্তর আর একটী জীবাত্মা তথায় আনীত হইল। কৃতান্তদেব তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সংসারবাসী মানবশরীরধারী জীবাত্মা! তোমার ভবসংসারবাসের কার্য্যবিবরণ কি? তাহা বল।

তখন ঐ জীবাত্মা বলিল—ধর্ম্মরাজ, আপনার অজ্ঞাত কি আছে? কারণ আপনি ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমানের সাক্ষী। ধর্ম্মরূপে নিরন্তর কারাবাসী জীব মাত্রেরই সদসৎ সমস্ত কার্য্যই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। তবে হে ধর্ম্মাবতার, আপনার সম্মুখে মিথ্যা বলিয়া অপরাধ গোপন করি কি না, যদি তাহাই সন্দেহ করিয়া থাকেন, তবে বলিতেছি শ্রবণ করুন। ইহার পূর্ব্ববারে সংসারদ্বীপ হইতে এখানে আসিলে পর, আমি মায়ামোহে সে বারও কদাচার করিয়াছিলাম বলিয়া, সতর্কতা শিক্ষার জন্য আপনি আমাকে এক হস্ত ও একটী চক্ষু বিহীন করিয়া পুনর্ব্বার কারাগারে প্রেরণ করেন। আমি সংসারে গেলে পিতা মাতা প্রভৃতি আশ্রয়দাতৃগণ আমাকে

হীনাঙ্গ দেখিয়া, আমার প্রতি অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতে আমার অণুমাত্রও দুঃখ হয় নাই। বরং আরও আনন্দিত হইয়াই ভাবিতাম ও আত্মচিন্তার দ্বারা বুঝিয়াছিলাম যে, সংসারবাসী জীব আমাকে যতই অবজ্ঞা করিবে, আমার মায়ার বন্ধন ততই শিথিল হইবে। এইরূপ আত্মচিন্তা অভ্যাস করিতে লাগিলাম।

হে শান্তিসোপান, আপনাকে ও মৃত্যুকে বারংবার ডাকিতে লাগিলাম। যদিও কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল পূর্ণ না হওয়ায় আপনি আমার আশা পূর্ণ করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তথাপি উহার দ্বারা একটী মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। সর্ব্বদা আপনাকে স্মরণ রাখায় সংসারমোহিনী মায়া আমাকে আক্রমণ করিতে পারে নাই, রিপুগণ বশীভূত ছিল এবং চঞ্চল মন আমার অনুমতি ব্যতীত স্বেচ্ছায় কোথায়ও যাইতে পারিত না। সুমতি দেবীর কৃপায় সে সময় কেহই আমার শত্রু ছিল না। যদি কেহ ভ্রমক্রমে দুর্ব্ব্যবহার করিত, আমি তাহাকে অজ্ঞান মনে করিয়া তাহার সহিত সদ্ব্যবহার করিতাম। সংসারে কোন দুঃখের কারণ ঘটিলে, আমি উপায়ান্তর না পাইয়া ভগবানকেই উদ্দেশে বলিতাম—হে করুণাময়, তোমার এই মোহান্ধ সন্তান কোন মতেই ইহার গন্তব্য পথ দেখিতে পাইতেছে না, জ্ঞানচক্ষু প্রদান পূর্ব্বক তুমিই ইহাকে প্রকৃত পথ দেখাইয়া দেও, এই বলিয়া কাঁদিতাম। এতদ্ব্যতীত আমার সংসারের আশ্রয়দাতা সেই মাতা পিতাকেও আমি সাধ্যমত সেবা ও ভক্তি করিয়াছি। জ্ঞান সত্ত্বে তাঁহাদের প্রাণে কখনও বেদনা দিই নাই।

এইরূপ বহু কর্ম্মবন্ধনে থাকিয়া ক্রমশঃ বাল্য কৈশোর যৌবন প্রৌঢ় প্রভৃতি অবস্থায় কারাবাসের নির্দ্দিষ্ট কাল কাটিয়া গেল।

এমন সময় হে ধর্ম্মরাজ! আপনার কিঙ্কর হঠাৎ আমাকে এখানে আনয়ন করিয়াছে।

হে শরণাগতরক্ষক! এরূপ ভাবে সতর্কতা পূর্ব্বক সংসারবাস কাল অতিবাহিত করা সত্বেও আমি একটা বড়ই গর্হিত কার্য্য করিয়াছি শ্রবণ করুন—

কিছু দিন হইল সংসারবাসী আমার একটি বাল্যবন্ধু আমার নিকট বিশ্বাস করিয়া পাঁচটী স্বুবর্ণ মুদ্রা গোপনে গচ্ছিত রাখিয়া যান। আমিও তাহা নিরাপদ স্থানেই রাখিয়াছিলাম। কিছু দিন গত হওয়ার পর এক দিন আমার কোন আকস্মিক বিপদে ঐ টাকা আমি খরচ করিয়া ফেলি এবং তাঁহাকেও বলি, ভাই, এইরূপ হইয়াছে, আমি শীঘ্রই দিতেছি।

কিন্তু সে তাহা বিশ্বাস না করিয়া ক্রমে আমার উপর রুষ্ট হয়। আমিও দিই দিই করিয়া অনটন জন্য যোগাড় করিয়া উঠিতে পারি নাই। আর তিনিও কোনরূপে তাঁহার যত্নে উপার্জ্জিত অর্থের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

এই অবস্থায় আপনার দূত আমাকে এইখানে আনিয়াছে। স্বুতরাং সেই ঋণ আর আমার পরিশোধ করা হয় নাই। আহা! ঐ ব্যক্তি আমার বাটীতে আগমন ও মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া না জানি কত কষ্টই পাইতেছে এবং অভিসম্পাত দিতেছে।

ঐ জীবাত্মার ঋণদায়ে এতদূর কাতরতা দেখিয়া কৃতান্তদেব কিঞ্চিৎ কোমলস্বরে বলিলেন—ঋণ জীব মাত্রেরই মুক্তিপথের অন্তরায়। ঋণগ্রস্ত জীব স্বুমতিসেবক ও সদাচারনিরত হইলেও, যত কাল ঋণশৃঙ্খল হইতে মুক্ত না হয়, তত কাল তাহাকে সংসার যাতনা ভোগ করিতে হয়। ঋণ করিয়া কোন কার্য্যই করা উচিত

নহে। অগ্রে পরিশোধের সদুপায় স্থির করিয়া পরে ঋণ করা এটীও ভগবানের আদেশবাণী বলিয়া জানিবে।

হে জীব, কেবল ঋণী রহিয়াছ বলিয়াই তোমাকে এবারও সংসার কারাদ্বীপে প্রতিগমন করিতে হইবে। তবে এ যাত্রায় তোমাকে সংসারে গিয়া কোন অভাবই অনুভব করিতে হইবে না। এবারে তুমি তথাকার কোন স্বধর্ম্মনিরত ধনপতির গৃহে জন্ম গ্রহণ করিবে, পরে রাজার ন্যায় সম্মানও পাইবে। কিন্তু সেই সময় এক শীর্ণকায় অন্ধ মনুষ্য তোমার নিকট শত রৌপ্য মুদ্রার প্রয়োজন জানাইলে, তুমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে উহা অর্পণ করিও, তুমি অঋণী হইবে।

যমরাজের উক্তি সমাপ্ত হইলে ঐ জীবাত্মা ব্যগ্রতা সহকারে বলিল—ধর্ম্মরাজ! আমি যাঁহার নিকট ঋণী হইয়া আসিয়াছি, তিনি অন্ধ বা কোন প্রকার বিকলাঙ্গ ব্যক্তি নহেন।

কৃতান্তদেব কহিলেন—ঐ অন্ধ ব্যক্তিরই অর্থ তুমি ব্যয় করিয়াছ। ঐ অর্থও উহার শ্রমাদি সদুপায়ে অর্জ্জিত নহে। ঐ পামর ভবকারা-রুদ্ধ থাকিয়াও মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানাদি নানারূপ অসৎকার্য্যে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া, দস্যু তস্করের ভয়ে এবং সুদের প্রলোভনে নানা স্থানে নানা জনের নিকট গোপনে গচ্ছিত বা ঋণ দিয়াছিল।

ঐ ব্যক্তি কারাগারে যাইয়াও অনিত্য অর্থ উপার্জ্জন জন্য যে সকল অসদুপায় অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা তোমার শুনিবার কোন আবশ্যক নাই।

তবে এইটী জানিয়া রাখ, ঐ ব্যক্তি ঐ সকল অসৎকর্ম্মফলে এ যাত্রায় ভবকারাদ্বীপে গিয়া অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিবে। তুমিও ঐ ব্যক্তি একই কারণে এখানে উপস্থিত হইয়াছ। কিন্তু তোমা-

দিগের পার্থিব দেহ না থাকায় পরস্পর কেহ কাহাকেও চিনিতে পারিতেছ না। যে জীবাত্মার স্বর্ণ মুদ্রাপঞ্চক তুমি গচ্ছিত রাখিয়াছিলে, ঐ ব্যক্তি মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া, সংসার গমনকারী জীবগণের সঙ্গে আছে। ঐ ব্যক্তি এবার তোমার নিকট শত রৌপ্য মুদ্রা যাচ্ঞা করিতে যাইবে। তুমি কাল-বিলম্ব না করিয়া প্রদান করিবে।

এই আদেশ প্রদানের পর কৃতান্তদূত সভা মধ্যে আসিয়া ঐ জীবাত্মাকে লইয়া গেল এবং পরক্ষণে অন্য আর একদূত অপর আর একটী জীবাত্মাকে আনিয়া উপস্থিত করিল।

তখন যমরাজ কহিলেন—হে ভবকারাবাসী জীব, তোমার এবারকার সংসার বাস কালের কৃতকর্ম্ম বল। এবার ভবসংসারে গিয়া আমার আদেশ লঙ্ঘনে কি কি কার্য্য করিয়াছ?

"ধর্ম্মরাজ! আমি পূর্ব্বসঞ্চিত কিঞ্চিৎ সুকৃতিফলে, পূর্ণাবয়ব-বিশিষ্ট রমণীশরীর প্রাপ্তির ব্যবস্থায়, এবার সংসারে গিয়া একটি সুধার্ম্মিক মধ্যবিত্ত শূদ্রগৃহে, তাহার পরমাসুন্দরী কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করি। পিতামাতার আদর যত্নে লালিত পালিত হইয়া অষ্টম বর্ষ বয়স প্রাপ্ত হই। এই সময় আমার রূপলাবণ্য ক্রমে এতই বর্দ্ধিত হইয়া উঠে যে, সংসারবাসী আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামান্তরবাসী যাহারা আমাকে একবার দর্শন করিয়াছে, তাহারাই আমার রূপের প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারে নাই।

প্রকৃতপক্ষেই আমি অসাধারণ রূপবতী হইয়া উঠি। এমত সময় আমার সমবয়স্ক স্বদেশবাসী কোন ব্রাহ্মণকুমার আমার রূপে মোহিত হইয়া আমার প্রেম ভিক্ষা করেন। আমি তাঁহাকে অবজ্ঞা করি। কিন্তু ঐ ব্যক্তি ক্রমে আমার রূপ গুণ দর্শনে আমাগতপ্রাণ

হইয়া পড়েন। ফলতঃ ঐ ব্যক্তি কি চক্ষে যে আমাকে দেখিয়াছিল, জানি না। ক্রমে আমার জন্য ঐ ব্যক্তি উন্মাদের ন্যায় পথে পথে ভ্রমণ করে। তাহার তৎকালীন অবস্থা দৃষ্টে যদিও আমার মন সামান্য পরিমাণে বিচলিত হইয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু সমাজের নিন্দাভয়ে এবং তিনি উচ্চবংশ জাত, আমি তদপেক্ষা হীনবংশসম্ভূতা বিধায়, উভয়ের প্রকৃতিগত পার্থক্য হেতু উভয়ের বাসনা পূর্ণ হওয়ার পক্ষে ব্যাঘাত ঘটে।

এমত সময় পিতামাতা আমাকে একটী সুপুরুষের সহিত বিবাহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করান। আমি বিবাহান্তে শ্বশুরালয়ে গমন করি। তৎকালে আমার শ্বশুরের আর্থিক অবস্থা ততদূর সচ্ছল ছিল না। কিন্তু আমি তাঁহাদের গৃহে যাইবার পর হইতেই যেন তাঁদের অবস্থা ফিরিয়া যায়। আমার স্বামীর উপার্জ্জন, মান সম্ভ্রম, নাম যশ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে থাকে। সুতরাং আমিও তাঁহাদিগের নিকট বহু আদর যত্ন পাইতে লাগিলাম। এমন কি, আমার স্বামী সংসারে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া অল্প দিন মধ্যে বহু আশ্রিত-প্রতিপালক হইয়া উঠিলেন।

আমিও পূর্ব্বস্মৃতি সকল ভুলিয়া গিয়া তদ্গত প্রাণে পরম আনন্দে স্বামীর সেবা ও সংসারকার্য্য করিতে থাকি। স্বামীসঙ্গ লাভে পরম সুখী হইয়া দিন কাটাইতে কাটাইতে, আমার গর্ভে অনেকগুলি সন্তান হয়। তন্মধ্যে কতক মরিয়া যায়, কতক থাকে। আমি সে সকল লইয়া একরূপ সুখে দুঃখে দিন অতিবাহিত করিতে-ছিলাম। এমত সময় আমার সংসারসুখের সার রত্ন পতিধনে বঞ্চিত হইয়া অসহ্য যাতনা অনুভব করি। অকালে আমার স্বামী কালগ্রাসে পতিত হওয়ায় আমি বিধবা হই। ঐরূপ

বহু দিন বৈধব্যযাতনায় জীবন্মৃত অবস্থায় দিন কাটাইতে লাগিলাম।

এমত সময় কিছুদিন পর কোথা হইতে সেই ব্রাহ্মণকুমার আসিয়া আমার পতিগৃহে উপস্থিত হইলেন। এবং তিনি যে আমার জন্যই দুঃখ পাইতেছেন, তাঁহাকে দেখিয়াই আমি তাহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু তথাচ প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিয়াই আমার পতিশোক ও পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়া উঠে। আমি তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষে দৃষ্টি করি। তৎপরে ক্রমে তাঁহার একাগ্রতা ও অকৃত্রিম ভালবাসার চিহ্ন দেখিয়া আমার মন তাঁহার প্রতি ঢলিয়া পড়ে। কিন্তু মৌখিক তাঁহার বাসনার নিন্দা করিয়া বহু তিরস্কার করিয়া প্রত্যাখ্যান করি। কিন্তু সে ব্যক্তি আমাতে এতই আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এক মুহূর্ত্তও সে আমাকে না দেখিয়া বা বিস্মরণ হইতে না পারিয়া পথে পথে ক্রন্দন করিয়া বেড়াইতে থাকে। তাহার তৎকালীন অবস্থাদৃষ্টে আমার অতিশয় দয়া হয় এবং আমার মনও তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়।

উভয়ের এক বাসনা সত্ত্বেও আশা অপূরণ-কাল মধ্যে আপনার দূত গিয়া আমাকে এখানে আনিয়াছে। অন্তর্যামিন্, এই আমার কৃতকর্ম্মের বিবরণ। এখন যাহা আপনার সুবিচার হয় তাহাই করুন।

তখন কৃতান্তদেব গম্ভীর স্বরে বলিলেন—তোমার সংসারবাসের কার্য্যবিবরণ শ্রবণ করিয়া আমি প্রথমতঃ সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। কিন্তু যে কোন কারণেই হউক, আপন অপেক্ষা কোন জীবকেই লঘু মনে করিয়া ঘৃণা করিতে নাই। শারীরিক পার্থক্য দেখিয়া উপেক্ষা করিলে ভগবান অসন্তুষ্ট হন, অতএব তোমার একান্ত আকাঙ্ক্ষিত তোমাগতপ্রাণ সেই ব্রাহ্মণতনয়কে প্রত্যাখ্যান করিয়া

তুমি অপরাধিনী হইয়াছ। সুতরাং এবারেও তোমাকে ভবকারাগারে যাইতে হইবে। এই বলিয়া সচিবশ্রেষ্ঠ চিত্রগুপ্তের দিকে দৃষ্টি করিয়া বলিলেন—মন্ত্রী! এই জীবাত্মার অদৃষ্টলিপি কিরূপ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইয়া দাও।

তখন চিত্রগুপ্ত তাঁহার খাতা দৃষ্টে বলিলেন—মহারাজ, এই জীবাত্মা এবার সংসার-কারাবাস-কালে যদিও বিশেষ কোন অপরাধের কার্য্য করে নাই, কিন্তু একটী ব্রাহ্মণকুমারের মনে বেদনা দিয়াছে। যদিও উহার কর্ত্তব্যই সাধনা করিয়া আসিতেছিল, তথাপি উহার পূর্ব্ববারের দুষ্কৃতি দ্বারা এবার বিধবা হইয়া অনেক সময় নয়নজলে ভাসিয়াই সংসারবাস করিয়াছে।

কিন্তু সেই সময় কোন ব্রাহ্মণকুমার উহার রূপ-গুণে মোহিত হইয়া, উহাকে একান্ত প্রাণে ভালবাসিয়া, উহার সঙ্গ-সুখ কামনায় দিনাতিপাত করিয়াছে। ঐ জীবাত্মা অন্যান্য সুকৃতি-বলে পুনর্জ্জন্ম রোধ করিয়াছিল, কেবল উহারই সঙ্গ-লালসারূপ দুষ্কৃতির জন্য এখানে আসিয়া পুনরায় সংসারে গিয়া ব্রাহ্মণগৃহে জন্মের আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব এ জীবাত্মাও এবার তথায় গিয়া, কোন ধার্ম্মিক সুব্রাহ্মণের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া, পূর্ব্ব জীবাত্মারই পত্নীরূপে বাস করিবে। ঐ ব্রাহ্মণের সুকৃতিফলে এবং আকর্ষণ শক্তিতে ইহাকে এবার উন্নত যোনিতে জন্মগ্রহণ করার আদেশ দেওয়া গেল। এখন উভয়ে এক মতে আপনাপন কর্ত্তব্য পরিপালন পূর্ব্বক কারাদণ্ড ভোগান্তে এখানে আসিবার পর, আনন্দধামের শান্তি নিকেতনে আশ্রয় পাইবে। এইরূপ উচ্চ সঙ্গ লাভ না হইলে উহাকে আরও কত জন্ম ঐ রূপ শূদ্রযোনিতে জন্ম গ্রহণ করিতে ও রোগ শোক যাতনা ভোগ করিতে হইত।

এই আদেশবাণী শেষ হইলেই পার্শ্বস্থিত দূত তাহাকে সে স্থান হইতে লইয়া গেল।

এই সময় আর এক দূত অন্য আর একটী জীবাত্মার হস্ত ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হইল।

তখন কৃতান্তদেব তাহাকে দেখিয়াই বলিলেন—তোমার কারাগারবাসকালীন কার্য্যবিবরণ বল। সেই জীবাত্মা করুণার্দ্র হৃদয়ে বলিতে লাগিল—হে অন্তর্যামিন্. আপনার অবিদিত কিছুই নাই। তথাচ যখন আদেশ করিতেছেন, তখন বলিতেছি শ্রবণ করুন।

গত জন্মের পূর্ব্বে আমি সংসারে গিয়া বহু অপকর্ম্ম করিয়াছিলাম, তন্মধ্যে বিশেষ অপরাধ এই যে, বিষ্ঠাজাত কতকগুলি কৃমিকে বিষ্ঠাতেই ওতপ্রোতভাবে ক্রিয়াপর দর্শনে তাদের দুর্দ্দশার বিষয় চিন্তা করিয়া ব্যথিত না হইয়া বরং হীন বা নিকৃষ্ট যোনিজাত অস্পৃশ্য প্রাণী বোধে ঘৃণা করিয়াছিলাম। তদনন্তর সে বারের কারাদণ্ডের কাল পূর্ণ হইলে এখানে আসিয়া ঐ গুরু অপরাধের দণ্ড ভোগার্থ আপনি আমাকে পুনরায় ভবসংসারে গমনপূর্ব্বক পুরীষজাত ঐ প্রকার কৃমিশরীর ধারণ করিতে আদেশ করেন। ঐ অন্যায় কার্য্য জন্য ব্যাকুল হইয়া কত কাঁদিলাম, কত পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া ক্ষমা চাহিলাম। কিন্তু কিছুক্ষণ আপনি কোন কথাই কহিলেন না।

পরে গম্ভীরস্বরে বলিলেন—কাঁদিলে এখানে ক্ষমা পাওয়া যায় না। এবার তোমাকে কীটজন্ম ধারণ করিতে হইবেই হইবে। যাও—এবার তোমার আর কোন বিশেষ অপরাধ নাই বলিয়া মৃত শৃগালের গলিত দেহে কীটরূপে কিয়ৎকাল থাকিয়া কর্ম্মফল ভোগ কর। আপনার আদেশ মত ঐরূপ জন্মগ্রহণ করিয়া (জীবাত্মা বা প্রাণরূপে) ঐ গলিত দেহে আশ্রয়লাভ ও তাহারই রসে শরীর পোষণ

করিয়া নিদারুণ যন্ত্রণা পাইতে থাকি ; কিন্তু কৃপাময়, এজন্মে আপনার কৃপায় আমার এখনকার অর্থাৎ যমালয়ের ও আনন্দধামের সমস্ত কথাই স্মরণ থাকে। ঐ পূতিগন্ধযুক্ত গলিতমাংস শৃগালশরীরে থাকিয়া কোন ক্রমে কালযাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু উহা হইতে নিস্তার প্রাপ্তির কোন গতি নাই দেখিয়া সুমতি দেবীর কৃপায় অগতির গতি বিধাতা ভগবানকেই ডাকিতে লাগিলাম, হে প্রাণেশ্বর! এই দুর্ব্বিসহ দুঃখযাতনা হইতে আমায় পরিত্রাণ কর, আর নির্দ্দয় হইও না।

কিন্তু তখনি মনে হইল, হায়। হায়! আমি এ কি করিলাম, আর নির্দ্দয় হইও না!—ছিঃ ছিঃ এরূপ বলা আমার ভাল হয় নাই; যিনি অন্তর্যামী, দুঃখ জানাইয়া তাঁহার নিকট আর প্রার্থনা করিব কি? তিনি ত সমস্তই জানিতে পারিতেছেন। আর দুঃখ বলিয়া যাহা জানাইলাম, তাহাই বা কি পদার্থ? তিনি যাহা দেন, তাহা কি দুঃখ হইতে পারে? তবে যে আমি সংসারযাতনা ভোগ করিতেছি, সে আমার নিজ-রোপিত কুকর্ম্ম বৃক্ষেরই কটুফল। যদি ইহাই দুঃখ বলিয়া স্থির হয় তবে তাহা দূর করিবার জন্য ভগবানকে জানাইবার প্রয়োজন কি? কুকর্ম্ম না করিলে ত দুঃখ আপনিই দূরে পলায়ন করিবে। অনুশোচনা-সূচক এই প্রকার চিন্তা উদিত হওয়ায় চিত্ত পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ হইল এবং সুস্থ অন্তর মধ্য হইতেই কে যেন বলিয়া দিল, হে জীব! সুখ-দুঃখ সকল অবস্থাতেই "ভগবান, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক" বলিয়া সদাসর্ব্বদা প্রার্থনা কর, তবেই তোমার মঙ্গল হইবে।

আমি অমনি তাঁহাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলাম "হে দীননাথ, তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক।" শৃগাল-শরীর-রসে পুষ্ট কৃমিশরীরে

থাকিয়াও হৃষ্টচিত্তে কিয়ংক্ষণ এইরূপে পরমেশ্বরকে ডাকিতে ডাকিতেই সহসা সেই ক্ষুদ্র কৃমিশরীর অচেতন হইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পরেই সেই মোহ অপসারিত হওয়ায় দেখিলাম, আমি আপনার দূত কর্ত্তৃক এইখানেই আনীত হইয়াছি। ধর্ম্মরাজ! এবার সংসারে গিয়া আমার কৃতকর্ম্ম এই। এখন আপনার বিচারে যাহা বিবেচনা হয় করুন।

কৃমিশরীরধারী জীবাত্মার উক্তি সমাপ্ত হইলে পর যমরাজ সসম্ভ্রমে বিনীতভাবে বলিলেন—তপোধন! আমার ত্রুটী হইয়াছে, পরম পিতার নির্দ্দেশ ক্রমে জীবের কর্ম্মফল সূক্ষ্মরূপে বিচারপূর্ব্বক দণ্ডমুক্তিরূপ দুরূহ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া কোন কোন সময় ব্যস্ততা বশতঃ আমারও ভ্রান্তি ঘটিয়া থাকে। অদ্য কতকগুলি জীবাত্মার কর্ম্মফল বিচারের দিন থাকায় এবং যে সকল জীবাত্মার বিচারকার্য্য শেষ হইয়াছে, সচিব-মুখে উহাদের সহিত আপনারও এখানে আগমনের কাল উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া আমি দূত দ্বারা উহাদিগের সহিত আপনাকেও এখানে উপস্থিত করিয়াছি। অতএব আপনি ঐ সাধু মহাত্মাগণের আসনপার্শ্বে উপবেশন করুন। আপনি এখন উঁহাদিগের সহিত বাস করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন।

তৎপরে কৃতান্তদেব সভাসদ্‌গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—নিত্য নিত্য এই সকল জীবকুলের দুঃখ-দুর্দ্দশা দর্শনে আমি অপরিসীম কষ্ট অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু উহারা আমার আদেশবাণী বিস্মৃত হইয়া বারম্বার ভবসংসারে যাতায়াত এবং পুনঃ পুনঃ নরকাদির ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও মোহিনী মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার চেষ্টা করে না। যাহা হউক, অদ্য সময় অতীত হইয়াছে—অতএব সভা ভঙ্গ করা হউক।

যমের আদেশে তদ্দণ্ডেই সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। কৃতান্তদেব

ঐ সাধু মহাত্মাগণকে সঙ্গে লইয়া সদানন্দধাম-অভিমুখে গমন করিলেন। যমদূতগণ তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঐ সকল পাপী জীবাত্মা গণকে আনন্দধামের সেই গুপ্ত গৃহ দর্শন করাইতে লইয়া গেল, অপরাপর কর্ম্মচারিগণ সকলে স্ব স্ব স্থানে চলিয়া গেলেন।

আমি ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম, এবং কখন্ সতীরাণী আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন, তাহারই চিন্তা করিতেছিলাম।

আরও কিয়ৎক্ষণ অতীত হইয়া গেলে, সতীরাণী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—এবং তাঁহার সঙ্গে আর দুইজন দিব্যকান্তি পুরুষ আগমন করিলেন,—দর্শনেই চিনিলাম, জীবের পরম সুহৃদ্ আমার পূর্ব্বপরিচিত সেই বিবেক ও সত্য।

সতীরাণী আমার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—ভ্রাতঃ! আমার বিশেষ কার্য্য থাকা হেতু আমি তোমাকে লইয়া সংসারদ্বীপে গমন করিতে সক্ষম হইলাম না। আমার এই বিবেক ভ্রাতা তোমাকে সে স্থানে রক্ষা করিয়া আসিবেন। তুমি ইহার সঙ্গে গমন কর।

তদনন্তর বিবেকের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন—ভ্রাতঃ! তুমিই সংসার-দ্বীপে গিয়া ইহাকে অমরনাথে ইঁহার নিজ আশ্রমে রাখিয়া আইস।

আমি তখন সতীরাণীকে প্রণাম করিয়া, বিবেকের পশ্চাদনুবর্ত্তন করিলাম। সত্য এক মুহূর্ত্তও বিবেক ছাড়া থাকেন না, সুতরাং উভয়েই আমাকে অমরনাথে রাখিয়া যাইবার জন্য এই হরিদ্বারে আসিয়া পৌ-ছিলেন। আমি এখান হইতে একাকীই নিজ আশ্রমে যাইতে পারিব বলিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিয়া, তোমার অপেক্ষা করিতেছিলাম।

বৎস! তোমার নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বিস্তারিতরূপে প্রকাশ করিলাম। ইহাতেই তুমি সমস্ত বিষয় অবগত হও।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সাধু উপদেশ।

তখন ঐ সাধু মহাপুরুষের উর্দ্ধলোকভ্রমণ ও অপূর্ব্ব সতী-কাহিনী শ্রবণে আমি অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া গিয়াছিলাম। করজোড় পূর্ব্বক গদ্গদভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—হে জ্ঞানিন্! হে সর্ব্বদর্শিন্! এক্ষণে আমার পরিত্রাণের উপায় কি, তাহাই বলিয়া দিয়া আমার উত্তপ্ত হৃদয়কে সুশীতল করুন।

সন্ন্যাসী কিয়ৎকাল গম্ভীরভাবে অবস্থান করতঃ তৎপরে বলি-লেন,—আমি কয়েকটি কথা বলিব, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর, এবং সেই উপদেশ কয়টি স্মরণ রাখিতে পারিলে সংসারবাসের অবশিষ্ট সময় আনন্দে কাটাইতে পারিবে।

আমি যে কয়েকটী কথা তোমাকে বলিতেছি, তাহা এ ধামের কথা নহে। সেই আনন্দধাম হইতে যখন সংসারকারাবাস করিবার জন্য জীবকুল আদেশ প্রাপ্ত হইয়া এখানে আইসে, তখন দয়ার সাগর ভগবানের ইচ্ছাক্রমে স্বয়ং কৃতান্তদেব ঐ উপদেশ-বাক্যগুলি স্মরণ রাখিবার জন্য জীবগণকে বারংবার অনুরোধ করেন, এবং পুনঃ পুনঃ সতর্ক থাকিতে বলিয়া দেন।

বৎস! তুমি এখন ঐ শেষ উপদেশবাণী কয়েকটি শুনিবার অধিকারী হইয়াছ। কারণ ইতিপূর্ব্বেই তোমার অযাচিত দেবদর্শন লাভ হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হইতেছে

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম,—গুরুদেব! সত্যই! আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই। আপনার কৃপাতেই বোধ হয় সেই আনন্দধামবাসী বিবেক ভ্রাতা আমাকে দর্শন দিয়া সাধু উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সে কথা আমি ত আপনাকে কিছুমাত্র বলি নাই। তবে কি প্রকারে জানিতে পারিলেন?

তখন সন্ন্যাসী কিঞ্চিৎ হাসিয়া বলিলেন,—বৎস! পূর্ব্বেই বলিয়াছি, তোমার পরিণাম অদৃষ্ট উত্তম। এ মর-জগতে সকল বিষয় জানিতে হইলে কেবল নিজে নিষ্কাম হইয়া তাঁহার প্রেরিত কর্ম্মচারী জ্ঞানে, "ঘৃণা লজ্জা ভয়, এ তিন থাকিতে নয়" এই প্রাচীন বাক্য স্মরণ রাখিয়া এবং এ সমুদয় তাঁহারই প্রদত্ত এই ধারণায় কার্য্য করিয়া যাইতে হয়, তবেই দূরদৃষ্টি লাভ হইয়া থাকে। এতাবৎকাল তোমাকে ইহপরলোকের যে সমুদায় বৃত্তান্ত অবগত করাইলাম, তাহা শ্রবণে অবশ্যই তুমি বোধগম্য করিতে পারিয়াছ যে, এই ভবকারাগারদ্বীপে মানবগণ কর্ম্ম করিবার হেতুই আগমন করিয়া থাকে। এবং ইহাও বুঝিতে পারিয়াছ যে, এই ভবসংসার কর্ম্মক্ষেত্র— কারাগার মাত্র। মানবকুল জন্মগ্রহণ করিয়া মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতেই আসিয়াছে এবং করিতে বাধ্য।

আমি কহিলাম—আপনার উপদেশে তাহা বুঝিতে আমার কিছুমাত্র বাকি নাই।

সন্ন্যাসী। তবে আমার উপদেশই গ্রহণ কর—তাঁহারই কার্য্য করিতে আসিয়াছ, তাঁহারই ইচ্ছানুরূপ কার্য্য কর। তুমি এখন তোমার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন কর।

আমি কহিলাম—হে গুরো! আপনি অধম সন্তানের উপর এ কি আদেশ প্রদান করিতেছেন? আমি যে সকল অলৌকিক

কথা আপনার নিকট শ্রবণ করিলাম, এবং এতদিন ভ্রমণে যাহা স্বচক্ষে দৃষ্টি করিলাম, তাহাতে কিছুতেই আমার সংসারে যাইতে ইচ্ছা নাই। মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন। আমাকে আপনার নিকটে রাখিয়া সতত ধর্ম্ম উপদেশ প্রদানে সেই সদানন্দধাম-বাসের উপায় বলিয়া দিয়া সুখী করুন।

সন্ন্যাসী। বৎস! তোমার আর এখন সন্ন্যাসী সাজিয়া ভ্রমণ করিবার অবশ্যক নাই। কর্ম্মবীজ ভাল থাকায়, ঘরে বসিয়াই তোমার অমূল্য নিধি লাভ হইবে। ইহা তাঁহারই ইচ্ছা বলিয়া জানিবে। আমি দিব্য চক্ষে দর্শন করিতেছি, গৃহে তোমার যে মূর্ত্তিমতী সতী গৃহলক্ষ্মীরূপে বিরাজ করিতেছেন, জীবনের শেষ কয়েকটী দিন তাঁহার নয়নজল না ফেলাইয়া তাঁহার সেবা যত্ন করিলেই তোমার সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হইবে এবং অন্তিমে দম্পতিযুগলে আমার আশীর্ব্বাদে এবং সতীরাণীর কৃপাতেই সে ধামে আনন্দে বাস করিতে পারিবে।

ইহা মনে করিও না যে, কেবল রমণীগণই পতির সেবা ও যত্ন করিতে বাধ্য। তাহারা যেরূপ দেবতাজ্ঞানে পতিপদাশ্রিতা হইয়া সতীত্বরত্ন লাভ করিয়া, অক্লেশে সতীরাণীর আশ্রয় পাইতে পারে, সেইরূপ পুরুষগণেরও সতীত্ব আছে। যদি তাহারাও দেবীজ্ঞানে একনারী-ব্রহ্মচারী হইয়া নিজ ভার্য্যায় রত থাকিয়া যত্নে তাহা রক্ষা করিতে পারে এবং সম্পূর্ণভাবে সহধর্ম্মিণীর মনস্তুষ্টি করিতে সক্ষম হয়, তবে দেহাবসানের পর তাহারা কৃতান্ত কর্ত্তৃক আনন্দধামে নীত হইয়া চিরশান্তিময় আবাসে স্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এ বাক্য ধ্রুব সত্য। আমি স্বচক্ষেই দর্শন করিয়াছি। দেখ, গৃহস্থ হইতে সুখী কেহ নাই, এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইতে সহজ ও সুখকর ধর্ম্ম আর নাই।

তোমার সন্ন্যাসী হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কঠোরতা করিবার কোন দরকার নাই;—তুমি বাটি ফিরিয়া যাও।'

আমি। আপনি ত পুনঃপুনঃই ঐ কথা বলিতেছেন, সেখানে গমন করিলে আবার সেই সকল মায়াপূর্ণ কর্ম্মে আবদ্ধ হইয়া পড়িব,—অতএব এই ঘোর কলির শাসনসময়ে কিরূপ ভাবে স্বীয় ধর্ম্ম ঠিক রাখিয়া, পঙ্কিল মায়িক কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া, কঠোর সংসার-ধর্ম্ম আচরণ করিব?

সন্ন্যাসী। সংসারে বাস করতঃ সুমতিকে সর্ব্বদা ভালবাসিবে। সুমতি নিকটে থাকিলে দয়া, শান্তি, বিবেক, সত্য প্রভৃতি সকলেই তোমার হৃদয়পুরে বাস করিবেন। এবং কলির কার্য্য সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। এই কালে জীবগণ যেরূপ অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট হইয়া কার্য্য করিয়া সুখী হইবে, তুমি সে সুখ ত্যগ করিবে। বৎস! ত্যাগ অপেক্ষা আর সুখ নাই। ধারণা রাখিবে, তাঁহারই কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

আমি। সত্যই কি আমাকে পুনরায় সংসারবাস করিতে যাইতে হইবে? তবে অতঃপর কলির কার্য্য ক্রমশঃ কিরূপ হইবে, তাহা উপদেশ করুন, একটু শুনিয়া যাই।

সন্ন্যাসী। হাঁ। শুন বলিতেছি,—

বৎস! এই কালে সত্যধর্ম্ম, পবিত্রতা, ক্ষমা, দয়া, আয়ুবল এবং স্মৃতি বিনষ্ট হইবে। এইকালে ধনই মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদার্থ হইবে এবং ধর্ম্ম নির্দ্ধারণ বিষয়ে ধনই বলবৎ হইবে। আকাট মূর্খ ও কদাকার হইলেও ধনবান্ ব্যক্তিই রূপবান্, গুণবান্ ও জ্ঞানবান্ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এই কলিতে রুচি অনুসারে বিবাহ ও তৎসম্বন্ধে ক্রয়বিক্রয় হইবে এবং স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যাহার রতিকৌশল অধিক, তিনিই শ্রেষ্ঠ হইবেন। এই কালে—

"ন মাংসভক্ষণে দোষো ন মদ্যে ন চ মৈথুনে।
প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা॥"

ইত্যাদি অনেক শাস্ত্রবাক্যের বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়া অনেকে তদনুরূপ কার্য্য করিবে। এইকালে ব্রাহ্মণদিগের চিহ্নের মধ্যে কেবল যজ্ঞসূত্রগাছটী গলে থাকিবে; আচার, বিনয়, বিদ্যা প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহাদিগের নিকট হইতে বিদায় লইবে। দেখো বৎস! তাই বলিয়া কোন ব্রাহ্মণ-দেহকেই অবজ্ঞা ও অভক্তি করিও না। কারণ ব্রাহ্মণ যদি অপকর্ম্মকারী বা পতিত হয়, তবু তাহাকে ব্রাহ্মণই বলে। সুতরাং তাহাকে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি কিম্বা ভুজঙ্গ শিশু বলিয়াই জানিবে। কলির পণ্ডিতেরা বহুবাক্য ব্যয় করিবেন এবং অর্থলোভে অন্যায় ব্যবস্থাপত্র প্রদানেও সঙ্কুচিত হইবেন না। এই সময়ে কেশধারণ কেবল সৌন্দর্য্যের জন্য হইবে। মনুষ্যগণ সর্ব্বদা শীত, বাত, রৌদ্র, বর্ষা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধি এবং চিন্তার দ্বারা জরাগ্রস্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাইবে। মনুষ্যদিগের পরমায়ু ৫০ বৎসর স্থির থাকিবে, কিন্তু অধিকাংশই ২০।২২ বৎসর বয়সে মানবলীলা শেষ করিবে। ক্বচিৎ ২।১০ জনকে দীর্ঘায়ু দেখিলে, তাঁহাদিগকে সাধক বলিয়া জানিবে। এইকালে দেহীদিগের দেহ খর্ব্বাকৃতি ও ক্ষীণ হইবে এবং মনুষ্যদিগের জাতিভেদ বা বর্ণভেদ থাকিবে না। মনুষ্যেরা চৌর্য্যকার্য্যে তৎপর হইবে। মিথ্যা ভিন্ন সত্য বলিবে না।

কলিতে ছল, মিথ্যা, আলস্য, নিদ্রা, হিংসা, দুঃখ, শোক, মোহ, ভয় ও দৈন্যদশাই প্রাধান্য হইবে। এই কারণে মনুষ্যগণ ক্ষুদ্রদর্শী, অল্পভোগী, অধিক আহারকারী, বিলক্ষণ কামী ও ধনহীন এবং অধিকাংশ স্ত্রীই অসতী হইবে। প্রত্যেক গ্রাম ও নগর পাষণ্ড ও

দস্যুর দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিবে। ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত পেটুক হইবে,—নিমন্ত্রণ জুটিলে জাতিবিচার করিবে না। স্ত্রীলোকেরা খর্ব্বাকৃতি, অধিক-ভোজী হইবে, এবং বহুসন্তান প্রসব করিবে। লজ্জা থাকিবে না। নিরন্তর কটুভাষিণী হইবে এবং সর্ব্বদা চৌর্য্য ও ছল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইবে। তখন স্বামীরা গুরুর ন্যায় স্ত্রীসেবা করিবে ও স্ত্রৈণ হইবে। ঈর্ষ্যাই স্ত্রীলোকদিগের স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইবে, ও প্রায় সংসারেই ভ্রাতৃবিচ্ছেদ ঘটাইবে। এই কালের গো সকল ছাগবৎ খর্ব্বাকৃতি হইয়া অল্প দুগ্ধ প্রদান করিবে। ঘৃতাদিতে পূর্ব্বের ন্যায় গন্ধ ও মিষ্টতা থাকিবে না এবং বৃক্ষাদিতে প্রচুর পরিমাণে ফল জন্মিবে না। কলিকালে শ্যালকেরাই পৃথিবীর মধ্যে পরম বন্ধু হইবে। লোকে পিতা মাতা ও ভ্রাতার পরামর্শ না লইয়া ইহাদের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিবে। আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ সকলের গুণ ক্ষীণ ও হীনবীর্য্য হইবে। মেঘ হইলে জল হইবে না,—কেবল বিদ্যুৎ-উৎপত্তি ও বজ্রপাত হইবে। মনুষ্যগণের গর্দ্দভের ন্যায় আচরণ হইবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় গুণ প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিবে, এবং ব্রাহ্মণেরা শূদ্রের ন্যায় তাহাদিগের নিকট ব্যবস্থা লইতে যাইবে। অন্নকষ্ট, অতি-বৃষ্টি ও অনাবৃষ্টির প্রাদুর্ভাব হইবে এবং লোকের অর্থ, বস্ত্র, পান, ভোজন, স্থান ও ভূমি থাকিবে না। যৎসামান্য অর্থ লইয়া ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ঘটিবে। লোকে অন্নাভাবে মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা ও পত্নীকে প্রতিপালন করিতে সক্ষম হইবে না। স্ত্রী পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ প্রত্যেককেই পরিশ্রম করিয়া খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতে হইবে। কপট-ধর্ম্ম ও ধর্ম্মপ্রচারকের সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে। পাপীর সংখ্যা এতই বৃদ্ধি হইবে যে, নরকে স্থান হইবে না। ইত্যাদিরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ-

ভাবে হইতে দেখিলেই—তখন পুনঃ সত্যের আলো প্রকাশ পাইবে।

বৎস! কলির কার্য্য জ্ঞাত হইলে। এখন সর্ব্বদা সতর্ক থাকিয়া, কণ্টকাকীর্ণ বনমধ্যে অমৃতফললাভ প্রত্যাশার ন্যায়, ভগবানের এই পীযূষপূর্ণ আদেশবাণী কয়েকটী যত্নপূর্ব্বক পালন করিতে পারিলে সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে,—

"প্রথম,—যত্নপূর্ব্বক শরীর রক্ষা করিও।

দ্বিতীয়,—আত্মহত্যা করিও না।

তৃতীয়,—অন্তরে সুখের আকাঙ্ক্ষা রাখিও, সুখের মূল আনন্দ লাভের অধিকারী হইবে।

চতুর্থ,—উদাসীন হও, কিন্তু চক্ষের অগোচর হইও না।

পঞ্চম,—হিংসা, দ্বেষ পরিহার কর। জীবমাত্রেই জগৎকারণের অংশস্বরূপ বুঝিতে পারিবে।

ষষ্ঠ,—সকলকে হাসাও কিন্তু আপনি কাঁদ; অশ্রুধারা অমৃত-বর্ষণ করিবে।

সপ্তম,—পরিণাম চিন্তা করিয়া কর্ম্মে লিপ্ত হও; ফলের জন্য চিন্তার প্রয়োজন নাই।

অষ্টম,—আর্থিক প্রার্থনা যথাসাধ্য পূর্ণ কর, কিন্তু কাহাকেও আশ্বাস দিয়া রাখিও না।

নবম,—ভবিষ্যৎ কার্য্যের জন্য প্রতিজ্ঞা করিও না, কারণ পর মুহূর্ত্তও তোমার আয়ত্ত নহে।

দশম,—লক্ষ্য উর্দ্ধদিকে রাখ, কিন্তু চক্ষু যেন নিরন্তর নিম্ন-দিকেই থাকে।

একাদশ,—সত্যের আশ্রয় লইয়া তাহার সেবা করিতে থাক, যথাকালে সত্যের স্বরূপ দর্শনে কৃতার্থ হইবে।

দ্বাদশ,—কণ্টক আহরণের আশা পরিত্যাগ কর, বেধন-যাতনা হইতে অব্যাহতি পাইবে।

ত্রয়োদশ,—কামাদি অনায়ত্ত বন্ধুবর্গকে মায়ামোহিনীর চরণ-সেবায় সতত নিরত রাখিও না; বান্ধবতা বৈরিতায় পরিণত হইবে।

চতুর্দ্দশ,—প্রত্যেক পাদবিক্ষেপের পূর্ব্বেই অন্ধ না হও ত, চাহিয়া দেখিও; সূর্য্যকিরণ প্রকাশিত হইলে আর নক্ষত্রের আলোক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না।

পঞ্চদশ, পঙ্কিল জলে মৎস্য জীবিত থাকিতে পারে না, কিন্তু ভেকশাবকগণ সুখে গান করে।

ষোড়শ,—যৌবনকে কদাচ অযত্ন করিও না, প্রৌঢ়ে সে তোমার সৌহৃদ্য করিবে।

সপ্তদশ,—নিরাকার প্রাণকে নিরাকার ভগবানের সেবায় নিরত রাখ, পরিশ্রম সার্থক ও অভীষ্ট পূর্ণ হইবে।

অষ্টাদশ,—সকলকেই সন্তুষ্ট করিব ভাবিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইওনা; একই বৃক্ষের সকল ফল সমান নহে।

* কাম এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কামনা বা কোন অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির ইচ্ছা। কাম, মিলন বা সংযোগ দ্বারা প্রেম বা আনন্দই কামনা করে। বস্তুতঃ যে পদার্থের সংযোগ বা মিলন দ্বারা প্রকৃত প্রেম বা আনন্দ লাভ করা যায়, কাম তাহারই সংযোগ কামনা করে। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখা উচিত যে, যে বৃত্তি ঐ প্রেমরূপ অমূল্য নিধি প্রার্থনা করে, সে বন্ধু না হইয়া কি কখনও শত্রু বা রিপু হইতে পারে? তবে দেশ কাল পাত্র বিশেষে ব্যবহার-ব্যতিক্রমে অধিকাংশ স্থলে রিপু বা শত্রুর কার্য্যই করে। 'ইহার বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত "রতিবিলাস" নামক গ্রন্থে দেখিতে পাইবেন।'

আমি। আপনার আজ্ঞা আমার অলঙ্ঘনীয়। যদি আপনার আদেশে আমাকে সেই প্রলোভনপূর্ণ সংসারে গমন করিতে হয়, আমি সেস্থানে গিয়া কি প্রকারে আদেশ পালন করিয়া ধর্ম্মকার্য্য করিব, তাহা বলিয়া দিন।

সন্ন্যাসী। বলিয়া দিয়াছি ত, সুমতিকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, এবং স্ব স্ব বর্ণোচিত আচার ও ধর্ম্মাচরণ করাই গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া জানিবে। গৃহদ্বারে অতিথি ও ভিক্ষুক উপস্থিত হইলে বিমুখ করিবে না। প্রাণ দিয়াও পরোপকার করিবে। সাধারণকে সর্ব্বদা শিক্ষা দিবে এবং নিজে ঐ অষ্টাদশ উপদেশবাণী মনে রাখিবে। পুরাতন রীতি ছাড়িবে না!—দেখ বৎস! গৃহস্থ হইতে ভাগ্যবান্ কেহ নাই। যদি প্রকৃত ভক্তিযোগী হইয়া গৃহস্থ সংসার করিতে পারে, তবে সে সংসারের দ্বারদেশে সাধুমূর্ত্তিতে ভগবান্ উপস্থিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। কোন কোন স্থানে পার্থিব সর্ব্বনাশ করিয়াও ভক্তের নিকট দাসরূপে থাকিতে শুনা গিয়াছে। ভগবদুক্তি শুনা আছে,—

"নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে নচ।
মদ্ভক্তা যত্র তিষ্ঠন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥"

আবার সাদা কথায় শুনা যায়,—

"যে করে আমার আঁশ, তার করি সর্ব্বনাশ ;
তবু না ছাড়ে আমার-আশ, তবে হই তার দাসের দাস।"

ভক্ত! দেখ, কর্ম্মী! শেখ, জ্ঞানী! বুঝ। ভগবান্ আনন্দময় আমাদিগের নিকট কিরূপভাবে ঘুরিতেছেন। ভক্তের নিকট প্রভুরূপে, শিষ্যের নিকট গুরুরূপে আর কর্ম্মীর নিকট ফলরূপে এই চিন্ময় জগৎ ব্যাপিয়া আছেন। তাই ডাকি, তাই কাঁদি, তাই আনন্দ

করি, তাই ভক্তি করি, পূজা করি। কিছু বুঝিলে কি? ভগবানের প্রেমভাব বড় ভাল লাগে, তাই মধুরলীলা এত মধুর। তাই মিছিরীখণ্ড হইতে তরলায়মান ইক্ষুরস বেশী মধুর বলিয়া বোধ হয়। তাই বলি, সন্ন্যাস অপেক্ষ সংসার শ্রেষ্ঠ ও সুধাপরিপূর্ণ। সাধনায় সঙ্গী উত্তর সাধক মিলে, আনন্দে কর্ম্ম শেষ হয়। সন্ন্যাস আপাত-কঠোর, রসহীন।

আমি। তা বুঝিলাম, আপনার বাক্যই শিরোধার্য্য ; অতঃপর আমাকে একটি আশ্বাসবাণী দান করিতে হইবে।

সন্ন্যাসী। কি? বল!

আমি। আমার চরমকাল উপস্থিত হইলে আপনি দর্শন দান করিয়া আমার গতি করিবেন।

সন্ন্যাসী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন—আচ্ছা, তাহাই হইবে।

আমি তখন সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে বহির্গত হইলাম। মহাপুরুষও উঠিয়া অমরনাথাভিমুখে গমন করিলেন।

কয়েকদিন নানা স্থানে ঘুরিয়া তৎপরে কাশী আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এখানে আসিয়া কেদারঘাটে একদিন রজনী প্রভাতে একটী ঘটনা দৃষ্টে আরও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। তাহা এ স্থানে অপ্রকাশ রহিল। (আদি কৃষ্ণলীলা নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়া পাঠক পাঠিকার কৌতূহল নিবৃত্তির চেষ্টা পাইব।) চারি পাঁচ দিন কাশীবাসের পর কলিকাতায় আসিলাম।

কলিকাতার বাসায় আসিয়া বিভূতিভূষণের বাড়ীর সন্ধান লইলাম, শুনিলাম—তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী লীলা স্বামী ও সপত্নীর মৃত্যুসংবাদ অবগত হইয়াছেন, এবং তাঁহার স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি উত্তমর্ণগণ বিক্রয় করিয়া লওয়ায় তিনি পিতৃভবনে গমন করিয়াছেন।

তাঁহার সপত্নী তাঁহাকে যে অলঙ্কারগুলি দান করিয়া গিয়াছেন, কেবল সেইগুলিই তাঁহার সঞ্চিত ধনস্বরূপে ছিল।

আমি কয়েকদিন কলিকাতায় বাস করিয়া তৎপরে বাড়ী রওনা হইলাম। পথিমধ্যে আচার্য্য পদ্মলোচন ঠাকুরের বাটী। যাই-বার সময় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাওয়ার মানস হইল। গিয়া দেখি, ঠাকুর ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে নগ্নগাত্রে কাষ্ঠপাদুকা পায়ে সংসারের কার্য্যে বিব্রত আছেন। দেখিয়া ভাবিলাম, সংসার কাহাকেও ছাড়ে না;—তবে কেহ লিপ্ত, কেহ নির্লিপ্ত। আমি ঠাকুরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। ঠাকুর অনেকক্ষণ আমার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিলেন;—কে পুরন্দর! তুমি কোথা হইতে? অনেক দিন হইল তুমি নিরুদ্দেশ ছিলে, আমি তোমার সংবাদ লইয়াছিলাম।

এখন ব্যাপার কি? কোথায় কোথায় ঘুরিলে? বাবা! ঘুরিয়া কিছু হয় না। এখন ভাল আছ ত?

আমি ঠাকুরের কথায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া মনে মনে চিন্তা করিলাম—ঠিক কথা। তৎপর ভ্রমণকাহিনী সমস্ত ঠাকুরকে বলিয়া, শেষে বলিলাম,—প্রভু! সংসার ভিন্ন উপায় নাই। আবার সেই সংসারে আসিতে হইল। কি কি প্রকারে সংসারে অবশিষ্ট জীবনের কার্য্য নির্ব্বাহ করিব বলিয়া দিন।

ঠাকুর হাসিয়া বলিলেন,—বৎস পুরন্দর! পাখী বৃক্ষশাখে বসিয়া থাকে, শাখা ছাড়িয়া আকাশ পানে উড়িতে আরম্ভ করে, উড়িয়া উড়িয়া যখন পক্ষ অবশ হয়, তখন আবার সেই বৃক্ষ-শাখায় আসিয়াই বসে,—এও তদ্রূপ। কিন্তু এ ভবসংসার সুখের নয়, কেবল পর-উপকার ও সাধুকার্য্যই সংসারবৃক্ষের অমৃত ফল। সেই ফল

যাঁহারা খুইয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই সুখী। দেখ, পূর্ব্বে যে সকল পরোপকারী ব্যক্তিগণ জন্মিয়াছিলেন, কালস্রোতে তাঁহারাও ভাসিয়া গিয়াছেন। আছে মাত্র তাঁহাদের কীর্ত্তি। তাঁহারা মহা মহা উপদেশ প্রদান করিয়া এবং গ্রন্থ রচনা করিয়া লোকের যে সকল উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার গৌরব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; তাই বলি,—

"ভাল মন্দ দুই, সঙ্গে চলি যায়ব।
পর-উপকার সে লাভ।"

ইহাই জগতের সার তত্ত্ব-ধর্ম্মের মূলভিত্তি—পুণ্যের সুবর্ণ সোপান জানিয়া কার্য্য করিবে।

"চলচ্চিত্তং চলদ্বিত্তং চলজ্জীবনযৌবনং।
চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি॥

সকলই চলিয়া যায়, থাকে কেবল কীর্ত্তি। এই সংসার এক মহা শ্মশান। প্রকৃতি কাহারও মুখ তাকায় না। যে চিতানল ইহাতে অহরহঃ জ্বলিয়া গর্জ্জিতেছে, তাহাতে না পোড়ে এমন জিনিস নাই। যাহা সম্মুখে পায়, তাহাই পোড়াইয়া সমান জ্বলিতে জ্বলিতে, সমান হাসিতে হাসিতে চলিয়া যায়। ঐ যে ঊর্দ্ধদিকে নক্ষত্রনিচয় অল্পান্ধকারে ঝক্ ঝক্ করিতেছে, ঐ যে পদতলে নিম্নদিকে বালুকা-কণা প্রখর রবিকরে চিক্ চিক্ করিতেছে, ও সকল এই বিশ্বব্যাপী মহা বহ্নির স্ফুলিঙ্গ মাত্র। আরো দেখ, এ সংসারের কোথায় অনল নাই? নির্ম্মল চন্দ্রালোকে, প্রফুল্ল মল্লিকা ফুলে, কোকিলের রবে, কুসুমের সৌরভে, মলয় পবনে, পাখীর কূজনে, রমণীর মুখে, পুরুষের বুকে—কোথায় অনল নাই? কিসে মানুষ পোড়ে না! ভালবাস—পুড়িতে হইবে, ভালবাসিও

না—তদধিক পুড়িতে হইবে, পুত্রকন্যা না হইলে—শূন্যগৃহ লইয়া পুড়িতে হইবে। হইলে—সংসার জ্বালায়, রোগ শোকে, অভাব অনটনে এবং বিষয় বণ্টনে পুড়িতে হইবে। শুধু মানুষ কেন, সমস্ত জীবই পুড়িতেছে। কে পোড়ে না! এ সংসারে আসিয়া সুস্থ মনে, অক্ষত শরীরে কে গিয়াছে? তাই বলিতেছি, সারা সংসার ঘুরিয়াও এ পোড়ার হস্তে অব্যাহতি নাই। বরং গৃহে শান্তি আছে।

আবার ভিন্ন ভাবে দেখিলে দেখিতে পাইবে এ সংসার একটী মধুর বাটী। মানুষ তাতে দুই শ্রেণীর ক্ষুদ্র পিপীলিকা। খাবার আকাঙ্ক্ষায় এক শ্রেণী উহাতে গিয়া পড়িয়া ডুবিয়া মরে, আর এক শ্রেণী চতুর পিপীলিকা উপরে উঠিয়া নিম্নদিকে মুখ করিয়া ধীরে ধীরে খায়; মধু শেষ করিয়া অবশেষে ঐ বাটী মধ্যেই বিচরণ করিয়া বেড়ায়। তাই বলি এখন গৃহে যাও। চতুর পিপীলিকাবৎ মধু পান কর। অমর হইবে। অনলে পুড়িতে হইবে না। বরং শীতল হইবে। শান্তি পাইবে।

দেখ বৎস! সাধুকার্য্যে—কোন মহৎ উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি জীবনপাত করে, তাহার অক্ষয় কীর্ত্তিই তাহাকে আবহমানকাল জীবিত রাখে। তোমার জীবনেও এখন তাই কর্ত্তব্য।

আমি নিকটে আছি, মধ্যে মধ্যে সাক্ষাৎ করিও। আর এই মহাবাক্যটী স্মরণ রাখিয়া সর্ব্বদা সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিও লিপ্ত হইবে না।

"ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন।
যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি।"

অনেকে মুখে এই কথাটি বলেন বটে; কিন্তু মনে সে ভাব রাখেন না। মনে মুখে এক করিয়া কাজ করিও; অমৃত ফল লাভ করিবে।

নবম পরিচ্ছেদ।

—০:০:০—

গৃহস্থালী—না পতি-পূজা।

পদ্মলোচন ঠাকুরের বাড়ী আহারান্তে বেলা দ্বিপ্রহরের পরে আমি বাড়ী গিয়া উপস্থিত হইলাম,—তখনও আমার সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিহিত ছিল। বাড়ীর সকলে সে বেশ দর্শন করিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন। আমি তাঁহাদিগের দুঃখ দূর করণার্থে সে বেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহস্থের উপযোগী বেশভূষা পরিধান করিলাম, তাহাতে আত্মীয় স্বজন সকলেই সুখী হইলেন।

প্রতিবাসী বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়গণ আমার নিকট নানা দিগ-দিগন্তের এবং বহুতীর্থের অবস্থা অবগত হইতে লাগিলেন। তাঁহা-দিগের সহিত নানাবিধ আলাপে ও কথাবার্ত্তায়—বহুক্ষণ অতি-বাহিত হইয়া গেল।

ঠিক সন্ধ্যার পরে গৃহিণীর সহিত সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার ম্লান মুখে হাসি ফুটিয়াছে।

তিনি গললগ্নীকৃতবাসে,—একটী প্রণাম করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এতাবৎকাল দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া কি ধন লাভ করিতে পারিলে?

আমি কহিলাম—যে ধন গৃহে রাখিয়া গিয়াছিলাম, তদ্রূপ রত্ন আর কোথাও প্রাপ্ত হইতে পারি নাই।

গৃহিণী হাসিয়া কহিলেন—সে কি? মিথ্যা কথা!

আমিও হাসিলাম। হাসিতে হাসিতে কহিলাম,—আমি

একটী সতীরমণীর অপূর্ব্ব জীবনবৃত্তান্ত দর্শন ও শ্রবণ করিয়া আসিয়াছি। যদি তুমি শুন আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে।

গৃহিণী বলিলেন, হাঁ, শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে, তুমি বল।

আমি তখন বিভূতিভূষণ ও কমলমণির অপূর্ব্ব জীবনবৃত্তান্ত স্বচক্ষে যেরূপ দর্শন ও সন্ন্যাসী মহারাজের নিকট যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলাম, তাহা আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলাম। গৃহিণী অতিশয় মনোযোগের সহিত তাহা শ্রবণ করিলেন। তৎপরে বলিলেন—প্রাণেশ্বর! তুমি যাহা বর্ণনা করিলে, তাহাতে আশ্চর্য্যের কথা কিছুই নাই। সে রমণী তাহার আত্মকর্ত্তব্য প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র। অধিক কিছুই করে নাই।

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—প্রিয়তমে! তুমি কি বলিতেছ? এরূপ কর্ত্তব্য কর্ম্ম কয়জন স্ত্রীলোকে সম্পাদন করিতে পারে?

গৃহিণী বলিলেন—সকল ঘটনা সকল সময়ে লোকলোচনের সমীপবর্ত্তী হয় না বলিয়াই জানিতে পারা যায় না। নতুবা এখনও এ জগতে অনেক সতীনারীর অনেক সদনুষ্ঠান জানিতে পারা যাইত।

আমি হাসিয়া বলিলাম, স্বামীর জন্য আত্মসুখ পরিত্যাগ করিয়া দেশে দেশে এমন করিয়া স্বামীকে সন্ধান করা, কয়জনের দ্বারা সংঘটিত হয়?

গৃহিণী। সে কার্য্য বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

আমি। নিশ্চয়ই। কৈ, আমি ত গৃহ ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছিলাম—তুমি কি আমার অনুসন্ধানে যাইতে পারিয়াছিলে?

গৃহিণী হাসিয়া বলিলেন—যাই নাই ত তোমাকে বাড়ী ফিরাইয়া আনিল কে?

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম, তুমি নাকি?

গৃহিণী। হাঁ।

আমি। কি প্রকারে?

গৃহিণী। একেই বলে সতীর তেজ। স্বামী যেখানেই যান্— সতীর যদি তেজ ও ভক্তি ভালবাসা থাকে, তবে সেই তেজেই তাঁহাকে টানিয়া আনে। এই শক্তিতেই একদিন সাবিত্রী সত্যবানের মৃত্যু-রোধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

আর একটী কথা, দেখ আমি একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি। শুনিবে?

আমি। কি বল, ঐ মধুর কণ্ঠ শুনিবার জন্যই ফিরিয়া আসিতে হইয়াছে।

গৃহিণী। থাকিবার যো কি? চুম্বকে আকর্ষণ করিলে লৌহ কতক্ষণ থাকিতে পারে? একদিন তোমার চিন্তায় তন্ময় হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে নিদ্রিত হইয়া পড়ি। এমন সময় দেখিতে পাইলাম, ঊর্দ্ধলোক হইতে রথারোহণে এক অপূর্ব্ব সুন্দরী যুবতী রমণী, কি এক দিব্য কিরণ বিকীর্ণ করিতে করিতে, আমার শয্যাপার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সে কিরণ যেমন স্নিগ্ধ, তেমনি আনন্দপ্রদ শীতল। আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম, কিছুই বলিতে পারিলাম না। কিন্তু সেই অলোকসামান্যা সুন্দরী সরলা যুবতী মূর্ত্তিমতী সতী আমার হস্ত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—ভগ্নি! উঠ রোদন করিও না। তোমার দুঃখ-নিশা অবসান হইয়াছে। তোমার পতি-দেবতা আগতপ্রায়। তিনি গৃহে আসিলেই তাঁহার অনুমতি লইয়া পুণ্যকর উমাব্রত করিও। সেই ব্রত-ফলে এবং আমার

দর্শন বলে দেহান্তে পতিসহ সদানন্দধামে অক্লেশে সতীরাজ্যে বাস করিতে পারিবে।

তবে উমাব্রত স্ত্রীলোকের বড়ই কঠিন সাধনা। সাধ্যা সধবারাই অধিকারিণী। তুমি ব্যবস্থামত তাহা করিও; কিন্তু উদ্‌যাপন করিতে কিছু অর্থের আবশ্যক। তাহাও তোমাদের গ্রাম্য দেবমন্দিরের নিম্ন-দেশে কোন এক স্থানে প্রোথিত আছে। স্বামীসঙ্গে মিলিত হইয়া ঐ গুপ্তধন উঠাইতে পারিবে। সে ধনে তোমারই অধিকার। কিন্তু এখন পাইবে না, বিলম্ব আছে। ঐ ধনের সদ্ব্যবহার করিও। *

সহসা নিদ্রাভঙ্গ হইল। গৃহ অন্ধকার, আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন তোমার আগমনরূপ আনন্দ-চিন্তায় বিভোর হইলাম।

আমি একটু চিন্তা করিলাম। ভাবিলাম—ব্যাপার কি ?

তখন গৃহিণী বলিলেন—দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া তুমি কি লাভ করিলে ?

আমি। সন্ন্যাসী মহারাজের কৃপা ও দেবপুরুষদিগের আশীর্ব্বাদ এবং তাঁহাদিগের কৃপায় আমার অজ্ঞান-অন্ধকার বিদূরিত হইয়া তোমাকেই লাভ।

গৃহিণী। আর গৃহে থাকিয়া আমি যাহা সংগ্রহ করিয়াছি, তাহা দেখিবে এস।

* দম্পতিযুগলের গুপ্তধন অদৃশ্য, পুনঃ প্রাপ্তি ও নিরাপদে উত্তোলন, আশ্চর্য্যরূপে তাহার সদ্ব্যবহার, উমাব্রতের সম্পূর্ণ বিধি ব্যবস্থা, বিবেকের আগমন, পদ্মলোচন ঠাকুরের ও সন্ন্যাসীর পুনঃ দর্শন, দম্পতিযুগলের একসঙ্গে আশ্চর্য্যরূপে দেহাবসান, সতীরাজ্যে গমন ইত্যাদি সতীর তেজের অপূর্ণ অংশ সকল "সতীর তেজ" উপন্যাস ৪র্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইবে। পাঠক পাঠিকা কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া আবশ্যক বোধ করিলে কিছু বিলম্বে পাইবেন। ৪র্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ।

আমি। কোথায় যাইব?

গৃহিণী। আমার সঙ্গে আইস।

আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া গৃহিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলাম। গৃহিণী তখন গৃহবহির্গত হইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া সেই অন্ধকার রজনীতে একটী অপ্রশস্ত পথ ধরিয়া চলিলেন। অনতিদূরে গ্রাম্য দেবালয়। তন্মধ্যে শ্রীশ্রীজয়দুর্গার মন্দির বা জোড় বাঙ্গলা নামে যে চতুর্দ্দিকে নিবিড় তরু-লতা-গুল্মাদি-সমাচ্ছন্ন বহুকালের পুরাতন দেবালয় আছে, তথায় গিয়া উপস্থিত হইলেন।

আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। এটী আমাদের গ্রামের ঠাকুর-বাটী, এখানে দিবসেও প্রায় এখন জন প্রাণীর গতাগতি হয় না। কারণ দুরবস্থাই সকল কীর্ত্তি লোপ করে। কেবল একটী মাত্র ব্রাহ্মণ আসিয়া দুপুর বেলা পূজা এবং সন্ধ্যাবেলা সামান্যরূপ আরত্তি করিয়া বৈকালী দিয়া যান। আর একটী পতিপুত্রবিহীনা অনাথিনী বিধবা জয়দুর্গার সেবা করেন ও মায়ের ভোগ প্রসাদ পাইয়া জীবন রক্ষা করেন মাত্র। এই ভগ্নপ্রায় বাঙ্গলার মধ্যে একখানি পিত্তলময়ী দশভুজা দুর্গামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। এই মূর্ত্তি ও মন্দির রাণী-ভবানীর সমসাময়িক।

কিংবদন্তী আছে,—এই গ্রামবাসী চক্রবর্ত্তীবংশের আদি পুরুষ, রামগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামক এক সাধক মহাপুরুষ নাটোর রাজধানীতে রাণী ভবানীর স্নেহের পাত্র হইয়া চাকুরী স্বীকার করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের চাকুরী স্বীকার তখন সেই প্রথম। তৎকালে উক্ত রাণী এই পিত্তলময়ী দশভুজা জয়দুর্গার মূর্ত্তি ও এই জোড় বাঙ্গলা বা মন্দির প্রস্তুত করাইবার সমস্ত ব্যয় এবং সেবার জন্য একখানি তালুক পুত্রস্নেহের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে প্রদান

করিয়াছিলেন। প্রদান করিবার একটু কারণও ছিল। এই প্রতিমা, নাটোর দুর্গা বাড়ীতে যে স্বর্ণময়ী মূর্ত্তি অদ্যাপি প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহারই অবিকল অনুরূপ। শ্রুত আছি, কোন কর্ম্মকারকে পরীক্ষা করিবার জন্য সেই ধর্ম্মপ্রাণা নাটোরেশ্বরীর ইচ্ছা হইয়াছিল; কর্ম্মকার মার কাণের স্বর্ণও চুরি করে। তাই যাহাতে চুরি করিতে না পারে, তদ্‌বন্দোবস্তে নিজ বাটীতে এক গৃহে বহু পাহারা পরিবেষ্টিত করিয়া তাহাকে স্বর্ণ প্রদান করিলেন। ঐ ব্যক্তি বাহিরে যাইবার সময় বিশেষ পরীক্ষিত হইয়া যাইবে, এই নিয়মে কাজ করিতে থাকে। বহুদিন এইরূপ কার্য্য অন্তে প্রতিমা প্রস্তুত সমাধা হইলে, বলে,—মা, অদ্য এই প্রতিমা তেঁতুল মাখাইয়া বেশী জলে ভিজাইয়া রাখিতে হইবে। অতএব আপনার খিড়কির পুকুরে রাখিয়া দিন; রাত্রে পাহারা পরিবেষ্টিত করিয়া রাখুন; প্রাতেই উঠাইয়া, আনিয়া পালিস করিয়া, আপনাকে দিব।

রাণী সম্মত হইলেন। প্রতিমা কর্ম্মকার নিজেই মস্তকে করিয়া ঘাটে লইয়া সিঁড়ীর পার্শ্বে নিশানা করিয়া গভীর জলে ডুবাইয়া রাখিয়া আসিল। সমস্ত রাত্রি পাহারা পরিবেষ্টিত থাকিল। কোন বিষয়ের কোন ক্রটী হইল না। প্রাতে কর্ম্মকারকে ডাকাইলেন। সে আসিয়া সর্ব্বজনসমক্ষে ঐ প্রতিমা উঠাইল, এবং পরিষ্কার করিয়া রাণী মাকে দিল মহারাণী রোজই দেখিতেছেন, আজিও দেখিয়া চিনিলেন—তাঁহার সেই প্রতিমাই—আরও পরিষ্কার হইয়াছে। তখন রাণী বলিলেন,—তোমার কারুকার্য্যে খুসী হইয়াছি। এজন্য পারিতোষিক পাইবে। এখন চুরি কি করিয়াছ বল। চুরি করিবেই বলিয়াছিলে, বোধ হয় এত কড়া পাহাড়ায় তাহা পার নাই। সে বলিল,—মা, অমি ষোল আনাই চুরি করিয়াছি। এই দেখুন,—বলিয়া তখম ঐ

পুকুরে গিয়া নামিল এবং সেই স্থানে ডুবিয়া, সেই স্বর্ণময়ী প্রতিমা তুলিয়া আনিল।

রাণী এবং দর্শকমণ্ডলী দুইখানি প্রতিমারই অবিকল একরূপ গঠন-নৈপুণ্য দেখিয়া পরম সন্তুষ্ট হইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং তাহাকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। রাণী তাহাকে বহু ধন প্রদান করিলেন। তৎপরে ধারণা হইল, দুই মূর্ত্তি কি হইবে? তখন রাম-গোবিন্দ-পুত্র কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তীকেই উপযুক্ত পাত্র জ্ঞানে সেবা-উপযোগী সম্পত্তি সহ পিত্তলময়ী এই দশভুজা দুর্গাপ্রতিমা দান করেন। তদবধি এই মূর্ত্তি এই স্থানেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সে বহু কালের কথা। তখন ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থা। পূর্ণভাবে শাসিত না হওয়ায় চোর ডাকাতের উৎপাত অহরহই ভোগ করিতে হইত। তাই অধিকাংশ পল্লীবাসী ধনবান ব্যক্তিগণ সঞ্চিত ধন তাম্র কিম্বা পিতলের ঘড়া এবং কঠিন মৃণ্ময় বৃহৎ জালায় পরিপূর্ণ করিয়া মৃত্তিকা অভ্যন্তরে পুতিয়া রাখিতেন।

জনশ্রুতি আছে, ঐ চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। তৎকালে ধন রক্ষা করিবার জন্য বর্ত্তমান কালের ন্যায় অন্য কোনরূপ নিরাপদ উপায় না থাকায় তিনি ঐ পথ অবলম্বন করিয়াছিলেন।

গৃহিণী আমাকে ঐ বাঙ্গলার সম্মুখে লইয়া গিয়া, ভিতরে প্রবেশ না করিয়া, মন্দির-সংলগ্ন আর একটী একতালা দালানের নিকটে গেলেন। সেটীকে ভোগ মন্দির বলিত। মায়ের যখন জাঁক জমকে পূজা হইত, তৎকালে এই মন্দিরে ভোগ রন্ধন হইত, তাই ভোগ মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। বাল্যকালে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি। এখন সে স্থানে কেবল স্তুপাকার ইট, রাবীশ এবং দুই একখানি

মোটা ও সরু কড়ি বরগা দেখা যায়। তদুপরি বৃক্ষাদিতে ও লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ নিবিড় জঙ্গল। তন্মধ্যে গৃহিণী অগ্রে অগ্রে প্রবেশ করিলেন। আমি স্ত্রীলোকের সাহস দেখিয়া অবাক্ হইলাম। ঐ ইট কাঠ পূর্ণ জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়াই একটী সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইলাম। গৃহিণীর হস্তে একটী বাতি ছিল, তাহাই জ্বালিলেন। উভয়ে ২।৩ হাত, নিম্ন দিকে নামিলাম। নীচে নামিয়া দেখি একটী ক্ষুদ্র গৃহ। ঐ গৃহ মধ্যে পূর্ব্ব-উল্লিখিত একটী জালা ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে বড় বড় ৮টী ঘড়া মণ্ডলাকারে সাজান আছে। প্রত্যেক ঘড়ার ও জালার মুখ দৃঢ়রূপে বদ্ধ এবং প্রত্যেকের উপরে এক একটী সর্প বসিয়াছিল। আলো দেখিয়াই হউক কিম্বা লোক-সমাগমেই হউক উহারা নিম্নদিকে কোথায় চলিয়া গেল।

গৃহিণী আমার দিকে চাহিয়া হাসিলেন। আমি বিস্মিত হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া রহিলাম। তখন বলিলেন,—ইহার রহস্য পরে জানিতে পারিবে। চল আর এখানে নয়, এ গুপ্ত ধন উঠাইবার ও ব্যবহার করিবার বিলম্ব আছে। এখন মায়ের মন্দিরে যাই। আমি কলের পুতুলের ন্যায় তাঁহার পিছনে পিছনে উপরে উঠিয়া জোড় বাঙ্গালা বা জয়দুর্গার মন্দিরে আসিলাম।

সেই মায়ের সম্মুখে আহ্নিকের স্থান ও পূজারি জায়গা একটু জমকালরূপ ছিল। বোধ হয় আমি বাটী পৌছিলেই, সেই জয়-দুর্গা দেবীর সেবাকারিণী অনাথা বিধবার দ্বারা গৃহিণী এরূপ বন্দো-বস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আলো জ্বলিতেছে। ধূপ ধূনার গন্ধে বনমধ্যস্থ সেই নির্জ্জন দেবপুরী আমোদিত হইয়াছে।—গৃহিণী আমাকে তথায় লইয়া উপস্থিত করিলেন। আমি বহুদিন পর মাতৃ

সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যাহা দেখিলাম তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম। মা যেন সেই প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির আলোকিত করিয়া সহাস্য বদনে বলিলেন, বৎস, আমার ও আমার মন্দিরের অবস্থা দেখ ইহা দূর করিবার জন্য তুমি তোমার শেষ জীবনে ব্রত অবলম্বন কর। সিদ্ধকাম হইবে। কি আশ্চর্য্য! এই আদেশবাণী। শ্রবণমাত্র আমার শরীর রোমাঞ্চিত ও পুলকিত হইয়া উঠিল। মাকে প্রত্যক্ষ পাইয়া কিছু বলিব বলিব মনে করিতেছি। এমত সময় গৃহিণী গাত্র স্পর্শ করিয়া দেখাইলেন, ঐ তোমার আসন— এই আমার আসন। তুমি শিব, আমি শক্তি। তুমি পতি, আমি পত্নী। আমি পূজক, তুমি পূজ্য। এতদিন শূন্যাসনে তোমার পূজা করিয়াছি। আজ তুমি ঐ আসনে উপবেশন কর, পূর্ণাসনে সাধ মিটাইয়া আমি তোমায় পূজা করিব।

আমি সেই আসনে উপবেশন করিলাম। গৃহিণী পূজা করিলেন। পূজান্তে প্রণাম—

তব তত্ত্বং ন জানামি
কীদৃশোঽসি মহেশ্বর।
যাদৃশস্ত্বং মহাদেব
তাদৃশায় নমো নমঃ॥
কেন মার্গেণ ভোঃ স্বামিন্
দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ।
তাং কৃপাং কুরু মে স্বামিন্
নমামি চরণং তব॥

প্রার্থনা।

জীবন-দেব!

সরলা অবলা বালা জানিত না কোন প্রেম,
তারে তুমি দীক্ষা দিলে, কালী, রাধাকৃষ্ণ ঃ
যে মহা প্রেমের যোগে, বাঁন্ধা এই চরাচর,
সেই প্রেম শিক্ষা দিলে প্রাণপতি প্রাণেশ্বর!
তোমার প্রেমের গাথা আমার অমূল্য ধন—
চয়ন করিয়া করি ক্ষুদ্র গ্রন্থ সমাপন।
শিরেতে ধরিয়া নাথ! তোমারি চরণধূলি,
বড় আশা সেবিকার—চরণ পূজিবে বলি।
হে দেবতা! দীক্ষা তব, তোমারি অর্পিত ধন—
করিছে সভক্তি চিত্তে ও চরণে সমর্পণ।

শান্তি শান্তি শান্তি।

শ্রীমতী—দেবী।
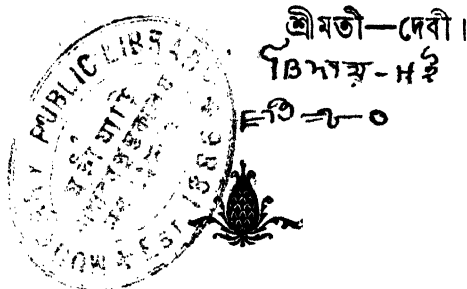
সমাপ্ত।

সতীর তেজ

উপন্যাস সম্বন্ধে বঙ্গের প্রধান প্রধান

হিন্দু মহাত্মাদিগের ও সুপ্রসিদ্ধ বঙ্গ পত্রিকার মন্তব্য

—০:*:০—

মহামহোপাধ্যায়—

সংস্কৃত কলেজের প্রিন্‌সিপাল এম, এ, পি, এচ্, ডি,

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ অধ্যক্ষ মহাশয় যাহা বলিয়াছেন—

"শ্রীযুক্ত বাবু দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত 'সতীরতেজ' নামক গ্রন্থ পাঠ করিয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম। গ্রন্থকার অতি সরল ভাষায় হিন্দু দর্শন ও নীতি সম্বন্ধে অনেক কথা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, ইহাতে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। আশা করি, সাধারণে এই গ্রন্থের যথোচিত সমাদর হইবে। এই গ্রন্থ বিক্রয় করিয়া যাহা লাভ হইবে তাহা দৈবচরণ বাবু নিজে গ্রহণ করিবেন না। শ্রীশ্রী৺ জয়দুর্গার মন্দির সংস্কার জন্য সমস্ত অর্থ ব্যয় করিবেন। তাঁহার উদ্দেশ্য অতি মহৎ। তিনি সফল মনোরথ হইলে আমি অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিব।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

(অধ্যক্ষ)

স্বনামখ্যাত উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের ভূতপূর্ব্ব বিচার পতি হাইকোর্টের জজ্

শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের

অভিপ্রায় পত্র ২০।১।১৪।

গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "সতীর তেজ" বেশ ভাল করিয়া পড়িয়াছি। গ্রন্থের উদ্দেশ্য মহৎ এবং গ্রন্থ প্রকাশিত মতে আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে।

উপন্যাস অংশ বেশ সুন্দর ও আকর্ষক এবং ভাষাও প্রাঞ্জল। এরূপ গ্রন্থ আমরা অনেক চাই কিন্তু মহাশয়ের ন্যায় সুলেখক কোথায়?

বশম্বদ

শ্রীসারদা চরণ মিত্র।

সুলেখক গ্রন্থকার বিচার পতি গুপ্ত সাধক।

জেলা হুগ্‌লির সেসন জজ।

শ্রীযুক্ত বরদাচরণ মিত্র মহাশয়ের—

অভিপ্রায় পত্র।

দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের "সতীর তেজ" নামক গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ লাভ করিলাম। গ্রন্থ খানিকে "উপন্যাস" বলা হইয়াছে। উপন্যাস বলিলে সচরাচর যাহা বুঝা যায়, গ্রন্থখানি তাহা নয়। কিন্তু গল্পের ছলে হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রের অনেক মূল্যবান কথার অবতারণা করা হইয়াছে, এবং তাহা বর্ত্তমান সময়ে বিশেষ উপযোগী ও উপকারপ্রদ বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থখানি সম্পূর্ণভাবে আস্তিক্য বুদ্ধি প্রণোদিত। ভরসা করি গ্রন্থ খানির যথোপযুক্ত আদর হইবে।

শ্রীবরদাচরণ মিত্র।

সতীর তেজ

নলীয়া-ঈশ্বরী

শ্রীশ্রীজয়দুর্গা মাতার

ভগ্ন-মন্দির সংস্কারার্থে সাহায্যোপহার।

যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন—

মহাশয়! আমরা কতিপয় ব্রাহ্মণ সন্তান উদ্যোগী হইয়া নিম্নলিখিত আর্য্য হিন্দু পুরাকীর্ত্তি সংরক্ষণে যত্নবান্ হইয়াছি।

ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নলীয়া গ্রামে পুরাতন একটী জোড়-বাঙ্গালা নামাখ্যাত দেবীমন্দির আছে। মন্দিরটী বহু পুরাতন ও প্রকাণ্ড, প্রাচীন কারুকার্য্য বিশিষ্ট। বর্ত্তমান সময়ে দুই লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও এরূপ কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সংস্কার অভাবে কীর্ত্তি লোপ পাইবার উপক্রম হইয়াছে। মন্দির মধ্যে ধাতুময়ী দশ-ভুজা শ্রীশ্রী৺ জয়দুর্গা মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কালক্রমে অবস্থার হীনতায় দেবীসেবাও চলা দুষ্কর হইতেছে।

তাই দেখিয়া স্বধর্ম্মানুরাগী দেশহিতৈষী গ্রন্থকার মহাশয় এই "সতীর তেজ" নামক ধর্ম্মমূলক অপূর্ব্ব উপন্যাস খানি প্রণয়ন করিয়া উক্ত জয়দুর্গা মন্দির সংস্কার ফণ্ডে সম্পূর্ণ স্বত্ব দান করিয়াছেন। গ্রন্থ-কারের উদ্দেশ্য মাতৃমন্দির সংস্কার এবং দেবীসেবা নির্ব্বাহ হওয়া। কিন্তু সংস্কার কল্পে অন্যূন দশসহস্র টাকার আবশ্যক। তাহা সংগ্রহের জন্য উক্ত পুস্তক বিক্রয় এবং স্বধর্ম্মানুরাগী মহাত্মা-হিন্দুসন্তান দিগকে এক এক খানি উপহার দিয়া তাঁহাদের অক্লেশ-প্রদত্ত সাত্ত্বিক দান গ্রহণ দ্বারা পুরাকীর্ত্তি রক্ষার চেষ্টা করা যাইতেছে।

অতএব উক্ত পুস্তকখানি মহাশয়ের স্থায় দেশ হিতৈষী স্বধর্ম্মানু-রাগী ব্যক্তিকে মাতৃ আশীর্ব্বাদ রূপে অর্পণ করিয়া যথা সম্ভব সাহায্য প্রার্থনা করিতেছি।

সত্যের পরিচয় গ্রহণে আশা করি, শক্তিও ইচ্ছানুরূপ সাহায্য করিয়া অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় দ্বারা ক্ষণস্থায়ী জীবনের সার্থকতা লাভ করিবেন এবং দশভুজা মাতার দশভুজ প্রসারণ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া চিরসুখী হইবেন।

'যদি কোন হিন্দু মহাত্মা উদ্দেশ্য বিষয়ে দান যুক্তিসঙ্গত মনে করেন, তবে দয়া প্রকাশে নিম্নলিখিত ধনরক্ষকের নামে পাঠাইলে মাতৃকার্য্যের সদ্‌ব্যবহারে আসিবে।

সহকারী ধনাধ্যক্ষ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রমোহন চক্রবর্ত্তী সেবাইত

৺জয়দুর্গা মন্দির নলীয়া

পোঃ আঃ............নলীয়া, ফরিদপুর।

কার্য্যাধ্যক্ষ

শ্রীগিরিচরণ চক্রবর্ত্তী।

শ্রীঅক্ষয়কুমার চট্টোপাধ্যায়,

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নলীয়া।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন মজুমদার,

সতীর তেজ উপন্যাস কার্য্যালয়।

২৩।১।৩ নং অপার চিৎপুর রোড—কলিকাতা।

উচ্চ ধর্ম্মাধিকরণের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি হাইকোর্টের জজ

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিমত।

নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা

২৬ আশ্বিন ১৩২০।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন—

আপনার "সতীর তেজ" পাঠ করিয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। পুস্তকখানিতে বিশেষ একটু নূতনত্ব ভাব আছে, বঙ্গ মহিলাগণের বিশেষ পাঠোপযোগী হইয়াছে এবং পাঠ করিয়া তাঁহারা এককালে জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবেন। পরন্তু শ্রীশ্রী৺জয়দুর্গা মাতার ভগ্ন মন্দির-সংস্কারার্থ চাঁদার পত্র স্বাক্ষর করণ নিমিত্ত আপনার অত্যকার আগ্রহপূর্ণ অনুরোধ রক্ষা করিতে না পারায় আমি অত্যন্ত অসুখী হইয়াছি।..

....

তবে আপনার উদ্দেশ্য যে অতি সাধু এবং তাহা সিদ্ধ হওয়া যে বাঞ্ছনীয়, তদ্বিষয়ে কোন মতভেদ হইতে পারে না। যদি আমার স্বাক্ষর আপনার উদ্দেশ্য সাধনে কোন সহায়তা করিতে পারে মনে করেন, তবে এই পত্রখানি আপনি তৎপক্ষে ব্যবহার করিতে পারেন। ইতি

আপনারই

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা।

১৬ আষাঢ় ১৩২১।

উচ্চ হৃদয় স্বনামখ্যাত ফরিদপুরের উকিল

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, এম, এ,

যাহা বলিয়াছেন :—

"আমি শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রণীত "সতীর তেজ" নামক উপন্যাস পাঠ করিয়া অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। সচরাচর উপন্যাস বলিলে যাহা বুঝায়, এই গ্রন্থ তাহা নহে। ইহা ধর্ম্মমূলক দর্শন ও আর্য্যনীতির উপদেশপূর্ণ একখানি সুন্দর গ্রন্থ। ইহার ভাষা অতি প্রাঞ্জল ও মধুর এবং ভাব অতি উচ্চ এবং হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছে। ইহা একখানি সম্পূর্ণ স্ত্রীলোক পাঠ্য গ্রন্থ। গ্রন্থ-কার এই উপন্যাসখানি একটী সৎকার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছেন। নলীয়ার প্রাচীন কীর্ত্তি শ্রীশ্রী৺জয়দুর্গা মাতার মন্দির সংস্কারকল্পে তিনি এই গ্রন্থ দান করিয়াছেন। তাঁহার এই সদনুষ্ঠান দ্বারা এই গ্রন্থের মূল্য আরও বর্দ্ধিত হইয়াছে। এই প্রাচীন ঐতিহাসিক মন্দির সংরক্ষণ কল্পে কতিপয় লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক লইয়া একটী কমিটী গঠিত হওয়া আবশ্যক। আমি ধর্ম্মপ্রাণ গ্রন্থকারের তৎপ্রতি মনো-যোগ আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করি, এবং যাহাতে তাঁহার এই সদনুষ্ঠান কার্য্যে পরিণত হয় তজ্জন্য আমি আন্তরিক কামনা করি।

শ্রীঅম্বিকা চরণ মজুমদার

কুমারটুলী নিবাসী

প্রাচীন কবিরাজ শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ সেন মহাশয় যাহা বলিয়াছেন।—

শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি বিশেষরূপ জানি। ইনি স্বধর্ম্মপরায়ণ সদ্বংশজাত স্বাধীনচেতা ব্রাহ্মণ সন্তান। আজ পঁচিশ বৎসর যাবৎ কলিকাতায় অবস্থান করিয়া নানা প্রকার ব্যবসা কার্য্য দ্বারা আপনার সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন, স্বধর্ম্ম রক্ষা, দেবসেবা ও সাধুগণের প্রতি ইহার প্রগাঢ় অনুরাগ। ইহার পূর্ব্ব নিবাস জন্মস্থান ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নলীয়া গ্রাম। নলীয়া গ্রামে একটী অতি প্রাচীন ৺জয়দুর্গা মাতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। ঐ মন্দির অতিশয় জীর্ণ হইয়াছে। তাহার সংস্কার সংকল্পে ইনি বহুকাল হইতেই উদ্‌যোগী। ঐ সংকল্প এ পর্য্যন্ত ইনি কার্য্যে পরিণত করিতে পারেন নাই। সম্প্রতি ঐ মন্দির সংস্কারের জন্য উক্ত ব্যক্তি "সতীর-তেজ" নামক একখানি ধর্ম্মমূলক পুস্তক প্রণয়ন করিয়া তাহার সমুদয় স্বত্ব ঐ মন্দিরের সংস্কার কল্পে দান করিয়াছেন। এক্ষণে ধর্ম্মানুরাগী হিন্দু মহাত্মাগণ উদ্দেশ্য কার্য্যে সাধ্যানুযায়ী আবশ্যক মত সাহায্য করিলে প্রকৃতই একটী সাধু ও সৎকার্য্যের সাহায্য করা হয়।

শ্রীদুর্গাপ্রসাদ সেন

ভারতরত্ন লক্ষ্মীসরস্বতীর বরপুত্র মহাত্মা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্র নাথ দত্ত এম্ এ, এটর্নী ব্রহ্মবিদ্যা সম্পাদক বেদরত্ন সাহিত্যিক মহাশয় যাহা বলিয়াছেন।—

কবিরাজ মহাশয় সতীরতেজ প্রণেতা দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন আমি তাহা সমর্থন করিতেছি।

দৈবচরণ বাবু সদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহার অভীষ্ট মন্দির সংস্কার কার্য্যে পরিণত দেখিলে সুখী হইব। ইতি—

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।

নায়ক।

দৈনিক পত্রিকা।

সাহায্য প্রাপ্তি প্রার্থনা।

দেবমন্দির সংস্কার।

প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত নলীয়া গ্রামে সাধক প্রবর কৃষ্ণরাম চক্রবর্ত্তী মহাশয় শ্রীশ্রী৺জয় দুর্গা মাতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই মূর্ত্তি দশভূজা পিত্তলময়ী। ইহার প্রকাণ্ড মন্দিরটী জোড় বাঙ্গালা নামে অভিহিত। তাহার কারুকার্য্য ও গঠন প্রণালী অতীব চমৎকার। এই মন্দিরের সন্নিকটে একটী জলাশয় খনন করাইয়া চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঐ পুণ্যানুষ্ঠানের অঙ্গস্বরূপ মাতৃভোগের প্রসাদে অতিথি সেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সংস্কার অভাবে এই পুরাকীর্ত্তি মন্দিরটী ভূমিসাৎ হইবার

উপক্রম হইয়াছে। এমন কি এখন দেবীসেবা চলা দুষ্কর। তাই দেখিয়া স্বদেশানুরাগী ধার্ম্মিকপ্রবর যোগভক্ত শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় "সতীর-তেজ" নামক অপূর্ব্বধর্ম্মমূলক উপন্যাস প্রণয়ন করিয়া ঐ দেবসেবা ও মাতৃমন্দির সংস্কারকল্পে সম্পূর্ণ স্বত্বদান করিয়াছেন। গ্রন্থখানি ধর্ম্মপ্রাণ ভাবুক ও প্রেমিক পাঠক পাঠিকার নিকট বড়ই আদরের সামগ্রী হইয়াছে। ইহার কাটতি দেখিয়া আমরা আনন্দের সহিত আশা করিতেছি। মাতৃকার্য্য মাতাই উদ্ধার করিয়া লইবেন। কিন্তু শুদ্ধ এই পুস্তকখানির উপর নির্ভর করিলে কার্য্যোদ্ধার হইতে বহু সময় সাপেক্ষ। সেই-জন্য সাধারণের নিকট হইতে সাহায্য পাওয়া আবশ্যক। একজনে না হয় দশজনে মিলিয়া সদনুষ্ঠানে মনোযোগী হইলে যে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। এ কার্য্যে দশসহস্র টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে কি করা কর্ত্তব্য ইহা জানিবার জন্য যদি কোন হিন্দুমহাত্মা ইচ্ছুক হন, তাহা হইলে তিনি কলিকাতা ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটে "সতীর-তেজ" প্রণেতা শ্রীদৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট সন্ধান লইতে পারেন। মাতৃমূর্ত্তির উদ্ভব, এবং মন্দির ও দেবী প্রতিষ্ঠার সবিশেষ বিবরণ একটী অপূর্ব্ব রহস্যপূর্ণ ঘটনা বটে। কিঞ্চিৎ বিবরণ সতীর-তেজ উপন্যাসেও প্রকাশ আছে।

যিনি এই কার্য্যে মনোযোগী হইবেন, দশভুজা জয়দুর্গা মাতা দশ-ভুজ প্রসারণে তাঁহার মঙ্গল করিবেন।

RAI PURNENDRA NARAIN SINGH, Bahadur, Pleader, Bankipore, writes :—

My friends certify and I have myself seen Srijukta Daibo Charan Ganguli has been unselfishly and earnestly trying to do his best to raise funds for the repairs of the old Jai Durga temple in the district of Faridpur. He has raised some money by the sale of readable book 'Satir Tej' and about Rs. 10,000 are to be raised. Any contribution made towards the fund will not be made in vain.

BANKIPORE, 13-9-15. } PURNENDRA NARAYAN SINGH.

CALCUTTA,
15TH JUNE, 1914.

District and Sessions Judge Mr. B. C. Mitra thus writes to Babu Ambika Charan Majumdar, Pleader, Faridpur.

MY DEAR AMBICA BABU.

Babu Daiva Charan Ganguly saw you some days ago, at my instance, over the restoration of the Temple of Joy Durga at Nalia which I understand has been personally inspected by Mr. Woodhead. It is a pity that you are not well enough now to organise assistance towards the object which this gentleman has in view. But you possess a

name to conjure with anywhere in the District and any indirect help that you can give him will be given towards a good cause. He has written a book called সতীর তেজ the proceeds of the sale of which will be given towards the same object. I have asked him to present a copy of it for your perusual. You may find it interesting. In your present state of health, I am rather reluctant to burden you with any strenous work; but it will be enough if he succeeds in intesting your sympathy and getting your advice.

I am
Very Sincerely Yours,
(Sd.) B. C, MITRA.

THE BIHAR HERALD. SEPTEMBER, 20, 1913.
AND STATESMAN. THE OCTOBER 14, 1913.

Review.

We have just received a copy of "Satirtej," It is an admirable, religious book in the form of a novel. It has been dedicated by Babu Daiba Charan Ganguly, the author, to the goddess Joy Durgamata of Nalia in the district of Faridpur.

The sale proceeds will go to the fund recently started in East Bengal, with a view to meeting the expenses of repair of Joydurgamandir lying at

present in a dilapidated condition. The book is offered to the reading public with the hope that they will not be slow to contribute to so deserving a fund. The book can be had of the publisher at 264/3 Upper Chitpur Road, Calcutta. All contributions to the fund will be thankfully accepted.

মাননীয় শ্রীযুক্ত রায় রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী বাহাদুর
এম, এ, বলিয়াছেন ঃ—

নমস্কার নিবেদন।

মহাশয়, আপনার রচিত "সতীর তেজ" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিলাম। গ্রন্থখানি হিন্দুধর্ম্মের সারতত্ত্ব গুলি গল্প ও রূপক ছলে বুঝাইয়া দিবার জন্য লিখিত। আপনার এই উদ্দেশ্য অনেকাংশে সিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। গ্রন্থের স্থানে স্থানে যে সকল তীর্থ যাত্রার কথা ও ভ্রমণ বৃত্তান্ত নিবদ্ধ হইয়াছে তাহা বড়ই মনোরম। উহা হইতেও হিন্দুধর্ম্মের মূলসূত্রের অনেক আভাষ পাওয়া যায় ও প্রসঙ্গতঃ অনেক বিষয়ের জ্ঞান হয়। আপনার কল্পিত সতী বলিয়া চিত্র, চিত্র গুপ্তের বিচার। কৃতান্ত পুরীর দৃশ্য প্রভৃতিতে আপনার ধর্ম্মপ্রাণতা লোক হিতৈষণা প্রভৃতি গুণের যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আমার বোধ হয় গ্রন্থের "সতীর তেজ" এই নামটী অনর্থ হইয়াছে। ভাষা নির্দ্দোষ না হইলেও যে প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহি।

শ্রীরাজেন্দ্র নাথ শাস্ত্রী।

কুমারটুলী নিবাসী স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন মহাশয়ের পৌত্র ধর্ম্মপ্রাণ নবীন যুবক শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন বলিয়াছেন ঃ—

"বর্ত্তমান সময়ে বিকৃতরুচি গ্রন্থকারগণ অশ্লীল উপন্যাসাদি প্রণয়ন করিয়া ভারত-সাহিত্য-ভাণ্ডারে আবর্জ্জনা আনয়ন করি-

তেছেন ভাল পুস্তক যে একেবারেই নাই এমন কথা বলিতেছি না। তবে তাহা সংখ্যায় অত্যন্ত অল্প। 'সতীরতেজ' নামক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড়ই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থখানি ধর্ম্মমূলক কাহিনী। তাই সূক্ষ্মদর্শী গ্রন্থকার ধর্ম্মরূপ হিন্দু, সুপক্ক কদলীরূপ কাহিনীর ভিতর পূরিয়া প্লীহা রোগীর উদরস্থ করিবার ন্যায় খাইতে দিয়াছেন। ইহায় ভাষার ঝঙ্কারে, বর্ণনার লালিত্যে, চরিত্র চিত্রাঙ্কনের উৎকর্ষতায় প্রতি ছত্রে ছত্রে ধর্ম্মের গূঢ় ভাব বিশ্লেষণে, উজ্জ্বল আদর্শ অঙ্কনে লিপিপটুতার পরিচয় পাওয়া যায়। অতএব এই পুস্তক সম্বন্ধে নিঃশঙ্কে কবির ভাষায় বলা যাইতে পারে যে—

গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য আরও মহৎ জানিয়া বিশেষ সুখী হইলাম। উক্ত পুস্তকের সম্পূর্ণ স্বত্ব নদীয়ার ৺জয়দুর্গা মাতার মন্দির সংস্কারার্থে দান করিয়াছেন। আশা করি ভগবান বর্ত্তমান সময়ে এরূপ রুচিপূর্ণ গ্রন্থকারের আশা পূর্ণ করিয়া অক্ষয়কীর্ত্তি রক্ষা করুন।

শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন।
৯।১নং কুমারটুলী, কলিকাতা।

বঙ্গবাসী পত্রিকা।

বাঃ ১৩ই পৌষ, ১৩১৯ সাল।

ইং ২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১২ সাল।

"সতীরতেজ" শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ডি, এন, গাঙ্গুলী, ১১।২নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা। প্রাপ্তিস্থান ২৬৪।৩ ং অপারচিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য ১৷৷০ টাকা, বিলাতি বাঁধাই ১৸৹ টাকা।

গ্রন্থকার বলিতেছেন, ধর্ম্মমূলক অপূর্ব্ব উপন্যাস। উপন্যাসের আকার বটে। কিন্তু উপন্যাসও নহে, অপূর্ব্বও নহে। ধর্ম্মমূলক বটে; পরন্তু বলা যায় কেবল মূলটা ধর্ম্ম নহে; ইহার কাণ্ড শাখা প্রশাখা সবই ধর্ম্ম। উপন্যাসের গল্প ভাগে নূতনত্ব নাই। কিন্তু উপন্যাসের আকারে ধর্ম্মের প্রকৃতিটুকু এমন ভাবে বলিয়া গিয়াছেন, যে আধুনিক বাঙ্গলাগ্রন্থে তাহা দুষ্প্রাপ্য। ভাষা ও বর্ণনার মাধুর্য্যে এবং লিপিনৈপুণ্যে গ্রন্থখানি বড়ই সুখপাঠ্য ও শিক্ষাপ্রদ। গ্রন্থখানিকে ধর্ম্মতত্ত্বের সরল সার বিশ্লেষণ বলিতে পারা যায়।

হিতবাদী পত্রিকা।

"সতীরতেজ" শ্রীদৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত, ডি, এন, গাঙ্গুলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা। গ্রন্থকার এ পুস্তককে ধর্ম্মমূলক অপূর্ব্ব উপন্যাস বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এই পুস্তক যে ধর্ম্মমূলক ও অপূর্ব্ব তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহা উপন্যাস কি না তাহাতে আমাদের সন্দেহ আছে। পুস্তকে কএকখানি চিত্রও আছে।

বঙ্গরত্ন পত্রিকা।

১৩ই মাঘ ২৭শে জানুয়ারী—১৩১৯ সোমবার।

"সতীরতেজ" একখানি স্ত্রীপাঠ্য সচিত্র উৎকৃষ্ট উপন্যাস। শ্রীযুক্ত দৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় এই গ্রন্থের প্রণেতা। এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রীতিপ্রদ। এই পুস্তকের প্রত্যেক ছত্রেই নারীগণের পক্ষে অতি উপাদেয় উপদেশ পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থের উপন্যাসাংশ মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

গ্রন্থকার মহাশয় অতীব নৈপুণ্য ও যত্নের সহিত সর্ব্বশ্রেণীর পাঠক পাঠিকাগণের মনোরঞ্জন করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। চিত্রসমূহও অতি মনোরম। কেবল স্ত্রীলোক বলিয়া নহে, পুরুষেরাও এই গ্রন্থপাঠে বহুল উপদেশ লাভ করিবেন। পুস্তক খানি ৩১৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১॥০ টাকা।

গ্রন্থকারের ঠিকানা—১১।২ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট। কলিকাতা।

বিশ্বদূত পত্রিকা।

১৩২০ শাল ৩০শে বৈশাখ।

"সতীরতেজ" একখানি সচিত্র ধর্ম্মমূলক উপন্যাস। মূল্য ১॥০ টাকা। ২৬৪।৩ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতায় পাওয়া যায়। বাঙ্গালা সাহিত্যে অসংখ্য উপন্যাস রহিয়াছে। প্রত্যহ নূতন নূতন উপন্যাস বাহির হইতেছে। কিন্তু সুপাঠ্য উপন্যাসের সংখ্যা যে আশানুরূপ নহে তাহা বলাই বাহুল্য। যে উপন্যাস পাঠে সৎপ্রবৃত্তি জন্মে, ধর্ম্মজ্ঞানের সঞ্চার হয় এবং নরনারী কর্ত্তব্যের আভাস পাইয়া সুপথে চলিতে পারে এবম্প্রকার উপন্যাস যে সমাজের কল্যাণকর তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। "সতীরতেজ" একখানি হিতোপদেশপূর্ণ সুপাঠ্য উপন্যাস। পাঠকগণ ইহা হইতে গৃহীর কর্ত্তব্য, সন্ন্যাস যোগ, পাতিব্রত্য এবং ইহকাল ও পরকাল সংক্রান্ত নানা তথ্য অবগত হইবেন। শিক্ষিত সমাজে "সতীর তেজের" সমাদর হইবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

সময় পত্রিকা।

ইং ২৬ শে পৌষ ১০ই জানুয়ারি।

বাং ১৩১৯ শাল ইং ৯১৩ শাল।

"সতীরতেজ" ধর্ম্মমূলক উপন্যাস। শ্রীদৈবচরণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। প্রকাশক ডি, এন, গাঙ্গুলী, ১১ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। মূল্য ১৷৹ টাকা। বাঙ্গলা উপন্যাস সচরাপেক্ষা অধিকাংশে ভাল। সতীত্বের মহত্ত্ব কীর্ত্তনের জন্যই প্রধানত এই উপন্যাস রচিত হইয়াছে। স্ত্রীশিক্ষার উপযোগী অনেক ভাল ভাল কথা সরল ভাষায় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কিন্তু উপন্যাসে যাঁহারা কাব্যের সৌন্দর্য্য প্রত্যাশা করেন তাঁহারা এ গ্রন্থ পাঠে তেমন প্রীতিলাভ করিবেন না। কারণ চরিত্র চিত্রাঙ্কনে লেখক সফলতা লাভ করিতে পারেন না। এই গ্রন্থের প্রধান দোষ ধর্ম্মতত্ত্বের ব্যাখ্যার জন্য অযথা আগ্রহ ও অসংযত চেষ্টা। ধর্ম্মতত্ত্বের আলোচনা যে মন্দ জিনিষ একথা কেহ বলে না। কিন্তু সমস্ত জিনিষেই স্থান কাল পাত্র ভেদে একটী উপযোগিতা আছে। মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই হউক আর যে জন্যই হউক যাহা অসঙ্গত যাহা সময়োচিত নহে তাহার অবতারণা যে সাহিত্য সৌন্দর্য্যের বিশেষ ক্ষতিকারক, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে সুনীতি কিম্বা সুরুচির হিসাবে এই পুস্তকখানি যে ভাল হইয়াছে এবং ইহা যে নিঃসঙ্কোচে মাতা ভগ্নীর হস্তে সমর্পণ করিতে পারা যায় এ কথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। গ্রন্থখানির ছাপা ও কাগজ ভাল। ৩১৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত কয়েকখানি বেশ ভাল ছবিও ইহাতে আছে।

শ্রীশ্রীকালী।

শরণং।

লক্ষ্ণৌ, হোসেনগঞ্জ হইতে সুহৃদ্বর শ্রীযুক্ত ললিত মোহন রায় মহাশয় লিখিতেছেন :—

সতীর তেজ আপনার প্রণীত সতীর তেজ উপন্যাস খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া বড়ই প্রীত হইলাম। মায়াপ্রপঞ্চ পরিকল্পিত এ বিশ্বসংসারের যথার্থ তত্ত্বানুসন্ধিৎসাই কেবল অবিদ্যান্ধকার বিজড়িত ভ্রান্ত জীববৃন্দ হৃদয়ে ক্ষীয়মান কর্ম্ম পরস্পরসমুদ্ভূত চিদানন্দ সম্পাদনে সমর্থ। আত্মতত্ত্ব বিজ্ঞান ভাস্বর পুরুষ ও মূল প্রকৃতিরূপিনী চিৎশক্তির বিনা বিধানে পরমাত্মার সহিত অভিন্ন সত্ত্বানুভবজনিত পরমানন্দ লাভে সক্ষম হয়েন না। সংসারে এই আদ্যাপ্রকৃতি চিৎশক্তির স্বরূপ কোথায় আপনার উপন্যাস পাঠকগণের পক্ষে তাহা বুঝা আনায়াস সাধ্য। ভব ভ্রান্ত জীব মায়িক আবরণ উন্মোচন করিয়া জ্ঞান বিস্ফারিত নেত্রে নিজ ভবন মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেই দেখিতে পাইবে যে গৃহ কোণে যে শক্তি সতত বিরাজ করিতেছে তাহারই সাহায্য ব্যতীত পাপসহচর দুর্দ্ধর্ষ রিপুকুলের পরাজয় নিতান্ত অসাধ্য। শক্তি সুপরিচালিত হইলে গোবর্দ্ধনধারণের সামর্থ্য জন্মে আর কুপরিচালিত শক্তি অধঃপতনের সহায়। ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী, ও নারায়ণী প্রভৃতি যেরূপ সৃষ্টিসংহার ও পালন সমর্থ তত্তদ্দেবাধিষ্ঠিত মহাশক্তি এবং তাঁহাদিগের সুপরিচালনা দ্বারা যেরূপ প্রতিনিয়তই বিশ্বের সাধন সাধিত হইতেছে, তদ্রূপ গৃহকোণে বিরাজমানা গৃহীর গৃহলক্ষ্মী সংসারের সাররত্ন সতীরমণী সুরক্ষিত সতীধর্ম্ম প্রভাবে এবং পতির সুপরিচালনা

গুণে সংসার সুখময় করিয়া থাকেন। শিক্ষার জন্য গৃহীর গিরিগুহাগমনে—প্রয়োজন নাই। গৃহকোণে থাকিয়া গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করত গৃহলক্ষ্মীর সন্তোষবিধান করিলেই অন্তে অনন্ত কাল ধরিয়া সদানন্দধাম বাসের অধিকারী হয়েন। সতীর তেজ উপন্যাস রচিত হইবার পূর্ব্বে কঠোর তপশ্চারণ সাধ্য মাত্র তত্ত্বজ্ঞানলভ্য অন্তিম শান্তি লাভের এমন সুগম মার্গ অনাবিষ্কৃত ছিল বলিয়াই আমার ধারণা। "অর্কেচেন্মধু বিন্দেত কিমর্থং পর্ব্বতং ব্রজেৎ" এই বাক্যের যাথার্থ্যের এতদিনে উপলব্ধি হইল। ধর্ম্ম এত সুলভ, শান্তি এত করায়ত্ত, গৃহিণীর পরিচর্য্যায় শান্তি, সতীর সন্তোষ বিধানে শান্তি ইহাপেক্ষা সুখকর আর কি আছে? গৃহস্থগণ হাতে স্বর্গ পাইলেন। কে বলিবে সতীর তেজ উপন্যাস। আমার মতে উপনিষদ সংহিতা পুরাণাদির মত ইহাও এক ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দুদিগের অবশ্য পাঠ্য। এই গ্রন্থে কর্ম্মসূত্রের দুশ্ছেদ্যতা প্রতিপাদন এবং পুণ্য পাপজনিত শুভাশুভফলস্বরূপ স্বর্গ নরকাদির জ্বলন্ত চিত্র সুস্পষ্ট ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। তবে পত্নীর সতীত্ব প্রভাবে পতির ভোগ কালের ক্ষয় হইতে পারে ইহাও এই—কবি বুঝাইতে যত্ন পাইয়াছেন। ফলতঃ গ্রন্থের উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশ্যের সহিত ইহার উপদেশের আবশ্যক অনুবর্ত্তনেও গৃহস্থাশ্রম সুখময় হইতে পারে বলিয়া আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস। ইতি

বিনীত

শ্রীললিত মোহন রায়।

১১ই কার্ত্তিক ১৩২০। ৮০ নং হোসেনতলাও—লক্ষ্ণৌ।

শ্রীশ্রী৺জয় দুর্গা মাতার জীর্ণ মন্দির.

সংস্কারার্থ সাহায্য প্রাপ্তি স্বীকার।

দাতাগণের নাম।	দান টাকা
স্বামী ভোলানন্দগিরী হরিদ্বার	৬৲
শ্রীযুক্ত ললিতমোহন রায়	৫৲
,, কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন	১০০৲
,, কুমার পঞ্চানন মুখো	২০৲
,, রাজা শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়	১০৲
,, রাজা প্যারিমোহন মুখো	৫৲
,, সুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
,, প্রবলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৫৲
,, বেহারীলাল মিত্র উকীল	৫৲
,, শরৎচন্দ্র মুখো উকিল	৫৲
,, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উকীল, বাঁকীপুর	৫৲
,, গঙ্গাধর দাস উকিল ঐ	৫৲
,, পূর্ণেন্দু নারায়ণ সিংহ উকিল ঐ	৫৲
,, রায় মুকুন্দ দেব বাহাদুর সোমদেব সৎকর্ম্ম ভাণ্ডার ঐ	১০৲
,, ডাক্তার রামকালী গুপ্ত ঐ	৫৲
,, হরিপদ ভট্টাচার্য্য সাতরাগাছী	৫৲
,, গোপাল দাস চৌধুরী জমীদার	৫৲
,, কৃষ্ণচন্দ্র বসু	৫৲
শ্রীমতী আমোদিনী দাসী	৪৲
শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ সেন জমীদার রংপুর	৫৲
,, শ্যামাদাস কবিরাজ	৪৲
,, মনোরঞ্জন চন্দ্র রায় জমীদার	৮৲
,, ব্রজেন্দ্র নাথ সাহা	১০৲
,, বলাই চাঁদ সেট	৫৲
,, রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ জমীদার	৫৲
,, অমূল্যনাথ বসু জমীদার	৫৲
,, বৈদ্যরত্ন যোগিন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ	৫৲
,, পরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৪৲
,, অক্ষয় কুমার ভট্টাচার্য্য	৫৲

,, হেরম্বচন্দ্র রায় জমীদার
পোঃ জারা মেদিনীপুর ৫৲
শ্রীযুক্ত নন্দলাল গঙ্গোপাধ্যায় ২৲
,, গিরিজা ভূষণ হালদার ২৲
,, যতীশচন্দ্র বিশ্বাস ২৲
,, বেণীমাধব পাল ২৲
,, উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ২৲
,, উপেন্দ্রনাথ দাস বিশ্বাস ২৲
,, অধরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২৲
,, প্রসন্ন কুমার দে পোদ্দার ২৲
,, যোগেন্দ্র নাথ শীল ২৲
,, নগেন্দ্রনাথ কুণ্ডু ২৲
,, নিরোদ কৃষ্ণ রায় ২৲
,, ভুপেন্দ্র নাথ ঘোষ ২৲
,, নিবারণ চন্দ্র দত্ত ২৲
,, রাজেন্দ্র কুমার বসু ২৲
,, শিবদাস ভাদুরী ২৲
,, নেপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৲
,, গণনাথ সেন,
এল, এম, এস্, ২৲
,, বরানশীবাসী মুখো ২৲
,, কালীনাথ মুখোপাধ্যায় ২৲
,, যোধকুমার মুখোপাধ্যায় ২৲
,, মনোহর চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৲
,, পয়রালাল মুখোপাধ্যায় ২৲
,, কাশীশ্বর মুখোপাধ্যায় ২৲
,, দেবেন্দ্র বিজয় বসু ২৲
,, পূর্ণচন্দ্র সরকার ২৲
,, যতীন্দ্র কুমার রায় ২৲
,, নির্ম্মলচন্দ্র দাশ ২৲
,, সুরেন্দ্র নাথ দাশ ২৲
,, ললিতমোহন ঘোষ ২৲
,, মণিলাল ঘোষ ২৲
,, দেবেন্দ্রনাথ দাশ ২৲
,, রামচন্দ্র ভাদুরী ২৲
,, হারাণচন্দ্র মিত্র ২৲
,, সোনালাল বসু ২৲
,, বঙ্কিমচন্দ্র মিত্র ২৲
,, মিহিরনাথ রায় ২৲
,, গণেশ চন্দ্র সেন ৫৲
,, সুবল চন্দ্র চন্দ্র ২৲